ইয়েভগেনি পেরমিয়াক

দুই ভাই

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: নিকোলাই গ্রিশিন

A-2995

A – 2995

আত্মপরিচয় ও পুস্তক প্রসঙ্গে

আমার কর্মজীবন শুরু হয় অনাবাদী ভূমির এলাকায়। সাইবেরিয়ার কুলুন্দা স্তেপ অঞ্চলে। এখন সেখানে অঢেল ফসল উঠছে, মাথা তুলছে নতুন নতুন শহর। কিন্তু সে সময় এটা ছিল এক বিজন তেপান্তর। বিশের দশকে কাজ করতাম সেখানে।

১৯২৩ সালে ফিরি আমার জন্মভূমি উরালে।

দিনে কাজ ও সন্ধ্যায় পড়াশুনা চালিয়ে পের্মের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সেখান থেকে পাশ করে বেরই ১৯২৯ সালে ও পেশাদার লেখক হই। ছাত্র ও তরুণ মজুরদের প্রকাশনার ব্যাপারে সংগঠকের কিছুটা অভিজ্ঞতা আমার আগেই হয়েছিল। সাগ্রহে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান নিয়ে মাতত তরুণেরা।

প্রবন্ধ, নাট্য রূপ ও ব্যঙ্গ-নকসা প্রকাশ করি আমি।

১৯৩৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক সঙ্ঘে গৃহীত হই। আমার উল্লেখযোগ্য প্রথম বই হল "কী হবো" — কী বৃত্তি গ্রহণ করা যাবে তাই নিয়ে গল্প। সৌভাগ্যক্রমে এমন একটা স্কুলে আমি পড়ি যেখানে সাতটা বৃত্তির অন্তত একটায় তালিম নেওয়া আবশ্যিক ছিল। আমি শিখি তার পাঁচটা —ছুতোর, তালামিস্ত্রি, মুচি, কামার ও টার্নারের বৃত্তি। বোধ হয় সেই জন্যেই পেশা বাছাই নিয়ে আমার ও বইখানা সার্থক হয়। চীন সমেত বিদেশেও বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতিকালে ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক লিখেছি যেমন রূপকথার সংকলন: "দাদুর মানিব্যাগ", "রামধনুর সব রঙ", "৭৭৭ জন কারুশিল্পী" আর শিশু পাঠ্য গল্প: "ব্যস্ত ছুরি", "মিহি তার", "পিচুগিন সাঁকো" ইত্যাদি। "বড়োদের" জন্য লেখার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে "দুই ভাই" ও "বুড়ী ডাইনী"।

কী করে উপন্যাস গড়ে ওঠে তা বলা মুশকিল। আমাদের একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আমেরিকায় চলে যান, সেখানে বিয়ে করে বসবাস করতে থাকেন, পরে স্বদেশে আসতে চান ... কিন্তু এটা শুধু আমার কাঠামোর একটা খুঁটি। আসলে দুই দুনিয়ার (পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার) প্রতিনিধিদের মধ্যে সাধারণ লোকের স্তরে একটা খোলাখুলি আলাপ হাজির করার বাসনা আমার বহুদিন থেকে ছিল। সেই কারণেই বইটি লেখা। উপন্যাসের প্লট ও সংঘাতের উদ্ভব এই থেকেই।

বইটির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় *Soviet Literature* পত্রিকায়। উরুগুয়ে, কানাডা, গ্রেট বৃটেন, জার্মানি, পোলাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া থেকে এই প্রসঙ্গে নানা চিঠি পাই... আমার এই কয়েক ছত্রের অজানা পাঠক, আপনার কাছ থেকেও আমি চিঠির প্রত্যাশী।

ইয়েভগেনি পেরমিয়াক

১

সবই বেশ ভালো চলছিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বাখরুশিনের। ঝরঝরে সকালটার কোনো কোণে যেন কোনো মেঘের আশঙ্কা নেই।

খেত আর কাজের জায়গাগুলো টহল দেওয়া হল। দেখে শুনে মনটা খুশিই হয়ে উঠল তার। তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে ভুট্টা, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। গরম পড়লেও গরুগুলো একই রকম দুধ দিয়ে যাচ্ছে। চালার টিন সব শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে একেবারে চব্বিশ টন। সফল এই খামার সভাপতির দিকে সূর্যটা পর্যন্ত সেদিন যেন খুশির চোখ ঠারছিল। এই তো তার বাঁচার সময়। সাতান্ন বছর, সে আর কতটুকু। সবকিছু এমনি চললে বার্ধক্যকেও খানিকটা ঠেকিয়ে রাখা যায় বৈকি।

সাংসারিক জীবনেও ভারি সুখী সে। নেভিয়ানস্ক-এ জন্মেছে তার তৃতীয় নাতি পেতিয়া। দাদুর বাড়িতে সবাই আজ এসে জমবে।

দাদু — সত্যি চমৎকার দাদু হতে পারা! এ যেন একটা দ্বিতীয় পিতৃত্ব, তবে খানিকটা জ্ঞানগম্যি হবার পর ... আর কেমন যেন খানিকটা ভারিক্কী, দশাসই।

জিমোলস্ত ঘোড়াটার লাগাম খসিয়ে সে তাকে বাঁধলে খামার দপ্তরের ঘোড়া বাঁধার খুঁটিতে। যে সব ছুতোররা এসেছিল তাদের নমস্কার জানিয়ে সে তাড়াতাড়ি করে ঢুকল তার সাবেকী, সভাপতির ছোট্ট কামরাটায়। সেখানে টেবলের ওপরকার রেডিওটায় যেন তারই অনুরোধে তখন গুনগুনিয়ে বাজছিল 'মরাল শিশুদের নাচের' মিষ্টি বাজনাটা।

সঙ্গীত — পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কাছে তা কল্যাণী সহচরী। জীবনের কঠিন মুহূর্তে সে তার কাছেই সান্ত্বনা পেয়েছে।

বাখরুশিনের ভেতরটা নরম, সুকুমার, নিজের অনুভূতির রাজ্যটা লোকের সামনে মেলে ধরতে সঙ্কোচের ফলেই যেন সে বাইরেটা কর্কশ করে তুলেছিল। মায়াময় সুরটা বন্ধ হয়ে গেলেও তখনো তার কানে লেগে ছিল, কিন্তু চুলপাকা একটা লোক, তাতে আবার অমন ভারিক্কী পদাধিকারী — তার পক্ষে এই নিয়ে ভাবাকুল হয়ে ওঠা সব সময় কি আর শোভা পায়।

রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে সে টেবলের কাছে গেল। টেবলে একটা শাদা লম্বাটে খাম, তার ওপর বিদেশী ডাক টিকিট, আর দুভাষায় ঠিকানা লেখা।

সেক্রেটারি-টাইপিস্টকে ও ডাকলে, 'সাশা, গেছ কোথায়?'

এগিয়ে এল তন্বী, ফ্যাকাশে চুলের একটি মেয়ে, পরনে হাল্কা সুতী ফ্রক।

'আমি এখানে, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। রিপোর্টটা টাইপ করছি।'

'দেখছি, কী একটা চিঠি এসেছে আর তুমি...'

'আমি ভাবলাম নয় পরে... "মরাল সরোবর" থেকে সুরটা বাজছিল কিনা রেডিওয়...'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ মেয়েটির দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, '"মরাল সরোবর" থেকে নাকি?.. দেখো দিকি, খেয়ালই করিনি।'

'থাক, খুব হয়েছে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ...' হেসে বললে মেয়েটি, 'আমার কাছে আর বলতে হবে না। মরালকন্যারা তো আপনার চোখের সামনে এখনো নাচছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু এখন কাজের সময়। আর তুমি আমি আমরা সবাই তো কাজের লোক, নয় কি?'

'বটেই তো। বিশেষ করে আমি।'

বাখরুশিন হাসল।

'চিঠিটা কিসের সাশা?'

'আমেরিকা থেকে এসেছে, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।'

'আমেরিকা?'

'হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক থেকে, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, এই দেখুন লেখা আছে।'

বাখরুশিন চশমা চাপিয়ে পড়ে দেখল: "কলখোজ সভাপতি মিঃ পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বাখরুশিন সমীপে।"

'আমার নাম, বাপের নাম আবার কে জানবে আমেরিকায়?'

মেয়েটি উত্তর দিলে না।

বাখরুশিন আন্দাজ করে বললে, 'এ নিশ্চয় ঐ মোষের ব্যাপারে। আমাদের কাছ থেকে পাঁচটা জাত মোষ ওরা নেবে রপ্তানির জন্যে। চিঠিটা খুলে পড়ে দেখে আমায় বলতে পারতে।'

'এ চিঠি খোলা আমার উচিত হত না, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।'

'কেন, সব চিঠি পড়ে দেখার কাজ তো তোমায় দিয়েই রেখেছি।'

'কিন্তু এ চিঠি পড়ে দেখার কাজ আমার নয়,' আস্তে করে মাথা নিচু করে জবাব দিলে সাশা।

খামটায় চোখ বুলিয়ে প্রেরকের নাম দেখে বাখরুশিন হঠাৎ চুপ করে গেল। হাত কাঁপতে লাগল তার, কোমরে ব্যথা করে উঠল। দুলে উঠল মেজে। মুহূর্তের জন্য চোখ অন্ধকার করে উঠে ফের আলো হয়ে উঠল। একটু বেশিই আলো।

'সাশা, তোমার টাইপটা যা দরকার শেষ করে নাও গে... আর দরজার চাবিটা নিয়ে রেখো, মিনিট দশেক যেন কেউ এখানে না আসে।'

মেয়েটি চলে গেল। বাখরুশিন চিঠিটা খুললে দেরি করে।

"যা রটে তা কিছু বটে, তাহলে," গত বছরেই যে গুজবটা শুনেছিল তার কথা মনে হল তার।

গুজবটা এই যে তার যে ভাই ত্রফিম বছর চল্লিশ আগে ওমস্কের কাছে মারা গেছে বলে ধরা হয়েছিল সে আমেরিকায় আছে।

সে সময় কেউ তাতে কান দেয়নি কারণ গুজবটা এনেছিল মিথ্যের ওস্তাদ, ফোটোগ্রাফার ভাস্কা তুতিশেভ, জেলার আজ এ কাগজে, কাল সে কাগজে কাজ নিয়ে যে দিন কাটায়।

কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই যে ত্রফিম বেঁচে আছে।

ধীরে সুস্থে খামখানা খুলল বাখরুশিন, চার ভাঁজ করা চিঠিটা বার করলে, তার ভেতর থেকে একটা পোস্টকার্ড আকারের ফোটো বেরল।

সে ফোটোয় বছর ষাট কি তারো বেশি বয়সের একটি লোক তাকিয়ে

আছে তার দিকে। দাড়ি মোচ কামানো। মাথায় টুপি। খাশা একটা চেক কোট গায়ে। টাই বাঁধা।

ত্রফিমই বটে। বুড়ো হয়েছে, মোটা হয়েছে, কিন্তু শাদাটে হয়ে আসা ভুরুর সেই খাঁজটা ঠিকই আছে। ঠিক সেই পৈত্রিক বাঁকা নাক, সেই চওড়া কপাল, থুতনিতে ঠিক সেই রকম টোল। ফোটো থেকে সে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের দিকে চেয়ে আছে নাক উঁচু করে নয়, শ্রেষ্ঠত্বের ভাব করে নয়, বরং উল্টো। বাখরুশিনের মনে হল ত্রফিমের চোখ যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ।

কারো সঙ্গে কথা শুরু করার আগে তাকে একবার নজর করে দেখে নেওয়াটা ছিল বাখরুশিনের অভ্যাস। এবারও সে তাই করল। ত্রফিমের ছবিটা দেখার পর সে চিঠি পড়া শুরু করল, খামারের টাইপিস্ট সাশা যা পারে তার চেয়ে অনেক ঝরঝরে পরিষ্কার করে কোনো মেসিনে তা টাইপ করা...

'নিউ ইয়র্ক, ১২ই মে, ১৯৫৯

প্রীতিভাজনেষু ভাই পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ,

অবাক হোস না, দুনিয়ায় কী না ঘটে। তোর কাছে, আমার প্রথম বউ দারিয়া স্তেপানোভনার কাছে, আমায় যারা জানত তাদের সবার কাছেই মৃত হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না।

কলচাকের* সঙ্গে স্বগ্রাম বাখরুশি ছেড়ে যাবার পর অনেক ঘুরতে হয়েছিল। কলচাকের কাছ থেকে পালাই ওমস্ক শহরের কাছে। কারণ সবার আগেই আমি টের পেয়েছিলাম যে অচিরেই তার বিপর্যয় আসন্ন আর এই বিপর্যয়ের সুবাদে আমার কাঁচা মাথাটা উৎসর্গ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। লালদের কাছে চলে যেতেও ভয় হল, কেননা আমার নিজের ভাই, তোর কাছ থেকেই মার্জনার কোনো আশা ছিল না। তাই সাংহাইয়ে পালাই। সাংহাই থেকে জাহাজে চাপি আমেরিকায় ভাগ্যসন্ধানের জন্য। কেননা রাশিয়ার কোনো সরকারের কাছ থেকেই করুণার প্রত্যাশা করা চলত না। শ্বেতরক্ষীরা জিতলেও তারা আমায় দলত্যাগী বলে খতম করত। তাদের সৈন্যদল থেকে তো আমি পালিয়েছিলাম।

আমেরিকায় প্রথমটা আমার খুব কষ্টে গেছে। পরে কিছু রুশী

---

* গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রতিবিপ্লবী সেনাপতি। — সম্পাঃ

সনাতনপন্থীর সঙ্গে দেখা হয়, তারা আমায় নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটা ফার্মে, রবার্ট নামে একজন বুড়ো ধনী খামারীর কাছে কাজের ব্যবস্থা করে। এই রবার্ট আমায় খুব কদর করত, পরে লোকটা মারা যায়, আমি তার বিধবা এলজাকে বিয়ে করি। এলজা আমার চেয়ে সাত বছরের বড়ো, একটি মেয়ে আছে রবার্টের ঔরসে। আমার কোনো ছেলেপিলে হয়নি, এখন তো এমনিতেই আর হবার আশা নেই। আমি হলাম যাকে বলা হয় খামারী, মজুর খাটাই। তাসত্ত্বেও তোদের রাষ্ট্রদূত আমার আন্তরিক প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, আমি যে মলোকান ধর্ম* গ্রহণ করেছি এ আবেদনে আমি তা কিছুই লুকোইনি; যাতায়াতের সময়টা বাদে তিনি ত্রিশ দিনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার অনুমতি আমায় দিয়েছেন। আমার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের দেখতে যাবো এতে আমাদের ডিপার্টমেণ্টও কোনো আপত্তি দেখেনি। আমার জন্যে জন টেনর অনেক চেষ্টা করেছেন। খবরের কাগজের জন্যে উনি নানা সব লেখা পাঠান, উনিও আমার সঙ্গে আসবেন, কী ভাবে স্বগ্রামে এলাম, কী ভাবে রইলাম এসব উনি লিখবেন। তোর কাছে আর অকাল মৃত্যুর ভয়ে যাকে ফেলে এসেছিলাম সেই দারিয়া স্তেপানোভনার কাছে মলোকান ধর্মবিশ্বাসী হিসাবে নতজানু হয়ে নিজের জন্য নয়, আমার আত্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে আমার মরা চলে না।

আর তুই যদি আমায় ক্ষমা না করিস, যে বাড়িতে আমি জন্মেছি, বড়ো হয়েছি সেখানে গিয়ে আমায় বসতে না দিস, তাহলে অন্তত পরবাসীর মতো আমাদের ঘরের জানলার বাইরে খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকব, মা বাপের কবরে গিয়ে বসব, তারপর ফের ফিরে আসব আমার খামারে, নিউ ইয়র্ক স্টেটে।

তোদের কাগজপত্র থেকে লোকে তোর আর দারিয়ার কথা আমায় পড়ে শুনিয়েছে। কাগজে উঠেছিল যে নতুন এক জাতের গরু তুলতে পেরেছিস

---

* রাশিয়ায় ১৮শ শতকে উদিত একটি ধর্মবিশ্বাস। মলোকানরা পূজার্চনা, দেবপট, মন্দির, পুরোহিত ইত্যাদি গির্জা প্রতিষ্ঠানের সব কিছু ঠাটে আপত্তি করে। জার সরকার কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে এরা ককেশাস, আমুর, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয় ও বিদেশে চলে যায়। মলোকান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরোপুরি বুর্জোয়া সমাজসুলভ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। সম্প্রদায়ের নায়কেরা ছিল সমৃদ্ধ মলোকান, নিজেদের গরিব "ভাইদের" তারা শোষণ করত। — সম্পাঃ

বলে তোরা পদক পেয়েছিস। তখুনি সংকল্প করি যে অবিলম্বে বাখরুশিতে ছুটে যাব।

আমায় বিশ্বাস কর, ভাই পেত্রভান, আমি যাচ্ছি খোলা মনে। আমার খাওয়ার খরচ তোকে দিতে হবে না। যথেষ্ট পরিমাণে একসচেঞ্জ দিয়েছে আমায়। আমার ওপর রাগ রাখিস না। তোর কাছে, আমার প্রথম স্ত্রী দারিয়া স্তেপানোভনার কাছে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করতে না পারলেও অন্তত খোলা মনে তুইও যেন আমায় দেখিস।

আমাদের দিন তো ফুরিয়ে এল পেত্রভান, মানুষের মতো পরস্পরের কাছ থেকে ইহজগতে বিদায় নিয়ে যাওয়া উচিত। ঝগড়ার কারণও আর কিছু নেই। এটা তুই বুঝবি যখন সবকিছু তোকে বলব, কিছু না লুকিয়ে ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তির মতো করে যখন মন খুলে দেব তোর কাছে।'

তারপর কাঁপা হাতে কড়া কড়া অক্ষরে সই করা:

'ত্রফিম ত. বাখরুশিন।'

শুধু লাইনগুলো নয়, লাইনের পেছনে কী আছে তা যথাসম্ভব আন্দাজের চেষ্টা করে চারবারের বার চিঠিটা পড়লে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ তারপর সাশাকে ডেকে জিমোলস্তকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে বলল। নিজে ফোন করলে গ্যারাজে, "যে কোনো একটা গাড়ি পাঠাতে, যা আছে, ডাম্প হলেও চলবে।"

মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা মস্তো ফায়ার ইঞ্জিনে চেপে বাখরুশিন রওনা দিল জেলা পার্টি কমিটির উদ্দেশে।

২

আমেরিকা থেকে দারিয়া স্তেপানোভনাও সেই দিনই চিঠি পেল তার স্বামীর, চল্লিশ বছর আগে যাকে সে 'কবর' দিয়েছিল। তরুণী ডাক পিয়ন আরিশা তাকে চিঠিটা এনে দেয়। বাছুরদের ঘরে দারিয়া স্তেপানোভনা তখন পশু চিকিৎসকের অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে চশমা না থাকায় সে আরিশাকেই বলে চিঠিটা পড়ে দিতে। আরিশা তার দ্বিতীয় স্বামীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের চিঠিতে যা লেখা হয়েছিল এতে তারই একটা সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। খবরটার আকস্মিকতায় তার ওপর যে ছাপটা পড়ল সেটা বাখরুশিনের চেয়েও বেশি। কিন্তু সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করল দারিয়া।

অপ্রত্যাশিতভাবে পড়া এই চিঠির খবর শুনিয়ে গ্রামকে চমকে দেবার একটা ইচ্ছে ছিল আরিশার। জিজ্ঞেস করলে:

'কী করবে তাহলে?'

দারিয়া স্তেপানোভনা চিঠির সঙ্গে পাওয়া ফোটোখানার দিকে দৃষ্টিপাত করে নিস্পৃহভাবে বললে:

'এ চিঠি পড়ে তোর হয়ত খুব রোমাঞ্চ হবে আরিশা কিন্তু আমার কাছে এটা একটা অনাহূত স্বপ্নের মতো, চোখ মেললেই যা লোকে ভুলে যায়।'

'তা ঠিক বলেছ, দাশা কাকীমা... চিঠির মতো স্বপ্নও কখনো জিজ্ঞেস করে না আসা চলবে কিনা... মাঝে মাঝে এমন অসভ্যের মতো এসে হাজির হয় যে কী করা যাবে ভেবে পায় না লোকে।'

আরিশার জবাবে দারিয়া বললে:

'ভাবার আর কী আছে... অমন বেহায়া হলে আবার ভদ্রতা কিসের...'

আরিশা উৎকর্ণ হয়ে রইল আর দারিয়া স্তেপানোভনা ফোটোখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলে। চিঠিটাও ছিঁড়তে যাবে এমন সময় আরিশা ওকে থামাল:

'ও কী করছ দাশা কাকী, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে দেখানো উচিত...'

'বেশ,' সায় দিলে দারিয়া, 'চিঠিটা তাহলে সভাপতিকে দিয়ে দিস। আজ বাছুরদের টিকা দেবার দিন, আমেরিকার জন্যে বা কারো জন্যেই আমার সময় নেই।'

দারিয়া স্তেপানোভনাকে চিঠিটা যে আলোড়িত করে তুলেছিল তা চাপা দেবার চেষ্টা করলেও ডাক মেয়েটির সন্ধানী চোখে তার মুখের পাণ্ডুরতা ও বাঁ চোখের চাঞ্চল্যে অস্থিরতার নিশ্চিত নিদর্শন গোপন থাকেনি। তার মানে কিছুই এসে যায় না, তা নয়। কাকী যদি নিজেই চিঠিটা পড়ত, তাহলে ফোটোর কুটিগুলো অমন হলদেটে হয়ে কুঁকড়ে গিয়ে আর আস্তাকুঁড়ে পড়ত না।

'আমি নিজেই আজ চিঠিটা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে পেঁছে দেব,' রহস্যময় আমেরিকানদের আসন্ন আগমনে খুশি হয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে আরিশা।

মেয়েটা চলে গেল, বাছুর ঘরে একা রেখে গেল দারিয়াকে তার স্মৃতি আর ভাবনার মধ্যে। এ স্মৃতি আর ভাবনা এখন জোয়ারের মতো ঠেলে এল তার মাথায়, আর জীবনে এই প্রথম নিজের অনুভূতিগুলোকে বাছাই করে কী কর্তব্য তার নিরূপণ কঠিন হল তার।

দারিয়ার প্রথম মেয়ে নাদেজদার বাপ ত্রফিম, কিন্তু কখনো তাকে দেখেনি। এমন কি জানেই না তার ছেলে আছে কি মেয়ে আছে। মরা থেকে বেঁচে ওঠা এই লোকটাকে কি নাদেজদাই বাপ বলে মানবে? বাপ, এ যে মস্ত কথা। বাবা বলে সে ডাকে অন্য একটা লোককে, যে তাকে মানুষ করে তুলেছে, ভালোবাসে... তবু সে তো ত্রফিমেরই মেয়ে।

জন্মপত্র নতুন করে নেওয়া যায়, বাপের নাম, উপাধি বদলানো যায়, বিয়ে নাকচ করে দেওয়া যায় চূড়ান্ত রূপে, তবু ত্রফিম আর দারিয়া চিরকালই থেকে যাবে নাদেজদার বাপ আর মা।

ফোটোর কাগজের ওপর ছাপা ত্রফিমের মুখটা ছিঁড়ে ছুটে পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব, কিন্তু নাদেজদার মনের মধ্যে থেকে তার মুখের আদলটা, তার ভুরুর খাঁজ, তার মাথায় ঢোল, আর স্বভাবের ছাপটাকে মুছে ফেলা অসম্ভব।

মানুষের স্মৃতি আপোসহীন, যা অভিজ্ঞাত, যা অনুভূত কখনো তাকে মিথ্যে করে তুলতে পারে না, বাড়াতে, কমাতে, নিশ্চিহ্ন করতে পারে না, এমন কি বদল ঘটাতে পারে না একটুকু।

স্মৃতির প্লাবন থেকে আত্মরক্ষায় দারিয়া বৃথাই তার তারুণ্যের তপ্ত দিনগুলোর কথা ভুলতে চাইল। কিন্তু স্মৃতি তা চায় না।

সহকারী পশু চিকিৎসক এসে একজন তরুণ শিক্ষানবিশের সাহায্যে টিকা দিতে শুরু করল বাছুরগুলোকে। যা ঘটে গেছে বহুদিন আগে, জীবনের আটান্ন বছরে যা নিয়ে ভাবতে যাওয়া ছেলেমানুষি, তা নিয়ে স্মৃতির ব্যাকুল না হওয়াই উচিত। কিন্তু দারিয়াকে রেহাই দিল না স্মৃতি, স্বপ্নের মতো ভিড় করে এল দৃশ্যের পর দৃশ্য।

ভেসে উঠল বাখরুশির সেই পুরনো রাস্তাটা, বর্ষণসিক্ত ইস্টারের এক পূর্বাহ্নে যেখানে তাকে প্রথম দেখে ত্রফিম, কথা বলে তার সঙ্গে...

বার্ড-চেরি ফুলে ভরা সেই খাদটা... শাদায় শাদা... বার্ড-চেরিগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে নিজে একটা শাদা পোষাক পরে চুপি চুপি চলেছে তাদের বনের গোপন আশ্রয়ে, গাছের গায়ে ত্রফিমের দেগে দেওয়া চিহ্ন দেখে পথ করে...

ত্রফিমের দাদু — ন্যাতাওয়ালা দিয়াগিলেভের বাড়ির মস্ত বৈঠকখানাটা ভেসে উঠল তার চোখে... বিয়ের বাসর... প্রেমে সুখে সে টলমল... ওর ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ত্রফিম... তারপর পুজো করেছে ওর, নতজানু হয়ে রাত ভোর করেছে, যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না সে স্বামী, ও স্ত্রী...

তার প্রথম সম্ভবত একমাত্র প্রেমের মধ্যে এতটুকু কালো আঁচড় দেখতে চাইছিল না স্মৃতি... আর্তিওমকেও সে অবশ্য ভালোবেসেছে... কিন্তু সেটা একটা অন্যরকম আবেগ। হয়ত ভালো, কিন্তু অন্যরকম।

ত্রফিম যদি সে সময় সত্যিই ওমস্কের কাছে মারা যেত, মারা গেছে বলে অন্যকে দিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে পাঠানো — এই প্রতারণাটা না করত, তাহলে তাকে ক্ষমা করা যেত, মানুষ ভুল করলে যেমন তাকেও লোকে ক্ষমা করে। কিন্তু এখন সে যে বেঁচে। নিজের জীবনের জন্যে সে জেনে শুনেই তাকে ত্যাগ করে গেছে, তাকে পায়ে ঠেলেছে... তার মানে কোথায়, কার সঙ্গে সে জীবন কাটাচ্ছে তাতে ওর কিছুই এসে যায় না, বাঁচতে পারলেই হল।

এখনো তার প্রতি সাধারণ সম্মানটুকু ওর নেই। সশরীরে যে দেখা দিচ্ছে সেটা তো দারিয়ার প্রীতির জন্যে নয়, তার নিজের জন্যে। একবার কি ভেবেছিল চল্লিশ বছর পরে ওকে দারিয়া দেখতে চাইবেই বা কেন?

কেন, কীসের জন্যে?

মাথায় টুপিটি পরেছে, কিন্তু ভেতরে আর কিছু নেই।

মার্জনা চায়। নয় মার্জনা করা হল... কিন্তু কী দরকার ওর মার্জনায়? তাতে কি বদল হবে ওর জীবনের। ভার কমবে, মন হালকা হবে? কিন্তু তার মানে তো সেই নিজের জন্যেই।

আর তার জন্যে কী?

না বাপু মিঃ বাখরুশিন। এ সাক্ষাৎ ঘটছে না। তার সঙ্গে না, তার মেয়ে নাদেজদার সঙ্গে নয়, তার নাতিদের সঙ্গে না। এদের কাছে তুমি নেই। অন্যেরাও যেমন ইচ্ছে করবে। নিজেদের সংকল্প নিজেরা নেবে। তুমি তো আর রাষ্ট্রদূত নও। এমন কিছু একটা প্রতিনিধিও নও যে নুনরুটি দিয়ে আপ্যায়ন করে না ডাকলে চলবে না...

টুরিস্ট... বেশ তা টুর করো যেমন খুশি। তাতে তার কী? যদি তাকে মনে করতে চায়, তো বেশ মনে করে রাখুক সে যেমনটি ছিল তেমনি। আজ এত বছর বয়সে নিজেকে সে কেন দেখাবে দারিয়া?

কিছুতেই ওর সঙ্গে দেখা করবে না দারিয়া। এ একেবারে স্থির কথা।

'শুনছি কী একটা চিঠি এসেছে আপনার আমেরিকা থেকে,' টিকা দেবার ফাঁকে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই বলে বসল সহকারী ডাক্তার।

দারিয়া স্তেপানোভনার ইচ্ছে হয়েছিল শুধোয় কোত্থেকে শুনলে! কিন্তু কোত্থেকে খবরটা পেতে পারে আন্দাজ করে বললে:

'হ্যাঁ ইভান কুজমিচ, পরলোক থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তবে আমার সঙ্গে তার সংস্রব কম। ভাবছি ভাইপোর কাছে চলে যাব, কুভশাতে।'

'হঠাৎ, এমন হঠাৎ?'

'আমি ছাড়া অন্য লোকেদেরও যাতে ও চিঠির সঙ্গে সংস্রব কম থাকে সেই জন্যে,' এই বলে যে আলাপটা ওর কাছে নেহাৎ ব্যক্তিগত হয়ে উঠছিল সেটা থামিয়ে দিয়ে দারিয়া বাছুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৩

“মার্কিনী চিঠির” যে গল্পটা আরিশা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছড়িয়েছিল সেটা অবিলম্বেই শুধু বাখরুশিতে নয়, আশেপাশের গ্রামেও সজীব আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল।

পুরনো কথা সব উঠল, যা মনে হয়েছিল চিরকালের জন্য চাপা পড়ে গেছে। বলাবলি করা হল ঐ প্রথম বাখরুশিনদের পারিবারিক নানা খুঁটিনাটি, যাদের নামে সম্মিলিত যৌথখামারগুলোর এই “রাজধানী”টার নামকরণ হয়েছে।

এ দিনগুলোয় যা কিছু বলা হয়েছিল তার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কাহিনীগুলো সংকলন করতে হলেও লেখনীর সামর্থ্যে কুলাবে না।

সকলের চেয়ে গভীরে ও সযত্নে অতীত খুঁড়ে বার করলে তুদোয়েভরা। আস্তাবলের সহিস সত্তর বছরের কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ তুদোয়েভ ও তার বউ পেলাগেয়া কুজমিনিচনার কাহিনীগুলোই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, যদিও গল্প করে তোলার ঝোঁক এদের বেশ ছিল, রঙীন করে তুলত অতীতকে।

বুড়ো তুদোয়েভের গল্পটার মূল কথাগুলো বাছাই ও তার সব কিছু রঙ ঝাড়াই করলে জানা যাবে একই ঘরে জন্ম নেওয়া বাখরুশিনদের দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল কী নিয়ে। এই অতীতচারণে পুরো তিন পরিচ্ছেদ লাগলেও ভবিষ্যৎ ঘটনা বোঝার জন্যে এটা অপরিহার্য।

কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ তুদোয়েভের কাহিনী সংক্ষিপ্ত করলে দাঁড়ায় এই:

আজ যেখানে বাখরুশিনদের বাড়ি, সেখানে সত্তর বছর আগে ছিল এক দীনহীন কুটির, তার একটি জানলা; বাস করত কালচে চুলো এক চাষী পেত্রভান আর তার ছেলে তেরেন্তি। আমাদের সভাপতি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের বাপ।

তেরেন্তি বাখরুশিন ছিল বেশ সুঠাম, সুশ্রী: তার ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের গোছায় তিন মাথা কুলিয়ে যেত, বুদ্ধিতেও সেকালের চারটে গেঁয়ো মুহুরি পারত না। যেমন মানানসই লম্বা, তেমনি গায়ের জোর। মেলার দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতে পাওয়া তার অ্যাকর্ডিয়নের বেলো টেনে সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, তখন চঞ্চল হয়ে ওঠেনি এমন কুমারী মেয়ে কম।

কিন্তু বাখরুশিনদের টানাটানির সংসার। মরখুটে এক রঙবেরঙের মাদি ঘোড়া আর আমাদের ওই গুদামের কুকুরটার চেয়ে খানিক বড়ো একটা গরু। জমি থাকলেও তা সামান্য। তাতে যা ফসল উঠত তাতে শুধু মনের তুষ্টি, পেটের জন্যে খাটতে হত কারখানায়। ঠেলা-গাড়ি করে মাল পেঁছে দিত ফার্নেসে। রোজগার যা হত তাতে নতুন ঘর তোলা কি ভালো একপ্রস্থ জামা জুতো কেনা সম্ভব হত না। তাই পেত্রভান বাখরুশিন ভাবলে ছেলের বিয়ে দেবে ধনীর ঘরে, পাত্রীও ছিল। ন্যাতাওয়ালার মেয়ে, দোমনা দিয়াগিলেভা। বাপ ওর হাল দিত না, বীজ বুনত না, তল্লাটের গাঁয়ে গাঁয়ে ন্যাতাকানি

হাড়মাড় শিং-খুর সব জোগাড় করত, আর ঠক বাজি ফাজি করে সব বেচত। দিয়াগিলেভের বাড়ি আজো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। আমাদের পুরনো ক্লাবঘর তোলা হয়েছিল তারই সঙ্গে।

সাবেকী মাপকাঠিতে আমাদের বাখরুশি গ্রামে ত্রফিম দিয়াগিলেভকে সচ্ছলই বলতে হয়। আঙিনায় মস্ত চালা… চারটে গোলা… সাতটা ঘোড়া… শিং আর ন্যাতাকানি কেনার জন্যে তিনটে মজুর… আর একমাত্র কন্যে। কী বা মুখ, কী বা গতর, কিন্তু হাজার টাকা নগদ যৌতুক, অন্য সব দান তো ছেড়েই দিলাম। আর সে কালে এক হাজার টাকা মানে চল্লিশটা ঘোড়া আর স্তেপ-ওয়ালাদের কাছ থেকে পোষ না মানা ঘোড়া কিনলে পঞ্চাশটা। এক ফার কোটই তার চারটে। তার একটা শেয়ালের ফার। পোষাক আষাকের কথা তো ছেড়েই দিলাম। দিনে তিনবার করে শাল বদল করত, তেরেন্তির মন ভোলাতে চাইত। কিন্তু তেরেন্তি চেয়ে পর্যন্ত দেখত না। ও দেখত অন্য এক মেয়ের স্বপ্ন। লুশা। দূর শুতিওমির বনরক্ষকের মেয়ে।

লুশা ছিল ছোটোখাটো মতো, কিন্তু রূপ ডাকসাইটে। রাতের পর রাত, বসন্তের পর বসন্ত তেরেন্তির অ্যাকর্ডিয়ন বাজত বনরক্ষকের মেয়ের জন্যে। নদীর ওপারে রাতে লুশার জন্যে অ্যাকর্ডিয়নের সে আকুলতা শুনে বুড়ি মেয়েরা পর্যন্ত দুঃখে চোখ মুছত ঘাগরার খুঁট দিয়ে।

তবে অ্যাকর্ডিয়ন কি আর সবার হৃদয়কেই গলাতে পারে। আর সে বছর অভাব একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিতে ফসল মারা পড়ল, কারখানায় গাঁয়ের লোকেদের নিতে চাইত না। লোহার চাহিদা ছিল না হয়ত, হয়ত কিছু একটা গড়বড় হয়েছিল কোথাও। ভারি খারাপ পড়েছিল দিনকাল…

পেত্রভান দেখে, ন্যাতা-কারবারীর সরু ঠ্যাং মেয়েটা তেরেন্তির সঙ্গে সর্বসমক্ষে এক জোয়ালে বাঁধা পড়বে বলে ক্ষেপে উঠেছে। ন্যাতাওয়ালা দিয়াগিলেভও যে তেরেন্তির বাপকে তিন রুবল পাঁচ রুবল ধার দিয়ে ফেরত নিল না, বুঝতেই পারছ, সেটা এমনি এমনি নয়। আর পাঁচ রুবলে সেকালে দুটো ভেড়া, তার ওপরে ফাও। নয়ত ভালো মতো একটা লাঙল। টাকার খেল!

তেরেন্তির বাপ অনেকদিন ধরে চিন্তা করলে… ভেবে ভেবে দেখলে,

এটা ওটা হিসাব করলে, তারপর কেমন যেন ঐ অ্যাকর্ডিয়নের কাঁদুনি শুনে শুনে ব্যাজার ধরে গেল। কাঁচা চামড়ার একটা জিনের বেল্ট দিয়ে সে তার পৈতৃক হুকুম চাপিয়ে দিলে ছেলের ওপর ...

চুপ করে গেল জোর গলার কাঁদুনি। খুশি হয়ে উঠল হলদে দেঁতো খ্যাঙরা কাটি দোমনা দিয়াগিলেভা। অঝোরে কাঁদলে বনরক্ষকের বৈঁচি ফল। আর বাখরুশির মেয়েরা গান ধরলে:

পাটে বসে ... ঐ গো পাটে বসে
রাঙা রবি নীল বনপারে ...

বাপ আগাম পেলে বরপণের অর্ধেক — পাঁচশ টাকা ... কাঠ কিনলে, ছুতোর লাগালে, কেননা চারটে ফার কোট আর পাঁচটা সিন্দুক নিয়ে কনেকে বাখরুশিনদের ছোটোখাটো ঘরখানাতে কি আর তোলা যায়।

কড়ি দিয়ে কেনা জামাই তেরেন্তির নতুন ঘরে এসে উঠল দোমনা। বড়ো ঘরখানায় রঙ চঙ লাগালে। ঘরে কাঁথা কানি নয়, তিউমেনে কেনা খাঁটি জাজিম বিছালে মেজেয়, ঝালর দেওয়া পর্দা টাঙালে, সোনার রঙ করা বাসন কোসনে ঠাসা আলমারি বসালে। শাশুড়ীকে দিলে শাদা কলাইয়ের সামোভার, আর শ্বশুরকে একপ্রস্থ ভালো কাপড়। প্রতি উৎসবে নতুন নতুন দান।

কেনা জামাইয়ের জন্যে টাকা খরচে হাত টান করত না ন্যাতাওয়ালা দিয়াগিলেভ। আমাদের এগাঁয়ের প্রথম গ্রামোফোন বাজে তেরেন্তির ঘরে। সে গ্রামোফোন বেজেছিল যখন দিয়াগিলেভ হল দাদু, আর দোমনা হল মা।

সেই বৈঁচি ফলের এবার বিদায়। স্বমী স্ত্রী এবার যে চিরকালের বাঁধনে বাঁধা পড়ল সে কথা সারা গাঁকে শুনিয়ে দিল গ্রামোফোন। আর দাদু ন্যাতাওয়ালার নামে সে বাঁধনের নাম করা হল ত্রফিম।

ফুর্তি করেই গ্রামোফোন বাজল, কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়। গান শেষ করতে হল পাদ্রীকে। নাম-দীক্ষার পরেই মারা গেল গর্ভধারিণী। হপ্তার মধ্যেই। শীসের চেয়ে ভারি হল গম, ডালের চেয়ে আপেল। হৃষ্টপুষ্ট হয়ে জন্মেছিল ত্রফিম। দিয়াগিলেভ সব আত্মীয় স্বজনের সামনে নাতিকে ওজন করেছিল তার ন্যাতা-ওজনের পাল্লায়। গরব করেছিল, ভীমকায় দেহ! সে ভীম মাকে খেলে ...

মারা গেল দোমনা। তেরেন্তি হল বিপত্নীক। দিয়াগিলেভের শোক আর মানে না। আর আমার বৌ পেলাগেয়া কুজমিনিচনা তখন সবে জন্মেছে… ওর মা, আমার ভাবী শাশুড়ীর ভারি মায়া হল ঐ মা-মরা অনাথটাকে দেখে। দুটিকেই বুকের দুধ খাওয়াত। তার মানে ঐ বাচ্চা ত্রফিম আর আমার পেলাগেয়া কে এই থেকেই বুঝে নাও। তার মানে ত্রফিম বাখরুশিন আর আমার বৌ — এ দুটিতে পালিত ভাই বোন। তাই বরং ঐই বাকিটা বলুক, আমি ততক্ষণ পাইপ খেয়ে নিই।

৪

এ কাহিনীর অনুবর্তন পেলাগেয়া তুদোয়েভার মুখ থেকে আরো ভালোই শোনা গেল, সব বুড়োরাই তাই বললে।

তাই কাহিনীর ছিন্ন সূত্র বরং সেই তুলে নিক।

এই হল তার কথা:

দিন হতে হপ্তা, মাস হতে বছর, সূর্যের থামা নেই, কিন্তু কথার সীমা আছে। তেমন তেমন দশ কথায় জীবনের দশ বছর।

তেরেন্তি যে তার পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেছিল সেটা বছর না যেতেই লুশা ক্ষমা করে দিলে, তখন লোকে ভগমান মেনে চলত, সবকিছুতেই ভগমানের ইচ্ছে দেখত… ওর মরদকে ছিনিয়ে নিয়েছিল দোমনা, সেই দোমনাকেও লুশা ক্ষমা করলে। ক্ষমা না করে কি পারে, দোমনা যে মরণ ডেকে নিল। আর একা লুশাই যে সে কথা ভাবলে তা নয়। সবাই তাই ভাবলে, গোটা গাঁ-ই ছিল তেরেন্তির সঙ্গে লুশার বিয়ের পক্ষে। বুড়ো শেয়াল দিয়াগিলেভও বিয়েয় আসবে বললে। তার নাতি তো তেরেন্তির ঘরেই মানুষ হচ্ছে। নাতিটির জন্যে ছেলের নতুন মাকে তোয়াজ না করলে কি চলে।

গীর্জার বেদীর সামনে দাঁড়াবার আগে লুশা গেল দোমনার কবরে। সেখানে একটি শীতসহ বহুজীবী গোলাপ গাছ পুঁতে মরা দোমনার কাছে শপথ করলে, ত্রফিমের আপন মায়ের মতো হবে সে। সেই ভাবেই সে ছিল ঐ পোড়া বছরগুলো পর্যন্ত, যখন কলচাক এল… কিন্তু সূর্যের আগে আগে ছুটে লাভ নেই। লুশার আরো আঠারো বছর কাটলে তবে তো কলচাক…

লুশা তো এল তার স্বামীর ঘরে। তেরেন্তির ঘর আলো হয়ে উঠল। মায়ের কোলে উঠল এক বছরী ত্রফিম। প্রতি সকালে চোখ মেলেই সে ডাকত তার মা লুশাকে। ছেলেটা একেবারে গলার আওয়াজ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, চোখ মুখ থেকে একেবারে গায়ের তিলটি পর্যন্ত হুবহু তেরেন্তির মতো, এমন ছেলেকে ভালো না বেসে কেউ পারে। দোমনাই যেন তার কাছে পর, কাকের বাসায় যেন কোকিলের ছানা…

ক্রমে লুশার নিজেরই ছেলে হল। আমাদের কলখোজের ঐ সভাপতি। আমি তখন ছোটো, মনে আছে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে দেখতাম মায়ের কোলে। ত্রফিমের মতো সেও জন্মেছিল গাঁট্টা গোট্টা, তেমনি একগুঁয়ে। এখনো পর্যন্ত তেমনি। মাথায় একটা কিছু ঢুকল তো আর নড়চড় নেই। আর যা বলছি দেখে নিয়ো। আমাদের সবাইকে ও পুরনো বাখরুশি থেকে নয়া বাখরুশিতে ঠেলে নিয়ে যাবে… কিন্তু সন বছর গুলাব না, এক পাত্রে নতুন পুরনো মেশাব না।

মা হয়ে ফুটে উঠল লুশা। কুমারী অবস্থায় যা ছিল তার চেয়েও সুন্দরী। কোনো পোষাকেই ওর রূপ ঢাকা পড়ত না। মোটা সুতীর কাপড়েও চলত যেন মরালী। কোরা কাপড়েও রাণীর মতো। তেরেন্তি তার পুজোই করে আর কি। স্নানের ঘর থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসত কোলে করে। শ্বশুর শাশুড়ীও লুশাকে মান্য করত। বিবেকে লাগত। আর কেউ তো নয়, দোমনার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল তো ওরাই। সে কথা মুখে না আনলেও মনে তো পড়ত।

ন্যাতাওয়ালা দিয়াগিলেভও সবকিছু করত তার জন্যে, যা পারত এনে দিত। হাত দরাজ করলে। উপহার দিত। ডাকত মেয়ে বলে। বলত, ভগবান মা দিয়েছেন। কিন্তু মনে মনে যা ছিল সে ছিল। ঠিক করে রেখেছিল তার ন্যাতাকানির কারবার পরে চালাবে তার নাতি। কাল গুণত। যাই বলো, আপন বাপের কাছ থেকে তো আর ছেলে কেড়ে নেওয়া যায় না। ত্রফিম আপন পায়ে খাড়া হলে নিজেই চলে আসবে দাদুর ঘরে। সাইবেরীয় বাণিজ্য ব্যাঙ্কে সাত হাজার রুবল যে জমা রেখেছিল, সে তো যার তার জন্যে নয়। দিয়াগিলেভের বাড়িখানাও যাকে তাকে দেবার নয়… আপাতত একটু ভালোমানুষি করতে

হবে। লুশাকে ভালোবাসতে হবে, ইর্বিৎ মেলা থেকে কিনে আনতে হবে ওর জন্যে সিল্কের শাল, ওর ব্যাটা পিওতরের মাথায় হাত বুলাতে হবে।

নেকড়ে যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে শেয়ালের ভাব করে।

এই ভাবেই দিন চলল, কাল কাটল। তারপর সময় আসতেই সে তেরেন্তিকে খোঁটা দিতে লাগল, গির্জার ইশকুলের পর ত্রফিমকে সে শহরে পড়তে পাঠাতেও পারবে না। নিজের ন্যাতাকানির ফাঁদের মধ্যে নাতিটিকে টানলে, সৎমায়ের বিরুদ্ধে শুধু নয়, আপন বাপের বিরুদ্ধেও মনটা তার বিরূপ করে দিতে চাইল। বাখরুশিনদের ঘর থেকে ত্রফিমকে চোদ্দ বছর বয়সেই ছিনিয়ে নিতে যে পারল, তাতেই বোঝা যায় বুড়ো মনের মধ্যে কত বিষ, কত কটুকথাই না এতদিন জমিয়ে তুলেছিল। নাতিকে বোঝালে যে তার বাপ তার মাকে কখনো সত্যি ভালোবাসেনি। কোনো শয়তানী কোনো লাগানি-ভাঙ্গানিতেই পিছ-পা হল না ধেড়ে নেকড়েটা। রটাল, দোমনা ছেলে হতে গিয়ে মারা গেছে তা নয়। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাল, লুশা তার বনজ মারণ উচাটনে কবরে পাঠিয়েছে ত্রফিমের মাকে…

ধেড়েটা জানত কী করছে। নিজের ন্যাতাকানি হৃদয়টা এতদিন ঢেকে রেখেছিল। যে টাকা সে খরচ করেছে, যে ঘরে বাখরুশিনরা বাস করছে, তার শোধ তুলল এবার। নাতিটিকে বুড়ো গড়ে তুলল নেকড়ে করে।

ষোলো বছর বয়স হতে না হতেই দাদুর ডাকনামটা জুটল ত্রফিমের, “ধূসর নেকড়ে”।

আপন বাপের কাছ থেকে পর হয়ে গেল ত্রফিম। তার দাদুই হয়ে উঠল তার একমাত্র নয়নের আলো, ঠাকুমাই তার মা, আর ন্যাতাকানি হাড় শিং হল তার জীবিকা। তারই মতো গাঁ ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগল এই নওজোয়ান নেকেড়েটা, আর শুধু শিং খুরই নয়… যাতেই মুনাফা এমন সব কিছু সে কেনা বেচা করতে লাগল। কারবার করত গরু ঘোড়ার পাল নিয়ে, বেচারা নেশাখোরদের কাছ থেকে জিন লাগামও ছাড়ত না। নিজের সঙ্গে করেই ভোদকা নিয়ে ঘুরত, দুঃখীদের আর শুঁড়িখানায় ছুটতে হত না…

দু ভাইয়ের পথ তখনি ভিন্ন হয়ে যায়। একজন ছোটে নেকড়ের পথে শিকারের সন্ধানে। অন্যজন যায় সকলের সুখ শান্তির জন্যে লোকেদের সঙ্গে মেহনতের পথে। কিন্তু সে হল অন্য কথা। তার জন্যে আমার মেয়েলী গলায়

কুলাবে না। সে ব্যাপার কিরিল ভালো জানে, কেমন করে ত্রফিম হয়ে দাঁড়াল শাদা আর সতেরো বছর থেকে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ লড়তে শুরু করে সোভিয়েত-রাজের জন্যে।

৫

এবার বুড়ো তুদোয়েভের কাহিনী শুনতে হয়।

সেই যে বাজ ডাকল আর আমাদের সারা দেশ কেঁপে উঠল, তার পর আমি যখন বেদম জখম হয়ে চারিদিকে গুলি বিঁধে ক্রাচে ভর দিয়ে বাখরুশিতে ফিরলাম, তখন সোভিয়েত-রাজ পাকা হয়ে কায়েম হচ্ছে।

সে সময় আমাদের পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ একেবারেই ছোকরা, কিন্তু তখনই সে দরদী হিসাবে জনমিলিশিয়ার স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গেছে। আর ত্রফিম তখন বিশে পড়েছে; তার এক গোপন ভালোবাসা চলছে। মেয়েটি দূর শুতিওমির এক অনাথা। তাকে ডাকত দারিয়া আর বাপের নাম ধরলে দাঁড়ায় দারিয়া স্তেপানোভনা। বুঝেছেন কার কথা বলছি?

আর দারিয়া সে সময় ছিল যেন তোমার বসন্তের বার্চগাছ। হালকা বটে, পলকা নয়। সব কাজেই দড়। রুটি সেঁকা, ঘরদোর ধোয়া, কাপড়চোপড় কাচা... ঘরের সব কাজ করে, গরু দোয়। শিক্ষাও ছিল... লিখত, পড়ত, হিসেবও করতে পারত। সেই জন্যেই মনে লেগেছিল বুড়োর। অনাথা মেয়েটাকে ঘরে এনেছিল চাকরানী করে, জানত না ত্রফিমই তাকে পাঠিয়েছিল কাজের জন্যে। বিয়ের আগেই ঘরে এনে তুলেছিল বাপু কনেকে। ন্যাতাওয়ালা কিন্তু ত্রফিমের জন্যে অন্য মেয়ে ঠিক করে রেখেছিল। দোমনার মতোই তার না ছিল ছিরি, না ছিল ছাঁদ, কিন্তু ছিল একটা দোকান। মুদিখানা। মুদিখানাটা অবিশ্যি কেড়ে নিয়ে কী একটা গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল, কিন্তু সে আশা ছাড়েনি... দিয়াগিলেভ তার ফটকের ওপর লোক দেখিয়ে তুললে একটা লাল ঝাণ্ডা, জার আর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কত কিছু সব বললে, আর মনে মনে যা আঁটবার এঁটে রেখেছিল। অন্য রাজত্বের দিন গুণত। ভেড়ার ভেক ধরলে নেকড়ে। ভাবলে: সেই পাঁচ সালের মতো লোকে একটু হৈহল্লা দাঙ্গা হাঙ্গামা করছে, ফের সেই জার ফিরে আসবে।

মুদির সঙ্গে সর্ত করলে দিয়াগিলেভ। দেবপট নিয়ে ক্রুশে চুমু দিলে, শপথ করলে ত্রফিম হবে তারই জামাই।

ত্রফিম জানত, দারিয়াকে দাদু পছন্দ করবে না। জানত কিন্তু কেয়ার করলে না। নেকড়ে ছানা তখন পুরো জোয়ান হয়ে উঠেছে কিনা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দাদু কোথায় পুঁতে রেখেছে তা খুঁজে বের করলে। দাদুর সোনা দানার পাত্রটা খুঁড়ে বার করে পুঁতে রাখল অন্য জায়গায়। নিজের জায়গায়। আর দাদু যদি জিজ্ঞেস করে, "নিকোলায়ী মোহরগুলো গেল কোথায়।" তবে ত্রফিম তার কী জানে, সে তো তার না দেখেছে চোখে, না শুনেছে কানে।

ধেড়ে নেকড়ে দিয়াগিলেভ তার আদরের নাতিটিকে গড়ে তুলেছিল ঠিক নিজের মতো করেই।

শিগগিরই ফের আঁধার ঘনিয়ে এল। উফায় দেখা দিল এক শাদা সরকার। মাথা তুলতে লাগল সব চাপা শয়তানেরা। সৈন্যজমায়েত শুরু হল। ত্রফিম নিজে থেকেই পালাল। লোকে বললে, বনের মধ্যে কী একটা দলের সঙ্গে ভিড়েছে, এ দলটা নাকি নাম নিয়েছে "ধূসর নেকড়ে"। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে বলতে পারি না। দাদুর কাছ থেকে পাওয়া ত্রফিমের এ নামটা থেকেই দলটার নাম হয়েছিল কী না তাও জানি না... আমি নিজে শুধু এই দেখেছি: কলচাক যেই এল ঠিক তার আগেই নওজোয়ান ধূসর নেকড়েটি শাদা হয়ে যায়। ওই কি আর একলা। কেউ গির্জার ঘণ্টা বাজাতে লেগে গেল... কেউ ছুটল দেবপট নিয়ে কলচাকের ব্যাটালিয়নকে অভ্যর্থনা জানাতে।

শাদারা বেরিয়ে এল বন থেকে, লালেরা ঢুকল বনের ভেতরে।

দিয়াগিলেভের দো-আঁসলা ঘোড়ায় চেপে ত্রফিম চার জন লোক নিয়ে এল নিজেদের ঘরে... এল বাপের কাছে। তেরেন্তির কাছে।

'পিওতর কোথায়?'

'কেন, কী দরকার?' জিজ্ঞেস করে তার আপন বাপ।

জিজ্ঞেস করে আর চোখে চোখ রাখে ত্রফিমের। বাপ তো! কথা বলছে নিজের রক্তটার সঙ্গেই।

লোকে বলে, বাপের চোখ সইতে পারেনি ত্রফিম। চোখ নামিয়ে সে আবোল-তাবোল কৈফিয়ত দেয়:

'ওকে বাঁচাতে চাইছিলাম। ওর চোখ খুলে দিতে। ভেবেছিলাম ওর জামীন হব।'

জবাবে ছেলেকে আর কিছু বলেনি তেরেন্তি। এই বলেই ছাড়াছাড়ি। ত্রফিম চলে গেল উরাল ছাড়িয়ে। ভাবলে মস্কো দখল করবে। ভেবেছিল গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে ক্রেমলিনে ঢুকবে।

আমরা তখন পিওতরের সঙ্গে মানে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সঙ্গে বনের মধ্যে লুকিয়ে আছি। বনের মধ্যে ভালো ভালো জায়গা জানা ছিল লুশার। আমাদের খুঁজে বার করতে গেলে নিজেরাই পথ হারিয়ে বসবে। কিন্তু বনরক্ষকের মেয়ের কাছে সে সব ঘরের মতো। পেলমেনি পর্যন্ত নিয়ে আসত। শীতকালে অবিশ্যি বেদম খারাপ... ভালুকের গুহা অবিশ্যি শুকনো, গরম, তবু সে কি আর মানুষের যুগ্যি ... কিন্তু সে সব কষ্টের কথা আর বলে কী হবে ... টিকে রইলাম, ধন্যি তোকে লুশা, শাদাদের রাজত্ব শিগগিরই খতম হবে, সে কথা সেই আমাদের জানায়। শহরে দেখা দিতে লাগল উদ্বাস্তু। যারা একটু ধনী তারা সটান ছুটল ইর্কুতস্ক আর ক্রাস্নয়ার্স্কে। আর অন্যান্য সব 'মুদি-দোকানীরা' ঘোড়ায় চেপে ফিরতে লাগল ফ্রণ্ট থেকে।

ত্রফিমও শিগগিরই ফিরে এল। মস্কো যাবেন, কাজান পর্যন্তও যেতে হল না। ফিরল জখম হয়ে। লোকে বলে তেমন একটা কিছু জখম নয়। আঁচড় একটু। কিন্তু ডাক্তার তাকে জখমির মেয়াদ কেবলই বাড়িয়ে দেয়। টাকা দিয়ে সে সময় যা খুশি সার্টিফিকেট সই করিয়ে নেওয়া যেত। পাসপোর্টে পাদরি, ডীকন যা খুশি লিখিয়ে নেওয়া যেত। টাকার খেল শুধু। কিন্তু সেটা ব্যাপার নয় ... ব্যাপার এই যে ত্রফিমের আর একটা জখম ছিল যা সারবার নয়। বুকের মধ্যে। দারিয়াকে ভালোবাসত ত্রফিম ... বাপ তেরেন্তি লুশাকে যেমন ভালোবাসত তার চেয়ে কম নয় ... বোঝা যায় বুড়ো দিয়াগিলেভ তার মনটাকে একেবারে শুকনো করে দিতে পারেনি। বাপের রক্ত পুরোপুরি বিষিয়ে তুলতে পারেনি তার মধ্যে ...

দারিয়ার সঙ্গে ত্রফিম আইনে বাঁধা পড়ল। শহরে গেল। তারপর দিয়াগিলেভদের ঘরে ফিরে এল আইনসঙ্গত স্ত্রী দারিয়া স্তেপানোভনা বাখরুশিনাকে সঙ্গে করে।

মধুতে ডুব দেওয়া, দারিয়ার চোখে নিজের মূর্তি দেখা বেশিদিন চলল না ত্রফিমের... শহরের পেছনে গুরু গুরু করে উঠল লাল কামান। শাদারা চলে গেল তিউমেনে, তবলস্কে, তুরার ওপারে।

বাখরুশি থেকে ত্রফিম পালাল প্রায় সব শেষে। দাদুকে পিস্তল উঁচিয়ে হুমকি দিলে :

'আমার দারিয়ার যদি না যত্ন-আত্তি কর তাহলে মাটি থেকে তোমার লাশ খুঁড়ে তুলে হাড়ের নিকুচি করব...'

আর বছরখানেক পরে চিঠি এল। এক সৈন্যের চিঠি, ওমস্কের কাছে মারা পড়েছে ত্রফিম, সে নাকি তার কবর দিয়েছে। আর এই ছলনাটাকে পাকা করার জন্যে চিঠির ভেতর ছিল দারিয়ার একটা ফোটো, একেবারে বুকের কাছে তার বেঅনেটের ফোঁড়...

দাঁড়াল যেন বীরের মতো মরেছে ঠগটা। বেঅনেট লড়াইয়ে...

এই হল গে, তোমার সব কাহিনী বৃত্তান্ত। আর কী করে ও বেঁচে রইল, আমেরিকায় গিয়ে পেঁছিল, সেটা বাপু ওর কাছেই জিজ্ঞেস করতে হবে, যদি সে সত্যিই বাখরুশিতে আসে...

এই হল গে চল্লিশ বছরের প্রাকইতিহাস, এটা জানার পর আমরা এখন বর্তমানে ফিরতে পারি।

৬

সাবেক কালের মতো এখনো বোনা ও কাটার মাঝখানে ক্ষেত কাজে একটু ঢিলা পড়ে, অবশ্যি আগাছা তোলার কাজটা না ধরে।

খামার সভাপতিরও খানিকটা অবকাশ জুটত অপরাহ্নের দিকে। এই ফাঁকা ঘণ্টায় ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা পায়রা-ঘর বানাবার কথা দেওয়া হয়েছিল বসন্তের গোড়ায়।

পিওতর বাখরুশিনের ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে বিয়ে সাদি করে এদিক ওদিক সরে গেছে। ঘরে আছে শুধু সে আর বৌ ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, একটি নাতিও নেই।

ছেলেপিলে ভালোবাসত বাখরুশিন, ওদের জন্যে কম মনোযোগ দিত না। ছোটোদের ওপর বড়োদের অভিভাবকত্ব শুধু এই দিক থেকেই মনোযোগ নয়। শুধু দপ্তরী যত্ন নয়। সে তো আছেই। "ছেলেমেয়েদের সমস্যা"র উপর সিদ্ধান্ত নেয়নি এমন বোর্ড সভা হয়েছে কম। আজ নৌকার প্রশ্ন, কাল শীতের ছুটিতে শহর যাত্রা... ছেলেমেয়েদের বিশেষ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা... পাইওনিয়রদের ভবন নির্মাণ। খুব একটা বড়ো সড়ো নয়, তবু তো ভবন... সঙ্গীত বিদ্যালয়টাও পিওতর বাখরুশিনের হাতে গড়া। এটাও কিছু একটা আহা মরি নয়, তবু তো... তিনটে ক্লাস। পিয়ানো ক্লাস, বেহালা ক্লাস, লোক বাদ্যযন্ত্রের ক্লাস। বালালাইকা থেকে অ্যাকর্ডিয়ন। মাস্টাররা আসত শহর থেকে। একটি শুধু স্থায়ী শিক্ষিকা। সাধারণ যৌথখামারীদের মতো শ্রমদিন ইউনিট অনুসারে বেতন পায়।

সঙ্গীত স্কুলটি ছিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের গর্ব। প্রথম দিকে এ নিয়ে কেউ কেউ হাসাহাসি করেছিল... বলেছিল কলখোজে কোনো মাখনকল, কোনো ময়দাকল নেই কিন্তু আছে চারটে গ্র্যান্ড পিয়ানো... কিন্তু বছরও গেল না, তরুণ বাদ্যকারদের প্রথম দল বেরিয়ে আসতেই লোকে প্রশংসা করতে লাগল স্কুলটার।

এবারও প্রতিশ্রুতি মতো বাখরুশিন ছেলেদের নিয়ে একটা এজমালি পায়রা-ঘর বানাতে শুরু করল। দুই কিশোর পায়রাভক্তের মধ্যে মারামারি দেখে এই ঘর বানাবার কথা মনে আসে তার। এদের একজন অন্যের একটা কালো পায়রা ফুসলে আনে।

'ফেরত দে আমার পায়রা!'

'খালাসির পয়সা দে, দিয়ে দিচ্ছি!'

কথায় কথা বাড়ে। মারামারি। সাধারণ ব্যাপার। কোন ছেলে ছোকরাই বা মারামারি করে না। কিন্তু এই মারামারি দেখে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের মনে পড়েছিল পুরনো কুদিনের কথা, যখন পায়রা পোষার প্রধান আকর্ষণই ছিল অপরের পায়রা ফুসলিয়ে আনা, খালাসির পয়সা আদায় করা, বিক্রি করা, এমন কি চুরিও করা...

লড়াকুদের ছাড়িয়ে দিয়ে বাখরুশিন তখন বলেছিল, 'তোমরা ছোকরা যৌথখামারীরা একটা সাধারণ পায়রা-ঘর বানাও না কেন? ঝগড়া মারামারি

হবে না, ভাগিয়ে আনা, ভাগিয়ে দেওয়ার কোনো কথাই থাকে না তাহলে... বড়ো ঘরে পায়রাদেরও অনেক জায়গা থাকবে... আর তোমরাও মস্ত একদল পায়রাকে আকাশে খেলাতে পারবে...'

ছেলে ছোকরারা কাজের লোক। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন শুরু হল।

'আর তক্তা কে দেবে আমাদের, পিওতর কাকু?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'তারের জালও চাই... জাল নইলে আবার পায়রা-ঘর কিসের?' বললে দ্বিতীয়।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ "এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার" প্রতিশ্রুতি দিলে ও মেয়াদ ঠিক করে দিলে, কোন সময়ের মধ্যে গাঁয়ের সমস্ত পায়রাভক্তদের সাধারণ সভায় নিষ্পত্তি করতে হবে, ভবিষ্যতে কীভাবে থাকবে পায়রারা।

সে সভা বসেছিল। যদিও তখন পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সময় ছিল না। ত্রফিমের আগমনের ব্যাপারটা মাথা থেকে যাচ্ছিল না। বাখরুশিন এর ওপর খুব একটা তাৎপর্য আরোপ না করলেও জুতোর মধ্যে কাঁকরের মতো তা বিঁধছিল। ত্রফিমের পুনরুদয় তার পক্ষে এবং দারিয়ার পক্ষেও খুব একটা অপমানকর না হলেও নিশ্চয় নেহাৎ প্রীতিকরও নয়।

যতই কেন না বলো, যতই কেন না বোঝাও, ত্রফিম যে তার আপন ভাই। এক মায়ের পেটে না হলেও তফাৎটা কী? ঘটনাটা ঘটনাই। ও এসে বলবে, "এলাম ভাই।" বুঝলে না — ভাই! আর একথা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ওকে বলতে পারবে না, "আমি আবার তোর ভাই কোথায়?" আর একথা বললেই বা কী, সবাই তো জানে, সে ওর ভাই।

বাখরুশিন তার প্রতিষ্ঠা বাঁচিয়ে চলত। বলতে কি, নিজেকে সে কঠোর সীমার মধ্যেই রাখত। কিন্তু এটা সে করত নিজের জন্যে নয়, সভাপতির গদিটা সে যেমন নিজের জন্যে আঁকড়ে থাকেনি; তার একান্ত বিশ্বাস ছিল যে এ পদের জন্যে তাকেই দরকার, দরকার আরো এই জন্যে যে বাখরুশির অগ্রণী যৌথখামার "মহা পরিবর্তন"এর সঙ্গে কতকগুলি পেছিয়ে থাকা যৌথখামার সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে যদিও বেশ কঠোর লড়াই করে, ঝগড়াঝাঁটি বাদ যায়নি। এই ছোটো খামারগুলো যে স্রেফ বড়ো খামারটার মধ্যে লীন হয়ে যাচ্ছে না, তা দেখাবার জন্যে সে তখন প্রস্তাব করেছিল সংযুক্ত খামারের নতুন নাম করা হোক। নাম করা হোক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির

২১শ কংগ্রেসের নামে। যারা তখন জল ঘোলা করেছিল ও বাখরুশিনকে বলেছিল জবরদখলী, তারাই এখন পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের গুণগান করছে এই বলে যে সকলের স্বার্থের সে ন্যায্য রক্ষক। কিন্তু দিন তিনেক আগে ফের সেই পুরনো কাসুন্দি শুরু হয়েছিল। কলখোজের প্রান্তবর্তী একটা গাঁয়ের এক বুড়ি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে খুব এক চোট নেয় এই জন্যে যে সে তার চালায় টিন জোগাড়ে সাহায্য করেনি। বলেছিল, “দেখ না কেন, এক ভাই আমেরিকায় কাজ গুছাচ্ছে, আর এক ভাই এখানে মাতব্বরি করছে।”

একথায় অবিশ্যি নজর না দিলেও চলে, তবু…

বাখরুশিনের গভীর বিশ্বাস ছিল এই যে কলখোজের সভাপতির পদ অধিকার যে করবে, কোনো ক্রমেই সমালোচনার উপলক্ষ হওয়া তার উচিত নয়।

ছেলেছোকরাদের নিয়ে পায়রা-ঘর শুরু করতে পেরে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ এখন খুশি হয়ে উঠল। অবসর সময়টায় ভাইয়ের চিন্তা থেকে সে মুক্তি পেল পায়রা-ঘরে। তাছাড়া পায়রা-ঘর তৈরি করতে গিয়ে একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছিল তার — ছোটো একটা পাখি খামার গড়ার কথাটা সে ছেলেদের সামনে রাখলে।

‘চমৎকার হবে! পায়রার সঙ্গে মুরগি… মুরগির সঙ্গে পায়রা… শ দুয়েক মুরগি ছানা আজড়াতে পারলে ফের মুনাফা, বুঝেছিস। সে টাকায় বছর দুই একের মধ্যে শেয়াল কেনা যেতে পারে। নয়ত খরগোস… চাই কি একটা হরিণ খামারও বানানো যায়…’

ছেলে ছোকরারা চেঁচামেচি শুরু করল, ডিগবাজি খেল আনন্দে। সব চেয়ে খুশি হয়ে উঠল বরিস — দারিয়া স্তেপানোভনার নাতি, দিদিমার কাছে এসেছে ছুটিতে। এ ছেলেটা নেহাৎ অন্য সকলের মতো নয়। এ হল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের আত্মীয়। পিওতর কাকুর বলা যেতে পারে সম্পর্কে নাতি।

“এহ্, বরিস যদি জানত কে ওর আপন দাদু…” মনে মনে ভাবলে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

ত্রফিমের আগমন কত অবাঞ্ছিত তা এখানেও ফের দেখা যাচ্ছে…

ইতিমধ্যে কাজের জায়গাটায় নতুন নতুন মুখ দেখা গেল — মুরগি পালকরা। এর জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল পাইওনিয়র নেতা। তার

ভয়ানক ইচ্ছে ছিল পাইওনিয়রদের "জ্বতে" দেয়। আর নির্মাণ কাজে "জোতা" হল তাদেরও ...

ছেলেমেয়েদের মধ্যে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচও যেন নিজেই ছেলেমান্ষ হয়ে উঠত। ওদের উৎসাহ দিতে গিয়ে নিজেই উৎসাহিত হয়ে উঠল সে। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বয়স্করাও মেতে উঠল। ছেলেবেলায় সম্ভবত যে স্বখ ওরা পায়নি, সেটা পেতে চাইলে তাদের বার্ধক্য না বলা গেলেও পরিণত বয়সে।

সভাপতি সবচেয়ে ভালোবাসত ছেলেমেয়েদের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠতে, তাদের সঙ্গে এমন কি খেলায় নামতে, কারো সামনেই তাতে তার কোনো লজ্জা হত না। এই ছিল তার অবসরের সেরা সময়। কেউ যদি এ নিয়ে খ্বব ঠারেঠোরেও ঠাট্টা করত তাহলে মোক্ষম বাক্যবাণে সে তার ঠাট্টা ঘ্বচিয়ে দিত।

এই প্রসঙ্গে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কথার ধরন সম্পর্কে কিছ্বটা বলে নেওয়া দরকার। নানান লোকের সঙ্গে ওর নানান ধরন। যেমন ব্বড়ো তুদোয়েভের সঙ্গে কথা বলার সময় বাখর্বশিন ব্যবহার করে দ্বর অতীতের যত বিস্মৃত শব্দ। সেগ্বলো তাকে খ্বঁজে পেতে হয় না। কোথা থেকে আপনিই এসে পড়ে জিভে। আবার অভ্যাগত যে বক্তা মাম্বলী কথার চেয়ে বিশেষ বিশেষ বই থেকে বাছাই করা শব্দ ব্যবহার করতে পছন্দ করে, তার সঙ্গে বাখর্বশিন বলে অন্য ভাষায়। ছেলেমেয়েদের কাছে আবার বিশেষ এক ধরনের ভাষা তার। ও নিজেই স্বীকার করে:

'আমার ভেতরে কেমন একটা রিলে যন্ত্র কাজ করে, কার সঙ্গে কথা বলছি সেই অন্বসারে আপনা থেকেই তার স্বইচ চাল্ব হয়ে যায়।'

কিন্তু এটা হল প্রসঙ্গ ক্রমে, পরের অধ্যায়গ্বলির পক্ষে একটা টীকাস্বর্প।

পায়রা-ম্বরগি খামারটা বেশ ভালোই দাঁড়াল। ওপরে পায়রা, নিচে ম্বরগি। ডিউটিরত'র জন্যে একটা গ্বমটি আর দানা পানির জন্যে একটা চালা। ছেলেমেয়েদের উল্লাস আর ধরে না, এমন বয়স্ক অথচ এমন আপন আর ঘনিষ্ঠ একটি লোককে পেয়ে ভারি আনন্দ তাদের।

তব্ব আমেরিকানদের আগমনের ব্যাপারটা কিন্তু তার মাথা থেকে গেল না।

৭

ছেলেদের খামার উঠল যেখানে সেই লেনিভি চড়াই থেকে বেশ সন্ধ্যা করে ফিরে বাখরুশিন তার বৌকে বললে:

'জানো ইয়েলেনা, ত্রফিমের আসার ব্যাপারটা নিয়ে মন না দেবার যতই ভাব করি না কেন, সেটা ঠিক ফুটছে না...'

যারা কখনো মুষড়ে পড়ে না ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা বাখরুশিনা তাদেরই একজন; নানা ভাবে স্বামীকে চাঙ্গা করে তুলতে চাইত সে। তবু সেও এ আগমনটাকে অভিহিত করেছিল "আঁধার দুর্যোগ" বলে।

'কেন যে এসব ঝামেলা আমাদের ঘাড়েই এসে পড়ছে, পিওতর,' উত্তর দিলে সে। 'দারিয়াটা বেশ বুদ্ধি করেছে... ওর অপমানটা নারীর অপমান। সবাই সেটা বুঝবে... আমরা একশ রাত ভেবে ভেবেও কিছু ফন্দি বার করতে পারব না। কিন্তু ভাবার কী আছে?' স্বামীর দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করলে ও, 'আমরা ওর টাকা ধারি নাকি? কোনো দোষ করেছি ওর কাছে? নাকি যদি কিছু বলতেই হয় তো কথা ফুটবে না আমাদের মুখে?'

'কথা জোগাবে ঠিকই। সবচেয়ে সোজা কাজই হল কথা। খুব বেশি কথারও দরকার হবে না। চিঠি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ও এত বছরেও বেশি দূর এগোয়নি। আমার দুশ্চিন্তা অন্য।'

বরাবরের মতো বউয়ের পাশে বসে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ কী ভাবছে তা বলে গেল:

'বুঝেছিস ইয়েলেনা, এই এত বছর আমাদের কলখোজটা নিজের পায়েই চলেছে। স্বদেশের ভেতরে, স্বদেশের সঙ্গে সঙ্গে। সব কিছুই ছিল পরিষ্কার। এই হল গে তোমার মোট রাষ্ট্রীয় কাজ, এইটুকু তোমার কলখোজের ভাগ। নিষ্পত্তি করো। লড়ো। এগিয়ে চলো। সব সময়েই যে সব ঠিকঠাক চলেছে তা নয়। কিন্তু ভুলচুক ব্যর্থতা যা ঘটেছে তা ঘটেছে নিজেদের ঘরে। দেশের ভেতরে। আর এখন দেখা যাচ্ছে, বাখরুশি নিয়ে অন্যেও মাথা ঘামাচ্ছে... আমেরিকা।'

হেসে উঠল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, 'কী যে বলো পিওতর, ত্রফিম তো আর আমেরিকা নয়।'

A-2995

'তা বটে,' সায় দিল বাখরুশিন, 'ত্রফিম আমেরিকা নয়; কিন্তু ওর সঙ্গে যে আসছে টেনর। সাংবাদিক। আর সাংবাদিক মানে একটা চোখ। কার চোখ? আসছেই বা কেন? কিছুই দেখবে না, কিছুই বলবে না, সেই জন্যে কি?..'

'নয় তাই, কিন্তু কী হল তাতে?'

'কিছুই না। শুধু টেনর যদি হয় চোখ, তবে খুবই সম্ভব ত্রফিম আর একটা চোখ। মানে দুটি চোখ। একটা দেখে, অন্যটা সাহায্য করে।'

'বেশ তো দেখুক না। আমাদের তাতে কী?.. আমাদের কী এসে যায়, পিওতর,' স্বামীকে ফের শান্ত করতে চাইল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ কিন্তু নিজের কথা ছাড়ল না:

'আমাদের হয়ত কিছুই এসে যায় না, যদি গাঁটুকুই দেখি... কিন্তু যদি আরো একটু চোখ মেলি তবে আরো দেখতে হয়। আমাদের কাছে কলখোজটা হল কলখোজ, আর ওদের কাছে এ হল সমাজতান্ত্রিক চাষের একটা অংশ, তার ওপর রায় দেবে ওরা সবার সামনে... কাগজে ছাপিয়ে... আর সোজা কথায় বললে, তা করবে খুব একটা সুমতলব নিয়ে নয়... বুঝছিস না ইয়েলেনা, বলশয় থিয়েটরের উলানোভা উলানোভাই, কিন্তু আমেরিকার কাছে সে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন!'

'বুঝব না কেন, বুঝি,' বললে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, 'আমাদের কলখোজ আর গালিনা উলানোভার মধ্যে তফাৎটা খুবই বুঝি। গোটা আমেরিকা দেখেছে উলানোভাকে... সবাই বুঝেছে কেমন সে নাচে... যত কিছু লেখ না লেখ, এই খুঁত, সেই খুঁত ধরো, কেউ তোমায় বিশ্বাস করবে না। আর আমাদের কলখোজের ওপর রায় দেবে কেবল দুজন — ত্রফিম আর টেনর। আর আমাদের "নাচ" সম্পর্কে যা ওরা লিখবে, তাই লোকে জানবে।'

'এই!' জোরে চেঁচিয়ে উঠল বাখরুশিন, 'এই একটা কথার মতো কথা বলেছিস তুই। আমাদের "নাচ" সম্পর্কে ওরা যাই লিখবে, ঠিক সেই ভাবে আমাদের দেখবে মার্কিন পাঠকেরা। অবিশ্যি,' খানিকটা ভেবে নিয়ে বলে চলল বাখরুশিন, 'একটা দুটো কাগজ দিয়ে আমেরিকার আবহাওয়া গড়া যায় না, কিন্তু ভিজিয়ে দেওয়া যায়... বাখরুশির গলৎ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের

সাফল্য ঢাকা না গেলেও যত ছোটোই হোক একটা কালো ছায়া তো ফেলতে পারে। আর আমি চাই বা না চাই, এ নিয়ে ভাবতেই হবে, আমি যেন আমি নই, সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন।'

স্বামী স্ত্রীর এই অসাধারণ আলাপ অনেকক্ষণ ধরে চলে। দুজনেই আপনা থেকেই সিদ্ধান্তে এল: বেতারে "আমেরিকার কণ্ঠ" ধরতে হবে। এ যেন সাক্ষাৎকারের একটা প্রস্তুতি ... আগে কখনো এ ব্রডকাস্ট তারা শোনেনি, জানত না কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, ইয়েলেনা ধরে বসল বাখের একটা অর্গান সঙ্গীত।

পরিচিত সুমহান ধ্বনিটা কানে যেতেই বাখরুশিন বৌয়ের হাত চেপে ধরে বললে:

'চুলোয় যাক তোর "মার্কিন কণ্ঠ"। বাখকে শোনা যাক। এই হল গে আসল অনাবাদী জমি এলাকা। তার শেষ নেই, সীমা নেই — চারিপাশ ঘিরে আলো।'

আস্তে আস্তে বৌয়ের হাতে হাত বুলিয়ে ও বললে:

'আমাদের কলকারখানাগুলো হারমোনিয়ম তৈরি করে না কেন। অর্গানের মতোই, শুধু আওয়াজটা একটু নিচু।'

ইথার তরঙ্গের এই যে প্রাপ্তিটায় স্বামী আচ্ছন্ন হয়েছে তাতে খুশি হয়ে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা ভাবল: আমার এই মানুষটা যে কেমন তা কেউই জানে না। হয়ত বা সে নিজেও জানে না তার হৃদয়ের সব কোণ, সে হৃদয় এই সঙ্গীতের মতোই সুপ্রসর।

আর ধ্বনিত হয়ে উঠল বাখ ... ধ্বনিত হয়ে উঠল সারা বিশ্বে। হয়ত বা সে সঙ্গীত শুনলে আকাশের তারারাও। সুমহান ধ্বনিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে আর ত্রফিম তার কাছে এখন মনে হল যেন সেই পুরনো জলা বড়ো চিশ্চা'র একটা খুদে গুঁড়ি আর টেনর যেন সে গুঁড়ির ওপর একটা ব্যাঙের ছাতা ...

'যায় যাক ওরা ... ওদের নিয়ে আমাদের ভাবনা নেই, বউ।'

'তা নয় ত কি, পিওতর, তা নয় ত কি ...' নিদ্রার আয়োজনে চওড়া বিছানাটা গোছাতে গোছাতে বললে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। কিন্তু ...

কিন্তু বাখ থেমে গেল… আর বড়ো চিশ্চার গুঁড়িটা বড়ো হয়ে উঠল আকারে… পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে তা রেহাই দেবে না। স্বপ্নে হানা দেবে তাকে।

বেশ, তাই দিক। কাটিয়ে ওঠা যাবে…

৮

আমেরিকা থেকে আসা চিঠিটা নিয়ে স্তেকোলনিকভের সঙ্গে বাখরুশিন যেদিন দেখা করতে যায় সেদিনও এটা তার কাছে পরিষ্কার ছিল না, ত্রফিমের আগমনটা তার কী ভাবে নেওয়া উচিত। লেখা কথাগুলো খাঁটি বলে ধরে নেবে, নাকি এটা কোনো একটা গোপন মতলব চাপা দেবার ব্যাপার? আর এই “কী একটা গোপন মতলবের” কথা জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারি স্তেকোলনিকভ আর বাখরুশিন দুজনেরই মনে এসেছিল কারণ ত্রফিম একা আসছে না, আসছে টেনরের সঙ্গে। আর চিঠি থেকে যা দেখা যাচ্ছে, এই টেনর আসছে দুই ভাইয়ের সাক্ষাতের কথা লিখবে বলে।

কেন? এরা কি এতই সুবিখ্যাত লোক যে তাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার খবরের কাগজের পাতায় স্থান পাবে?

এ ধাঁধার সমাধানে কোনো সিদ্ধান্ত টানার মতো তথ্য বাখরুশিন ও স্তেকোলনিকভের হাতে খুবই কম ছিল। তারপর দুদিন পরে ফিওদর পেত্রভিচ স্তেকোলনিকভ নিজেই যখন হাজির হল বাখরুশিনের কাছে, তখন ব্যাপারটা সরল না হলেও অনেক বোধগম্য হয়ে উঠল।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে পাওয়া গেল ‘অনাবাদী মাঠে’। যুগের পর যুগ পতিত জমি হিসাবে গণ্য হওয়ার পর বড়ো চিশ্চাকে পুনরুদ্ধার করে এখন ঐ নাম দেওয়া হয়েছে।

‘খবর আছে কিছু ফিওদর পেত্রভিচ?’

বাখরুশিনের হাত টেনে নিয়ে নমস্কারের বদলে বললে স্তেকোলনিকভ, ‘খবরই বটে!’

‘বলে ফ্যালো…’

‘দাঁড়াও, বসার মতো একটা শুকনো জায়গা দেখি।’

ফিওদর পেত্রভিচকে নজর করে চোখ কোঁচকাল বাখরুশিন।

'যাদের কিছুটা বয়স কম তাদের খোঁচাও গে; আমার বড়াই করার নেই। বড়াই করবে ওরা,' বাখরুশিন দেখাল বুলডজারগুলোর দিকে, বছর কুড়ি বয়সের ছোকরারা তা চালাচ্ছে, 'আমি ওদের মতো জোয়ান নই। শুধু একটা কথা বলব: এ জলায় আজকাল একটা পাখিও তেষ্টা মেটাতে পারবে না।'

দুহাজার হেক্টর ভূমি, তার সিকিভাগ চষে ফেলা হয়েছে, ঘাসের কার্পেট ঢাকা এই ভূমির ওপর দিয়ে স্তেকোলনিকভকে নিয়ে গেল বাখরুশিন।

বাখরুশিনের সঙ্গে স্তেকোলনিকভের ফ্রণ্টলাইনী দোস্তির কথাটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। জখম হওয়ার দরুন বাখরুশিন তার বন্ধুর সঙ্গে এলবা পর্যন্ত যেতে পারেনি বটে, কিন্তু বাখরুশিতে ফিরে আসার পর থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ হারায়নি। তরুণ কৃষিবিশেষজ্ঞ স্তেকোলনিকভকে উদ্দীপিত চিঠি লিখে লিখে বাখরুশিন তাকে বাখরুশিতে আসতে উৎসাহিত করে, কথা দেয়, "ব্যয় ও ঝুঁকির পরোয়া না করে পরীক্ষার অপরিসীম সুযোগ সে এখানে পাবে..." স্তেকোলনিকভ বাখরুশিতে প্রথমে এসেছিল একা, পরে পেনজা থেকে নিয়ে আসে মাকে, পরিশেষে তরুণী শিক্ষিকা নাদেজদা তশ্চাকভাকে বিয়ে করে স্থিতু হয়ে বসে।

এটা প্রায় পনের বছর আগেকার কথা। এই লক্ষণীয় উদ্যোগী কৃষিবিদকে শিগগিরই পার্টি কাজে টেনে নেওয়া হয়। তারপর এখন জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারি হলেও স্তেকোলনিকভ তার ব্যাটালিয়ন-সেনাপতির চেহারা হারায়নি। "অনাবাদী মাঠের" ওপর দিয়ে বাখরুশিনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে যেন ভবিষ্যতের একটা খামারী ক্ষেত দেখছিল না, দেখছিল নতুন একটা লড়াইয়ের জায়গা।

'তোর কমসোমল সদস্যরা বেশ একটা ঝাঁপানে-ভুঁই খালাস করে ফেলেছে।' পুনরুদ্ধার করা জমিটার তারিফ করলে ও, 'কিন্তু তা নিয়ে চুপ করে আছিস কেন?'

'প্রথমত এখনই চেঁচাবার মতো কিছু নেই...' বাখরুশিন বললে, 'আর দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট শ্রম ব্রিগেড এ জমিটা তুলে ধরে নিজেদের নাম কিনতে চায়নি। এটা খানিকটা অপ্রয়োজন, অন্যায় বিনয়। তবু বিনয় বই কি...

আর তৃতীয়ত, তৃতীয়ত দয়া করে বস। দেখ কি চমৎকার ঢিপি। আরামকেদারার চেয়ে ভালোই। বস, আরাম পাবি।'

বাখরুশিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্তেকোলনিকভ বসল তার মুখোমুখি একটা শুকনো স্তূপের ওপর। তারপর তার অফিসারী চামড়ার ব্যাগ থেকে বার করলে দুটো শাদা কাগজ। এগিয়ে দিলে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের দিকে।

'এ কাগজ হল টাস বুলেটিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের টেলিগ্রাফ এজেন্সির, বুঝেছিস?'

'আপাতত বুঝেছি,' বললে বাখরুশিন, 'পরেরটা কী বলতে পারি না।'

'তবে এবার পরের কথা। আমাদের নিউ ইয়র্কের সংবাদদাতা জানাচ্ছে ... তুই নিজে পড়বি নাকি আমি?'

'তুই পড়। পরে আমি পড়ে নেব। গোপন কিছু?'

'আরে না, না ... বড়ো বড়ো কাগজে এটা হয়ত উঠবে না, কিন্তু আমাদের কাগজে হয়ত তোলা যাবে। শোন।'

স্তেকোলনিকভ বুলেটিনের লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে পড়তে শুরু করল:

'"... পত্রিকাটি পরে নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে একজন খামারী ত্রফিম বাখরুশিনের সোভিয়েত ভ্রমণের উল্লেখ করেছে। ত্রফিম বাখরুশিন পের্ম গুবের্নিয়ার ভূতপূর্ব রুশ চাষী ১৯২০ সালে আমেরিকায় চলে যায়। মরশুমী মজুর হিসাবে শুরু করে বাখরুশিন কিছু টাকা জমায় ও খামার মালিক হয়ে দাঁড়ায়। উদ্যোগী পরিশ্রমী খামারী হিসেবে চল্লিশ বছরে সে বেশ ধনী হয়ে ওঠে। এখন জীবনের অপরার্ধে সে স্বগ্রামের জন্মস্থানে গিয়ে মা-বাপের প্রিয়তম কবরে ফুল দেবে স্থির করেছে। সোভিয়েত সংবাদপত্র থেকে বাখরুশিন জানতে পারে যে তার ভাই পিওতর বাখরুশিন স্বগ্রামেই বাস করছে ও দুগ্ধবতী গরুর একটা নতুন জাত তোলার জন্যে সম্প্রতি সরকারের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করেছে।"'

'কী মনে হচ্ছে তোর, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ?' জিজ্ঞেস করলে স্তেকোলনিকভ।

'তা সবই তো বেশ যুক্তিযুক্ত, পরিষ্কার ... জানি না পরে কী আছে।'

'শোন তাহলে। পরের খবরটা অমন যুক্তিযুক্ত আর পরিষ্কার নয়।'

স্তেকোলনিকভ ফের পড়তে শুরু করল:

'"সংবাদপত্রের ধারণা যে মার্কিন খামারপতি ও রুশ কলখোজী এই দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎকার দুই বৃহৎ দেশের মৈত্রী বর্ধন, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের দিক দিয়ে সাধারণ আগ্রহ জাগাতে পারে। সুবিখ্যাত সাংবাদিক জন টেনর বলেন, "বোঝা যায়, চল্লিশ বছর অদর্শনের পর বলার মতো কথা দু ভাইয়ের বেশ থাকবে। এ সাক্ষাৎ যদিও তেমন উচ্চস্তরে ও দুনিয়ার তেমন একটা বিখ্যাত জনপদে ঘটছে না, তবু —" টেনর আরো বলেন, "এটা মার্কিন ও সোভিয়েত পাঠকদের কাছে ব্যাপক আগ্রহের বিষয় হওয়া সম্ভব। সেই জন্যই, আমি মিঃ ত্রফিম বাখরুশিনের সহযাত্রী হতে কৌতূহলী হয়েছি, দুই ভিন্ন দুনিয়ার দুই ভাইয়ের এই অসাধারণ সাক্ষাৎকারের সাক্ষী হওয়া যাবে তাতে।"'

'বাস?'

'বাস,' জবাব দিলে জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারি।

'কোনো রকম মন্তব্য কি টীকা কিছু নেই?..'

'আছে, কিন্তু সেটা পরে; আগে বল, এটা শুনে কী মনে হল?'

'শয়তান জানে। কী বলা যায় বুঝতে পারছি না,' স্বীকার করলে বাখরুশিন, 'একদিক থেকে সবই বেশ সঙ্গত... লোকটা বুড়ো হয়েছে। জন্মভূমির জন্যে মন কাঁদছে। জীবনের শেষাশেষি স্বগ্রামে ফিরতে চায়। খানিকটা বিবেকও আছে যেন... হয়ত বা সেটা বিঁধছে... আর ও যদি সত্যি সত্যিই ধর্মবিশ্বাসী হয় তাহলে ভগবানকেও ধরে নাও। পাপক্ষালন করতে চায়... কিন্তু এ হল একদিক।'

'আর অন্য দিক?'

'আর অন্য দিকে আবার, ফিওদর পেত্রভিচ, এই টেনর-না-ফেনর... নিউ ইয়র্ক থেকে বাখরুশিতে আসা কাগজে প্রবন্ধ লেখার জন্যে — আমার মনে হয় এটা একটু বেশি খরচসাপেক্ষ।'

'তা বটে, কিন্তু বইয়ের জন্যে হয়ত সময় আর ডলার খরচ করা যায়,' বাখরুশিনের ভাবনায় সাহায্য করার জন্যেই যেন মন্তব্য করল স্তেকোলনিকভ।

'কোন বইয়ের জন্যে? কীসের বই?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কীসের আবার। তোমাদের কলখোজের সাফল্য সম্বন্ধে। পূর্ণোদ্যমে কমিউনিজম নির্মাণের কাজ শুরু সম্বন্ধে। আমাদের সমাজব্যবস্থার যশকীর্তনের জন্যে...' অল্প একটু পরিহাসের সুরে বলল স্তেকোলনিকভ।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ মাথা নোয়ালে। যে স্তূপটার ওপর সে বসেছিল সেটা হঠাৎ ধ্বসে গেল। মৃদু একটা গালাগালি দিয়ে সে সরে বসল অন্য একটা স্তূপে। কোমরে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'এটা তোর নিজের ভাবনা ফিওদর পেত্রভিচ, নাকি কারো সঙ্গে পরামর্শ করেছিস?'

'একজনের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, তোকেও তা করতে বলি।'

'নাম কী তার?'

'কাণ্ডজ্ঞান পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, কাণ্ডজ্ঞান।'

'কাণ্ডজ্ঞান আমায় ডোবাবে না তো?'

'কী যে বলিস! এ হল আমাদের বিশ্বাসী লড়ুয়ে পার্টি কমরেড।'

'সে কথা ঠিক...' বাখরুশিন ফের ভাবনায় ডুবল।

স্তেকোলনিকভ সূর্যের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখল। বাখরুশিনের চোখে পড়ায় জিজ্ঞেস করলে:

'তার মানে, সেই যে বলে, সময় গেছে, সাক্ষাৎকার শেষ, তাই নাকি ফিওদর পেত্রভিচ?'

'কী যে বলিস... আমাদের কথা তো এখনো শুরুই হয়নি। আজ সন্ধ্যায় তোর জিমোলস্তকে লাগাম পরিয়ে আটটা নাগাদ চলে আসিস আমাদের নতুন টেলিভিজন দেখতে। একেবারে আমেরিকা সম্বন্ধেই কী একটা অনুষ্ঠান আছে... এ রকম অনুষ্ঠান এবার থেকে আমাদের বাদ দেওয়া ঠিক হবে না...'

'তা বটে।'

'তাহলে তাই — অপেক্ষা করব। কথাবার্তা বলা যাবে।'

রাস্তার কাছে অপেক্ষমান মোটরগাড়ি পর্যন্ত ফিওদর পেত্রভিচকে এগিয়ে দিল বাখরুশিন, তারপর আগের জায়গায় ফিরল। ভাবনাগুলো তার গুছিয়ে নেওয়া দরকার।

৯

টাস বুলেটিনটার পাতাদুটো ফের পড়ে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ নিজের কয়েকটা আন্দাজ টানতে চাইল।

তার প্রথম ভাবনাটা হল ভারি প্রীতিকর। এই সিদ্ধান্ত টানল: ত্রফিমকে তার বার্ধক্যের ধর্মবিশ্বাস পেয়ে বসেছে, সত্যি সত্যিই সে পাপক্ষালনের জন্য আসছে আর "দুনিয়া কাঁপানো দশদিন" এই চমৎকার বইখানার লেখক জন রীডের মতো জন টেনরও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২১শ কংগ্রেসের নামাঙ্কিত কলখোজটি সম্বন্ধে সত্য কথা সব লিখে সাধারণভাবে সোভিয়েত ব্যবস্থার এবং বিশেষ করে কলখোজ জীবনের মর্মকথা ভালো করে বুঝতে সাহায্য করবে মার্কিনদের।

এই সিদ্ধান্তটায় বাখরুশিনের বিশ্বাস ছিল কম, কিন্তু সেটা সে নাকচ করলে না, অন্তত নিরপেক্ষতা ও ভালো দিকটা দেখবার ইচ্ছার খাতিরে।

দ্বিতীয় আন্দাজটা হল এই যে অজানা ঐ সেয়ানাটা জন টেনর বুড়ো ত্রফিমের সঙ্গ ধরেছে এই জন্যে যাতে তার সাহায্যে বেশি করে দেখবে, বেশি করে শুনবে আর পরে বেশি করে কালি ঢালবে।

বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এমন কাহিনী বাখরুশিনের বেশ জানা ছিল। যতক্ষণ অতিথি ততক্ষণ প্রশংসা আর ধরে না, আর যেই ফিরে গেল অমনি শুরু করল কালি মাখাতে, নির্লজ্জের মতো যত সব অলীক কথা বানিয়ে বানিয়ে কাদা ছুড়তে।

তৃতীয় ধারণাটা হল এই যে ত্রফিম ও টেনর দুজনকেই পাঠাচ্ছে কোনো এক তৃতীয় ব্যক্তি, যে এ দুজনের সোভিয়েত যাত্রার কুমতলব চাপা দিয়েছে বেশ একটা যুতসই অজুহাত দেখিয়ে।

এই তৃতীয় পক্ষ কে হতে পারে? কোনো প্রকাশক হয়ত, নয়ত এমন কেউ যে জল ঘোলা করতে চায়? বাখরুশিন এ নিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টাও করল না। নাম তার যাই হোক তাতে কী এসে যায়? এই তৃতীয় অনুমানের মূলকথা তো আর তাতে বদলাচ্ছে না।

এই তৃতীয় ও সর্ব মন্দ অনুমানটায় বাখরুশিনের মনে হল জন টেনর যেন এক সমুদ্রপারের পাকা জেলে আর ত্রফিম তার এক ধূর্ত টোপ।

কিন্তু এ অনুমানগুলোর যেটাই ঠিক হোক না কেন অভ্যাগতদের বাসের বন্দোবস্ত করতেই হবে।

কোথায়?

নিজের বাড়িতে? উঁহু। তার অর্থ হবে ত্রফিম যে তার ন্যাতাওয়ালা দাদুর কাছে পালিয়ে গিয়েছিল, আপন সংসার বদলে নিয়েছিল, সে সব আগে থেকেই ক্ষমা করে দেওয়া। অন্যান্য ব্যাপার তো ছেড়েই দেওয়া গেল।

ত্রফিম আর টেনরকে বাখরুশিন নিজের ঘরে আপ্যায়ন করবে, কেননা এরা তার অতিথি। কিন্তু বাসের ব্যবস্থা করবে অন্য জায়গায়।

সে অন্য জায়গাটা হতে পারত দিয়াগিলেভের বাড়ি, কিন্তু সেখানে এখন লাইব্রেরি ও পাঠাগার। সেখানেও জায়গা করা যায়, কিন্তু তাতে কি খুব বেশি রকমের সম্মান দেখানো হবে না? বাখরুশির লোকেরা কী ভাবে নেবে সেটা?

অভ্যাগত ভবনটার পুরনো বাড়িটাতেও অতিথি আগন্তুকদের বাসা দেওয়া চলে না। বাড়িটা একটু বেশি পুরনো আর জীর্ণ। নতুন ভবন এখনো পুরো তৈরি হয়ে ওঠেনি। তাতে কী! তিনটে ঘর গুছিয়ে নিতে আপত্তি কী? একটা ত্রফিমের জন্যে, একটা টেনরের, আর একটা দাসীর জন্যে, ওদের সঙ্গে থাকবে, দেখাশোনা করবে।

খাবে কোথায়?

কলখোজের ক্যান্টিনে খাবে। টেবলের রবার ক্লথ বদলে যদি টেবল ক্লথ দেওয়া যায় আর কিছু নতুন বাসনপত্তর কেনার ব্যবস্থা হয়...

না, এটা সে করবে না। সাধারণভাবে কিছুই সে নতুন করে, সুসজ্জিত করে, সুদৃশ্য করে তুলবে না। যেমন আছে তেমনিই দেখুক।

কলখোজ সভাপতি সে, এলাকার একজন নামী লোক, তার পক্ষে কী দরকার পড়েছে এ গুজবের উপলক্ষ হওয়া, যেন নিজের কলখোজের হাল ঠিক যেমন আছে তেমনি অবস্থায় কে না কে একজন দেখবে বলে ও ভয় পাচ্ছে।

বড়ো রাস্তার মাঝখানে ওই যে খোঁদলটা সে ঘাস কাটাইয়ের আগে ঠিক করে নেবে ভেবেছিল সেটাও সে কিছু করবে না। লোকে বলতে পারে:

"হুঁ হুঁ... পরের চোখ থেকে চাপা দিতে চাইছে।"

পরের চোখকে ভয় করবার কী আছে ওর? সে চোখের যদি দূর দৃষ্টি থাকে তবে তা দেখবেই কেমন করে কলখোজের অর্থনীতি বেড়ে উঠেছে ও বাড়বে। আর পরের চোখ যদি কেবল "খোঁদল"ই দেখতে চায়, তবে অপ্রীতিকর সাফল্য ঢাকার মতো একটা প্রীতিকর চোখের বালি হয়েই না হয় থাক ওটা।

মোটের ওপর আগামী সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সত্যই হবে সবচেয়ে বড়ো সহযোগী। কলখোজ সম্পর্কে মিথ্যে বলতে হলেও হুঁশিয়ার হয়ে বলতে হবে সবচেয়ে ঝানু শত্রুকেও, এটা সমঝিয়ে দেবার জন্যে সে সত্য যথেষ্ট।

অবিশ্যি আক্ষেপের কথা যে ওরা ঠিক এই বছরেই আসছে, একটু পরে আসছে না, যখন বাখরুশি হয়ে উঠবে একেবারে রেলপথের এলাকা, আর লেনিভি চড়াইয়ের ঢালুতে গড়ে উঠবে বাখরুশিনো নামে এক নতুন গ্রাম। সেটা দেখবার মতো হবে ... কিন্তু কী আর করা যাবে? ওদের সফর মুলতুবী রাখা তো তার নিজের হাতে নেই। আর তার দরকারই বা কী? এই বছরেই দেখা যাবে রাস্তার খুঁটিগাড়ি, ঘর বাড়ির ভিত, কয়েকটা দালান ধবধব করছে চড়াইয়ের ঢালুতে।

এইটুকু হলেই আপাতত নিশ্চিন্তি। প্রধান ব্যাপারটা হয়ে গেলে পরেরটা এমনিতেই এসে যাবে। সবসময়েই তাই হয়ে এসেছে।

এই যথেষ্ট। নাকের ডগায় বিচালি আজড়ানোর কাজ। ঘাস দেখে এবছর চোখ জুড়োয়। আবহ-আপিস বলছে রোদ চলবে... খুব হয়েছে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, রাখো তোমার শিরঃপীড়া আর অনুমান... আসুক তখন দেখা যাবে। জরুরী কাজ পড়ে আছে। পুরনো বাখরুশিকে নিয়ে যেতে হবে লেনিভি চড়াইয়ে। রেলপথটা নিজের বোনের মতো হলেও হিসেব চুকিয়ে নেবে। চোখ না রাখলে ঠকতে হবে। খামারের লোকেরাও জানে কত ধানে কত চাল, হিসেব রক্ষকেরা ঘুমিয়ে নেই, তবু নিজের দিক থেকেও খানিকটা হিসেব রাখা ভালো। পুরনো এলাকাটার কোনো বাড়ি হয়ত আরো দশ বছর টিকবে, কিন্তু উঠিয়ে নিয়ে যেতে গেলেই দেখা যাবে চ্যালাকাঠ ছাড়া আর কিছু মিলছে না।

আর এসব চোখে আঙুল দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে রেলওয়ের মূল্য নির্ধারকদের।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের ঝামেলা কম নয়, কিন্তু ঝামেলা ছাড়া আনন্দও নেই, সুখও নেই। কিছুই নেই…

> এসো এসো হে রাঙা নিদাঘ —
> তাপদহন কাল…

শুধু আবহ-আপিস ওদের যদি না ডোবায়। বাকিটা ঠিক হয়ে যাবে।

১০

জেলার কাগজের নাম "লেনিনের ঝাণ্ডার নিচে", তাতে "আমেরিকা থেকে বাখরুশিতে" এই শিরোনামায় ছোটো একটা সংবাদ বেরুল। উদ্ধৃত করা হল ত্রফিম বাখরুশিন ও সাংবাদিক জন টেনরের আসন্ন আগমন সম্বন্ধে নিউ ইয়র্কের সংবাদদাতার খবর। একই চালার নিচে বেড়ে ওঠা দুই ভাইয়ের পথ কেমন ভিন্ন হয়ে গেছে, তারও উল্লেখ ছিল তাতে।

খবর শেষ হয়েছে এই বলে: "দুই দুনিয়ার দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎকার বিষয়ে লিখবেন বলে যিনি সানন্দে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন সেই মিঃ টেনর ও ভূতপূর্ব স্বগ্রামবাসীকে কলখোজীরা যে সমুচিত রুশ আতিথ্যসহকারে গ্রহণ করবে, তা বলা বাহুল্য।"

আমেরিকানদের যে আগমনটা গতকালও মাত্র অনুমান ছিল সেটা এবার নিশ্চিত হয়ে দাঁড়াল। আসার কথা তাদের রবিবারে, মস্কো থেকে ত্রফিম টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল বাখরুশিনকে।

দারিয়া স্তেপানোভনা যা বলেছিল তাই করলে। বাখরুশি থেকে চলে গেল, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে বলে গেল ত্রফিমকে যেন জানিয়ে দেয়:

'তাকে দেখতেও চাই না, দেখা দিতেও চাই না!'

নতুন অভ্যাগত ভবনের ঘরগুলির সাজানো গোছানোর কাছ শেষ হল। তাড়াতাড়ি করে হলেও বেশ ভালোরকম একটা কাঠের 'ব্যক্তিগত' পাইখানা তোলা হল। বাখরুশিন দেখল বেশ সুষ্ঠু স্বাভাবিক হয়েছে জিনিসটা।

বুড়ি তুদোয়েভা আগন্তুকদের দেখাশোনার ভার নিলে। যাই হোক না কেন ত্রফিমের পাতানো সম্পর্কে বোন তো। প্রস্তাব করলে তাকে সাহায্যের জন্যে চেলিয়াবিন্স্ক থেকে নিয়ে আসবে তার নাতনি সনিয়াকে।

বললে, 'সনিয়া খুব কাজের হবে, ইংরেজি মেংরেজি বলতে পারে। আর ঐ জনটার মুখে যদি রুশী বোল না ফোটে তাহলে আমার দোভাষী হবে।'

কলখোজের প্রধান মেকানিক, "করেসপণ্ডেন্স কোর্সের" তরুণ ইঞ্জিনিয়র, খামার সভাপতির প্রিয়পাত্র আন্দ্রেই লগিনভের ওপর ভার পড়ল একটা সাময়িক টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করতে। মিঃ টেনর যদি নিউ ইয়র্কের সঙ্গে কথা বলতে চায় — বলুন।

নিজের রেফ্রিজারেটরটা দিলে বাখরুশিন। তার সুগৃহিণী ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার তো এমনিতেই ধারণা যে তলকুঠরির ঠাণ্ডাটা রাসায়নিক ঠাণ্ডার চেয়ে ভালো। টেলিভিজনও বসানো হল। পুরো ছবি পাবার জন্যে টেলিভিজনের আলোকিত বাতায়নের দিকে দু একবার দৃষ্টিপাত করলে ত্রফিম ও টেনরের খুব ক্ষতি হবে না, সোভিয়েত দেশের অনেকখানিই দেখা যাবে তাতে।

"ঝোড়ো" — এই বহুপ্রতিশ্রুতিবান নামের একটা বাদামী ঘোড়া অতিথিদের জন্যে বরাদ্দ করাটা আপত্তিকর মনে হল না বাখরুশিনের। চাইলে ঘুরে বেড়াক। জোয়ান কালে ত্রফিম ছিল ঘোড়ার সমঝদার। কিন্তু "ঝোড়োর" মতো ঘোড়া দিয়াগিলেভদের আঙিনার ধারে পাশে কোথাও ছিল না। দেখুক, বাখরুশিতে আজকাল কেমন ঘোড়া আজড়ানো হয়। কিন্তু অতিথিদের যদি মোটরগাড়িই পছন্দ হয় — বেশ, তাই সই। গোর্কি শহরে তৈরি "জিপ" মোটরগাড়িটা রয়েছে। নিজে চালাবে — চালাও, নিজে না চালাও ড্রাইভার নিয়ে যাবে।

খবরের কাগজে যদি লিখে থাকে "সমুচিত রুশ আতিথ্যসহকারে" তাদের গ্রহণ করতে হবে, তাহলে তাই উচিত। এই "রুশ আতিথেয়তার" মধ্যে আদিখ্যেতা কিছু হল কিনা যাচাই করে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ এমন কিছু পেল না যেটা তার সভাপতিত্বের পক্ষে অমর্যাদাকর। কিছু যদি তেমন তেমন না ঠেকে, তবে তা ঠিকঠাক করে নিতে কতক্ষণ।

এবার বাকি রইল গৃহের আতিথেয়তা। বোধ হয় জীবনে এই প্রথমবার পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ রান্নাঘরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল। অবাক লাগল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার।

'প্রায় গোটা সরকার আমাদের ঘরে খেয়ে গেছে আর ঐ স্যান্ডউচ্-খেগোদের পেট ভরাতে পারব না তাই ভাবছ নাকি গো?'

বাখরুশিন বললে:

'সরকার — সে অন্য ব্যাপার। ওরা আমাদের লোক। যে খাবার যেমন সেটাকে তারা সেইভাবেই নেবে। কিন্তু এরা চোখ রাখবে লোক দেখানি হচ্ছে কিনা। সেইজন্যেই দানা ক্যাভেয়ার, বাঁটা ক্যাভেয়ার, সেভরুগা, স্টার্জন কিছুই চলবে না, যদিও খামার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ওদের আতিথেয়তার জন্য তিন হাজার পাঁচশ রুবল বরাদ্দ করেছে, আঞ্চলিক সদর থেকে এক টিন দানা ক্যাভেয়ার এসে গেছে, মুরগীছানা দেখে শেয়ালের মতন যা দেখলে আমেরিকানদের লালা ঝরে।'

'তাই বলে আমাদের গরিবিয়ানা দেখাতে হবে কেন?' আপত্তি করলে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা।

বাখরুশিন ফের বললে:

'গরিবিয়ানা করতে হবে বলেছি কি? বলছি শুধু যে আমাদের ঘরে কিছু একটা ঘটা লাগছে না। আমরা সানন্দে অমায়িকভাবে অতিথি আপ্যায়ন করব। খারাপভাবে আপ্যায়নের কারণ নেই। তাই বলে দু হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিতে হবে তাও নয়।'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ এগিয়ে গিয়ে চেয়ে দেখল তার বাপের ছবিখানার দিকে। পুরনো একটা ফোটোগ্রাফ থেকে এটি সম্প্রতি বড়ো করা হয়েছে। ফের বললে:

'বাবা না থাকলে... ত্রফিম আমায় তখন শেষ করে দিত... অন্তত শেষ করে দিতে পারত... সেটা ঘটেনি বলেই যে ও ভালো, সাধু পুরুষ হয়ে গেছে তা নয়। পুরনো হিসেব চুকাতে আমি চাইছি না। ব্যক্তিগত ক্ষোভের ঊর্ধ্বে উঠতে পার্টি শিখিয়েছে... কিন্তু সে সময় যে ও আমার তল্লাশে লেগেছিল সেটা তো ব্যক্তিগতভাবে নয়, আমি লাল, বলশেভিক বলে...'

স্বামীর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা বললে:

'ও নিয়ে রাগ করো না, পিওতর... হাজার হোক ও তো খুনী নয়...'

'খুনী হতে পারত। সৌভাগ্যক্রমে ও যদি খুনী না হয়ে থাকে, তবে তাতে ও শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না। তোর মন ভালো ইয়েলেনা,' সস্নেহে বৌয়ের চোখের

দিকে চেয়ে বললে সে, 'আর আমারও কেমন যেন, কী বলা যায়, কেমন যেন মনে হয়, এত বছরে ওর দোষটা ক্ষালন হয়ে যায়নি কি? কিন্তু এই ক্ষালনটা এতই কম যে জানি না কী করে হাত বাড়িয়ে দিতে পারব ওর দিকে ... কিন্তু করার কিছু নেই। হাত বাড়িয়ে দিতেই হবে। তবে নিজের ঘরে নিজের অন্তঃকরণ যা বলবে, বিবেক যা বলবে সেই ভাবেই গ্রহণ করব ওকে। এখানে কোনো রকম কূটনৈতিক অমায়িকতা চলবে না, কিছুতে না।'

এই বলে বাখরুশিন টেবলের দিকে মন দিল।

'পানের জন্যে কোয়াস, ভোদকা, মিষ্টি মদ। তোমার ঐ "আরারাত" কনিয়াক, "জর্জীয়" সুরা, মানী নামী অতিথিদের যা দেওয়া হয় সেসব কিছুই চলবে না। তারপর "জাবনা-বিচালি": কাঁচা শসা, সবরকমের। টম্যাটো, তার সঙ্গে পেঁয়াজ, লঙ্কা, ভিনিগার। ফ্যাকাশে গোছের নয়। গালিয়া নিজেই যেন সাতাশটা হটহাউসের সবকটাতে গিয়ে সবচেয়ে লাল টকটকেগুলো বাছে। ফুলকপি। শুধু সেদ্ধ করে। সঙ্গে আর কিছু নয়। পেঁয়াজ কলি। অল্প নোনা ব্যাঙের ছাতা। তুদোয়েভদের কাছ থেকে নিয়ে আসিস। নতুন আলু। বাস।'

'আর রান্না করা খাবারের কী হবে?'

'যদি সকাল বেলায় আসে, তাহলে আলুর শাংগী আর পার্চের মাছের পিঠে। সঙ্গে পেঁয়াজ, ছেয়ে গমের আটা দিয়ে, বুঝেছিস?'

'বুঝেছি, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।'

'এবার তারপর। যদি দুপুরের খাওয়ার সময় আসে তাহলে "জাবনা" দিয়ে শুরু করে পেলমেনি দিয়ে শেষ। আর যদি সন্ধ্যায় আসে তাহলে এর মধ্যে থেকে তোর ইচ্ছে মতো বেছে নিবি।'

'আর চা?'

'চায়ের জন্যে কিন্তু পুরো সেটটা নামাতে হবে না। আমাদের বাড়িতে কোনো ঘটার ব্যাপার হচ্ছে না। হওয়া চলে না। মাত্রা রেখে চলার চেয়ে আতিথেয়তায় গলবস্ত্র আহাম্মক বনা অনেক সহজ...'

'বেশ,' সরস পরিহাসের সুরে বললে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, 'দেখছি, ঘরের কর্তা জেগেছেন। সবকিছুতে নাক গলাচ্ছেন। কী পরব, অতিথিদের সামনে কী ভাবে যাব সেটারও কিছু পরামর্শ দেবেন কি কমরেড সভাপতি।'

'যা বলেছিস। আর একটু হলেই ভুলে যেতাম আর কি। পরবি এইটে, যেটা পরে আছিস। অপেরা দেখতে তো যাচ্ছিস না... ঘরে থাকছিস। তোর ঐ লেস মেস, মস্কোই সাজ চলবে না। এসব নইলে যদি তোর মনে হয় সম্ভ্রম দেখানো হচ্ছে না, তাহলে পরে খানিকটা পোষাক বদলে নিবি, কিছুটা যেন সম্মান দেখাচ্ছিস এই ভাব করে। আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে... আপনারা যদি ভালো চলেন, আমরা দ্বিগুণ ভালো চলব। কোনো জিজ্ঞাসাবাদ, কৌতূহল, ঔৎসুক্য নয়। চাল দেখানি নয়, নিজেকে ছোটো করাও নয়। টেবলে ধরে দেওয়া হয়েছে, তার মানে খাবে। যদি একেবারেই না খায় তাহলে ইংরেজিতে বলবি "হেলপ ইওরসেল্ফ, মিঃ টেনর..." আমাদের গ্রন্থাগারিকা এসব ইংরেজি শব্দ তোকে কাল শিখিয়ে দেবে। গোটা দশেক শব্দ জানলেই যথেষ্ট। শুধু আতিথেয়তার জন্যে, যদি ভুলে যাস — যাবি। রুশীতেই বলবি: "টেবলে পরিবেশন করা হয়েছে, খান পান করুন।" ত্রফিম ওকে তর্জমা করে দেবে। এই হয়ে গেল, এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়।'

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার গালে চুমু খেল বাখরুশিন। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল পায়রাভক্তদের দলটা তার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে। জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে বললে:

'আমি আসছি। হাতিয়ারপত্র নিয়ে যা। ছোটো পেরেকের জন্যে গিয়েছিলি?'

জবাব শোনা গেল:

'গিয়েছিলাম... ভাঁড়ারী আমাদের রঙও দিয়েছে...'

'বহুৎ আচ্ছা।'

স্বামীর দিকে চেয়ে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা স্থির করলে, ঠান্ডা থাকতে থাকতে শবজীবাগানে শসার ভুঁইটার আগাছা নিড়ানির কাজটা সেরে নেওয়া যাক।

আশ্চর্য... শসা না পুঁতলেই হত। ব্যক্তিগত চাষটায়* শেষ পর্যন্ত বেশি খরচই পড়ে যায়... কিন্তু বছরের পর বছর করে করে অভ্যেস হয়ে গেছে, ওই

---

* যৌথখামার ব্যবস্থায় সমবেতভাবে চাষ ছাড়াও যৌথখামারীরা আপন আপন ঘরোয়া জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত চাষও চালাতে পারে। — সম্পাঃ

বুড়ো গরু তিউতিয়ার মতো, না দেয় দুধ, না পাওয়া যাবে মাংস। কলখোজেও দিয়ে দেওয়া যায় না, জবাইও করা যায় না… বুড়ি গরু, মায়া লাগে!

তবে আর দেরি নেই। লেনিভি চড়াইয়ে উঠে যাবে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, নতুন জায়গায় নতুন ব্যবস্থা চালু করবে। বাড়ি সে তো বাস করার জন্যে। কাজ করার জায়গা তার পোলট্রি খামার। ঘরের সঙ্গে কোনো টার্কি, হাঁস মুরগি চলবে না। স্ট্রবেরির ভুঁইও নয়। ফুলের বাগান অবিশ্যি অন্য কথা। গোটা দশেক আপেল গাছ। গোটা তিনেক চেরি। একটা নাসপাতি গাছ। ফলের জন্যে নয়, সুন্দর হবে বলে। ফুলের জন্যে।

এটা অবশ্য প্রসঙ্গ ক্রমে। বাখরুশিনের বৌকে আর একটু ভালো করে চেনা যাবে তাতে। অধ্যায়টাও সাঙ্গ করা গেল।

১১

আরো দুদিন গেল। এল রবিবার। আগের দিন সন্ধ্যায় বাখরুশিন চুল ছেঁটে, গরম স্নান সেরে চাঙ্গা হয়ে নিল।

রেডিওয় সংবাদ পরিক্রমা ও কিছুটা প্রভাতী লঘু সঙ্গীত শোনার পর রবিবাসরীয় এক পাত্রে চাঙ্গা হয়ে সে ত্রফিমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে তৈরি হয়ে উঠল।

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার গায়ে সেই দৈনন্দিন পোষাক, রান্নাঘরের ব্যাপারে বাখরুশিনের মাতব্বরির দিন যেটা সে পরেছিল, তবু খাসা দেখাচ্ছিল তাকে। পোষাকটা এমন পরিষ্কার, মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা যে সুসজ্জিত বৌকে তারিফ না করে বাখরুশিন পারল না, বললে:

'ইয়েলেনা কবে তুই একটু বুড়ি হবি?'

'দায় পড়েছে বুড়ি হতে,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের পাশে বসে উত্তর দিলে সে, 'স্বামী যে আমার এখনো জোয়ান… ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়েছে, স্থিতু হয়েছে, এখনই তো চা-গোলাপের ফোটার সময়। তখন দেখো।'

বাখরুশিন পর্দা টেনে দিল। কেউ যদি পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখে, প্রবীণ কলখোজ সভাপতি তার বৌয়ের সঙ্গে রস করছে, সেটা ভালো হবে না।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের গা ঘেঁসে এল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। বাখরুশিন বললে:

'তুই এখনো তেমনি… পঞ্চাশও তো হয়নি তোর। হাত আমার এখনো কেমন তোকে চায়, এটা প্রকৃতির কী নিয়ম বল তো?'

সেই মুহূর্তে কানে এল বাইরে মোটরগাড়ি থামার শব্দ। জানলা দিয়ে তাকালে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। চোখে পড়ল একটা "ভলগা" মোটরগাড়ি, তাতে বসে আছে ত্রফিম। দেখেই চিনতে পারল তাকে। চেঁচিয়ে উঠল:

'এই যে, আমি বাড়িতেই, এখুনি যাচ্ছি…'

ফটক দিয়ে বেরিয়ে এল সে। গাড়ি থেকে ভারাক্রান্ত শরীরে নামল ত্রফিম, থপথপ করে এগিয়ে গেল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের দিকে।

জানলা দিয়ে দেখতে লাগল পাড়া প্রতিবেশীরা। কেমন করে সাক্ষাৎ হবে ওদের? কোলাকুলি করবে, নাকি করবে না? কে আগে হাত বাড়িয়ে দেবে? কী কথা বলবে?

হঠাৎ এই সবই যেন জরুরী হয়ে উঠেছে।

'নমস্কার, ভাই,' হাত বাড়িয়ে বললে ত্রফিম।

'নমস্কার, ত্রফিম,' করমর্দন করে উত্তর দিলে বাখরুশিন।

এফিম তার ভাইয়ের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর রুমাল দিয়ে ঘর্মাক্ত ঘাড় মুছে বললে:

'বৃষ্টি হবে নাকি? গুমোট পড়েছে।'

'কালকেও গুমোট পড়েছিল, কিন্তু বৃষ্টি হয়নি,' কথা চালিয়ে গেল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

ত্রফিম ফের চাইল ভাইয়ের দিকে, তারপর পৈতৃক বাড়িখানার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস টেনে বললে:

'যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।'

'তা ছাড়া আর কি।'

'নিচের কাঠগুলো পচে যায়নি?'

'না, মানে খানিকটা… কম করেও তো সত্তর বছর।'

'সত্তর বছর,' ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে ত্রফিম, 'অনেক কাল!'

ফের চুপ করে গেল। ফের পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখল দুজনে। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ তার উত্তেজনা চাপা দিতে চাইল রসিকতা করে:

'জরুরী প্রশ্ন যদি তোর আর না থাকে, তাহলে চল ঘরের ভেতর যাই, ত্রফিম।'

'হাঁ, কিন্তু আমি তো একলা নই,' "ভলগার" দিকে তাকাল ত্রফিম, 'পরিচয় করিয়ে দিই...' গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একটি মোটা সোটা বছর চল্লিশ বয়সের লোক। তার দিকে দেখিয়ে সে বলল, 'ইনি মিঃ টেনর, এ'র কথাই আমি লিখেছিলাম।'

'দুয়ে মিলে, কী বলে, চলতে ভালো,' মাথা নুইয়ে টেনরের দিকে চেয়ে বললে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, 'আসুন দয়া করে। মিস্টারকে তর্জমা করে বলে দে ত্রফিম যে আমি ওঁকেও আমন্ত্রণ করছি...'

'আমি শুনেছি, শুনেছি, ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ বাখরুশিন পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ,' রুশীতে জবাব দিলে টেনর, 'আপনার ভাই রাশিয়ায় নেই আমার চেয়েও বেশি দিন ধরে। এখন আপনাদের জীবনের অনেক কথাই রুশী ত্রফিমকে তর্জমা করে দিতে হচ্ছে আমাকে।'

টেনর অসংকোচে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কাছে এসে সহজভাবে নমস্কার বিনিময় করলে।

'তার মানে আমি আর আমার বৌ যে গোটা কুড়ি করে ইংরেজি শব্দ শিখলাম তা বৃথাই গেল,' হেসে বললে বাখরুশিন, 'তবে একেবারেই যাতে বৃথা না যায় তাই বলি কাম ইন, মিঃ টেনর, কাম ইন আমাদের বাড়িতে।'

টেনর লাফিয়ে উঠে হো হো করে হেসে হাততালি দিয়ে বললে:

'ব্রেভো, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, হিপ হিপ হুররে!'

এর উত্তরে পড়শীদের জানলা থেকে খুশির হাসি শোনা গেল।

'এই দেখুন,' বলে উঠল টেনর, 'আমি তো সর্বদাই বলে এসেছি, এই স্তরেই লোকের সঙ্গে সহজে সমঝোতায় পৌঁছানো যায়।'

ভুরুর বদলে লালচে বাদামী দুটি ফুটকি সমেত টেনরের হাসি-হাসি পুরো মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সবজে রঙের তীক্ষ্ম চোখ জোড়া খুশিতে ঝকমক করল। এমন কি তার টেকো মাথার চুলের ঝুটিটাতেও যেন অকুণ্ঠ খুশিতে উচ্ছল এক সদালাপী ব্যক্তির অমায়িক মুখচ্ছবিটাই সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ হেসে জিজ্ঞেস করল, মোটরটার কী হবে।

'গাড়িটা অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ দরকার।'

'তাহলে এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে নিন,' বেড়া খুলে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ড্রাইভারকে বললে, 'ওহে ছোকরা, পপলার গাছগুলোর নিচে ঠাণ্ডায় গাড়িটা নিয়ে গেলে হয় না, এখানে গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবে...'

বেড়ার ফটকের মধ্য দিয়ে ত্রফিম ততক্ষণে তার পৈতৃক উঠোনটায় এসে পড়েছে। আর প্রথম পদক্ষেপ, শুধু একটা পদক্ষেপেই তার জীবনের অনেকটি বছর খসে গেল। দৃশ্যটা ত্রফিমকে নিয়ে গেল সেই কালে যখন এই বাড়িটার সঙ্গে তার কোনো বিচ্ছেদই ছিল না। চালার নিচের সেই পিপেটাও এখনো আছে, কালা-ফুটকি কুকুর জোরকা'র জন্যে বাসার কাজ করত যেটা। যে মাদী কুকুরটা এই মাত্র তা থেকে বেরিয়ে এল সেটাও হুবহু জোরকার মতো। যে কুকুরটাকে ত্রফিম রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে একদিন পুষেছিল, তারই একটা দূর বংশধর হবে হয়ত এটা।

উঠোনটা উরালের অধিকাংশ বাড়ির উঠোনের মতোই বড়ো বড়ো শিল পাথরে বাঁধাই। কালের ছাপ লাগেনি তাতে। আজো ওরা তেমনি নির্বাক, তাদের ফাঁকে ফাঁকে গোরামিলকা নদী থেকে ঝুড়ি করে আনা হলদে বালি ঢেলে দিয়েছিল বাচ্চা ত্রফিম। সেগুলো এখনো তেমনি।

হঠাৎ থেমে গিয়ে কেঁদে ফেলল ত্রফিম।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বুঝেছিল এ চোখের জল কেন। কিন্তু ত্রফিমকে শান্ত করতে সে চাইল না, পারল না।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ত্রফিম যখন ফোঁপাচ্ছে তখন টেনর কখনো বসে, কখনো পিছিয়ে গিয়ে ছবি তুলতে শুরু করে দিলে তার। বলছিল:

'এ ফিল্মটা হবে অমূল্য। ও কী ভাবে কাঁদছে দেখলেই চোখে জল এসে যাবে সবার। পৈত্রিক ভিটে দর্শনের এ এক মহান নাটক।'

কিছু একটা কাজে লাগার জন্যেই যেন পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ কুয়ো থেকে এক বালতি জল তুলে আনল।

'ঠাণ্ডা জলে একটু মুখ ধুয়ে নে ত্রফিম। আরাম পাবি।'

ভাইয়ের কথা মতো বালতির জলে মুখ ধুলে ত্রফিম। তারপর চালাটার নিচে একটা কাঠের ওপর বসে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল:

'কেমন যেন আজকাল ভারি কান্না পায়। তোদের খবরের কাগজগুলো পড়েও কেঁদে উঠি। ছাপা কিছুই বিশ্বাস করি না বটে, তবু কাঁদি। ও যে আমার স্বদেশী ভাষা।'

'তা হয় বৈকি,' সায় দিলে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

'আর একবার জলের ছিটে দে। চল প্রাতরাশ করা যাবে। সুস্থ হয়ে উঠবি... আর আপনি মিঃ সাংবাদিক, ভোদকা চলে নাকি আপনার?'

'ওহ্,' বাতাসে চুমকুড়ি কেটে টেনর বললে, 'আমি শতকরা ২০০ ভাগ মদ্যপ।'

'তাহলে যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে। আসুন।'

ত্রফিমকে প্রথমে এগিয়ে দিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, এইটে দেখাল যে খুব বাঞ্ছিত না হলেও ত্রফিম তাদের অতিথি, আর টেনরের স্থান যেন দ্বিতীয়।

সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা মিটল। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপারটাই কাটল।

এখনো পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক চলেছে...

১২

বাখরুশিনদের পুরনো বাড়িটা ত্রফিম আগে যা দেখে গেছে ঠিক তাই আছে। বাপের আমলের কিছু আসবাবও কেমন থেকে গেছে। আছে দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা সেই মোটা বেঞ্চিটা। ভারী পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই খাবার টেবলটা। রুশী চুল্লির ধারেই ওটা এখনো আছে, হাতের কাছে খাবার দেবার সুবিধা। এখনো আছে সেই দেবপটের কুলুঙ্গিটা, গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময়ের আগে ত্রফিম বেশ জোর দিয়ে প্রার্থনা করে নিলে তার সামনে। এ কুলুঙ্গিতে এখন অবশ্য দেবপটের বদলে আছে একটা মাটির ভাঁড়, তা থেকে ফার্ণ শাখা বেরিয়ে আছে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনাকে ও বোঝালে, 'ভগবান আছেন মানুষের ভেতরে, কোণের ঐ কাঠের দেব-কুলুঙ্গিতে নয়।'

'যে যেমন বোঝে। কে কেমন মানুষ তার ওপর,' নিজের মন্তব্য যোগ করতে ছাড়ল না ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা।

ত্রফিমের নজরে পড়ল, রুশী চুল্লিটা নতুন করে বানানো হয়েছে। আগের

চেয়ে এটা ছোটো আর ফিটফাট। হাত-মুখ ধোয়ার টবটা নেই। তার বদলে একটা সুন্দর ওয়াশস্ট্যান্ড, শ্বেত পাথরের বেসিন, আয়না। তারই কাছে একটা "উরাল" মার্কা ওয়াশিং মেসিন। এটাও তার কাছে মনে হল নিতান্ত স্বাভাবিক। যাই হোক না কেন চল্লিশ বছর তো কেটে গেছে। এত বছরেও যদি একটা ওয়াশিং মেসিন পর্যন্ত না হয়ে থাকে, তাহলে আর সাফল্য কী।

বড়ো ঘরখানা দেখে ত্রফিম হাসি চাপতে পারল না। কালো হয়ে আসা কাঠের দেয়াল আর নিচু ছাদের সঙ্গে একেবারেই মানাচ্ছিল না বাদামী কাঠের ক্ষোদাই চেয়ার, বাসনের আলমারি, বুক সেল্ফ, এবং ওই একই বাদামী রঙের চকচকে পালিশ করা ছোটো টেবলের উপর টেলিভিজন। এই সব শহুরে জিনিস বিশেষ করে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার ঘরের গেঁয়ো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না।

ত্রফিমের মুখ দেখে ইয়েলেনা টের পেল ঘরের কী সমালোচনা সে করছে। লেনিভি চড়াইয়ে উঠে যাবার ব্যাপারটায় এত দেরি হয়ে গেল দেখে ভারি রাগ হল তার। তাহলে দেখে যেত ত্রফিম কী ধরনের ঘরে সেখানে বাস করবে লোকে।

পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত থেকে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা বুঝে নিল, ত্রফিমের সভ্য ভাবটা নেহাৎ ভাসা ভাসা। ওর সবটাই ঠিক ওর ওই ঘড়ির চেনটার মতো, পেতল না কীসের তৈরি, কিন্তু দেখায় যেন সোনা। তার চোখগুলোর দিকেও দেখে নিয়েছে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। পিওতরের মতো। কিন্তু সে শুধু চোখের রঙে, চোখের দৃষ্টিতে নয়। সে চোখ বিষণ্ণ, শূন্য, তাদের বাড়ির ঐ তিউতিয়া গরুটার মতো। তার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নেই। ও যেন কাচের চোখ, স্টাফ-করা জন্তুর চোখের মতো। দোকানে যেগুলো বিক্রি করে।

স্টাফ-করা একটা বিশ্রি জন্তুর সঙ্গে তুলনা করার ইচ্ছে হয়েছিল তার।

আর টেনর তার ড্যাপা-চোখো ক্যামেরাটা নিয়ে কাজ চালিয়েই গেল।

বাপের ছবিটার সামনে ত্রফিম দাঁড়াল। ভাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের মনে হল, ত্রফিমের যদি দাড়ি থাকত তাহলে ঠিক মনে হত যেন সে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এইটে, সম্ভবত কেবল এই একটা ঘটনাতেই সাক্ষাৎকারটা খানিকটা শোভন হয়ে উঠল।

যাই বলো না কেন, এ যেন বাপেরই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সাবেকি পৈত্রিক বাড়িটায়।

টেবলে বসার পর ত্রফিম জিজ্ঞেস করলে:

'ছেলেমেয়ে আছে তোর, পিওতর?'

'আছে তিনটি। নিজের মতো সব থাকে, সংসার নিয়ে।'

'ওরাও চাষের কাজ করে?'

'তা একজন করে, আমার মতোই। দ্বিতীয়টি নেভিয়ানস্ক্-এ ফার্নেসে ফোরম্যান। তৃতীয়াটি সের্গিতে পড়ায়।'

'খুব ভালো কথা। আমার কেউ নেই, একটি শুধু সৎমেয়ে।'

ঠিক সেই সময়ে ক্রফিমের পকেটে ঘড়ি বাজার একটা সুরেলা আওয়াজ শোনা গেল।

ঘড়িটা দেখিয়ে বললে, 'বাজনা বেশ লাগে আমার।' তারপর পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বললে, 'উপহারগুলোর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। যেখানে যাই থাকি, নিয়ম মেনে চলতে হবে।'

পকেট থেকে সে যে জিনিসটা বার করল সেটা দেখতে একটা চ্যাপ্টা ইলেকট্রিক টর্চের মতো।

'একটা বাজে জিনিস, কিন্তু মজার। তোদের এখানে সম্ভবত এখনো এসব চল হয়নি।'

উপহারটা দেখা গেল একটা পকেট সাইজের রেডিও সেট। গান ও ঘোষকের গলা তাতে শোনা যাচ্ছিল বেশ জোরেই। একটা ব্রডকাস্ট থেকে সহজেই আর একটা ব্রডকাস্টে চলে যাওয়া যায়।

'তা বটে, আমাদের এখানে এখনো এসব বিক্রি হয় না,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তারপর সংশোধন করে বললে, 'হয়ত আছে, কিন্তু বাখরুশি পর্যন্ত এখনো এসে পৌঁছয়নি।'

'আর এটা হল গিন্নির জন্যে। দম দিতে হয় না। আপনা থেকে দম হয়ে যাবে।'

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর সোনা মোড়া ঘড়িটা হাত পেতে নিল।

'ধন্যবাদ ত্রফিম,' বাখরুশিন বললে, 'উপহারে, সেই যে কী বলে, আপত্তি

কী। প্রতিদানের ব্যাপারটাও রইল। সময় মতো হবে। এবার, কাকে কী দেব… আমার নিজের পছন্দ ঘরোয়া সুরা।'

'আর আমি এইটে,' টেনর চোখের দৃষ্টিতে অনুমতি চেয়ে ভোদকার পাত্রটা থেকে নিজেই ঢেলে নিল। 'অবাক হবেন না। চটপট সারাই আমার বৈশিষ্ট্য।'

'তাহলে, আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্যে।'

'সাক্ষাৎকারের জন্যে, পিওতর,' ভাইকে সমর্থন করলে ত্রফিম। উঠে দাঁড়িয়ে সে সকলের সঙ্গে গ্লাস ঠুকলে, মাথা নোয়ালে, তারপর ধীরে সুস্থে গ্লাসটা দুলিয়ে দুলিয়ে ঢোকে ঢোকে নিঃশেষ করল।

"ভণ্ডামি বটে," মনে মনে ভাবল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, আর টেনর যেন তার ভাবনাটা টের পেয়েই বলে উঠল:

'না, না! কিছু খারাপ ভাববেন না। আমি ওর বাড়িতে দেখেছি, কেমন হুইস্কি টানে ও। নতুন অবস্থাটা একটু সয়ে যাক, তারপর দেখবেন, কেমন কেরামতি দেখায়।'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ তার "কথকতার রিলে" কখনো ত্রফিমের কখনো টেনরের সঙ্গে চালিয়ে গেল, কিন্তু আলাপের সুরটা যেন লাগল না।

ত্রফিমের কথায় ছিল সাবেকি রুশীর ছাপ, বোঝা যায় সে যে "কড়িচিহ্ন" ও অন্যান্য সাবেকি অক্ষর বেশি ব্যবহার করে শুধু লিখত তাই নয়, উচ্চারণও করত। শব্দের শেষগুলো উচ্চারণ করছিল পরিষ্কার করে, পাছে কেউ না ভুল বোঝে। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের ফলে কথা বলতে হচ্ছিল ধীরে ধীরে। অথবা অর্ধেকটা রুশী অর্ধেকটা ইংরেজিতে ভেবে ভেবে স্বদেশী ভাষাটাকে খুঁজে পেতে হচ্ছিল তাকে।

টেনর কিন্তু ভয়ানক বিজাতীয় টান দিয়ে কথা বললেও সেটা একালেরই আধুনিক রুশ ভাষা। এটা লক্ষ্য করে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ জিজ্ঞেস করলে:

'মাপ করবেন, মিঃ টেনর, একটা প্রশ্ন করতে পারি: আপনি অমন চমৎকার রুশী জানলেন কোথা থেকে? আশা করি এটা অশোভন প্রশ্ন নয়।'

'অতি শোভন। প্রশ্নটা অশোভন হত তিরিশ মিনিট পরে, যখন আমার আর কোনো ভাষাতেই জ্ঞান থাকবে না, শুধু নাক ডাকার যে শব্দটা সব ভাষাতেই এক সেই শব্দটা ছাড়া। কিন্তু এখনো আমি রুশী ভাষাতেই আমার

রুশ ভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে বলতে পারব। কিন্তু তার জন্যে কিছু রুশী ভোদকা দিয়ে আমার স্মৃতিটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।'

টেনর ফের গ্লাসে ভোদকা ঢেলে এক ঢোক খেয়ে বলতে লাগল:

'অনুবাদক হব বলে অনেক দিন থেকে তৈরি হচ্ছিলাম। অনুবাদক — এটা একটা মস্ত পেশা। এ পেশাটা হল সব পেশার আর সব জাতির সাফল্য ও সমৃদ্ধির পক্ষে একটা অনুঘটকের মতো। আমার বাবা এই শতকের গোড়াতেই বুঝেছিলেন যে রুশ ভাষার দৌলতে তার ছেলের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হবে আমেরিকায়। উনি ভুল করেননি। রুশ ভাষা দিয়ে আমি এখন শুধু নিজেকে নয়, তাঁকেও খাওয়াচ্ছি। ভালোই খাওয়াচ্ছি। দস্তয়েভস্কি নিজে বিশেষ টাকা পয়সা রেখে মারা যাননি, কিন্তু আমায় তিনি মস্ত একটা সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। আর গোপন করার দরকার নেই, আপনাদের সোভিয়েত লেখকদেরও কয়েকজন আমায় আমার বৃহৎ পরিবারটা ভদ্রলোকের মতো প্রতিপালনে সাহায্যই করছেন।'

ফের আর এক ঢোক খেল টেনর, যেন ভোদকা নয় চা; তারপর চালিয়ে গেল:

'ভাষাটা চোখ দিয়ে জানা, এটা অল্প জানা। ইচ্ছে হল কান দিয়েও জানব! সেটা পারা গেল। এবার নিয়ে রাশিয়ায় এলাম এই চার বার। প্রথমবার এসেছিলাম দ্বিতীয় ফ্রণ্টের সঙ্গে। সেটা ঠিক রাশিয়ায় নয়, জার্মানিতে। কিন্তু সৈন্যেরা ছিল সব রুশ। এলবের ওখানে রুশ সৈন্যদের মধ্যে অনেক দিন কাটিয়েছি। কান দিয়ে রুশ ভাষা শেখার এটা আমার প্রথম ক্লাস। পরে মস্কোয় সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেছি। কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়। আমায় বাদ দিয়ে দেয় কারণ যারা ঠান্ডা লড়াই শুরু করেছিল তারা যা দেখতে চাইছিল সেটা আমার দেখা হচ্ছিল না... এবার আমি শেষ দুই ঢোক গিললেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ আর শ খানেক শব্দ বলাই এখন বাকি।'

টেনর ফের গ্লাসে মনোনিবেশ করে ফের শুরু করল:

'তারপর আমি আসি টুরিস্ট হয়ে। এটা আমার তিন নম্বর ক্লাস। আমি তখনই যা বাক্য বানাতে পারতাম তার ওপর রুশেদের সংশোধন প্রায় দরকার

হত না। আর আজ আমি চতুর্থ ক্লাসে। আমায় আপনি কী নম্বর দেবেন, ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা?'

'প্রথম বিভাগ, মিঃ টেনর, প্রথম বিভাগের সেরা,' অমায়িকভাবে বললে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা।

'উ'হ্‌, এটা একটু বেশি রকম অমায়িকতা হচ্ছে। আমি টেপ রেকর্ডারে আমার নিজের রুশী শুনে দেখেছি এখনো অনেক বিজাতীয় গোলমাল শোনা যায়...' তারপর পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের দিকে চেয়ে বললে, 'এবার আশা করি অন্য ব্যাপারে মুখ ব্যাদানের অধিকার পাওয়া গেছে?'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ও তার বৌয়ের কাছে বেশ লাগল টেনরকে। ওর কথাবার্তা শুনেই তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত টানা হয়ত ঠিক নয়। তবু, আপাতত, এই মার্কিন সাংবাদিকটিকে আশাতিরিক্ত ভালোমানুষ বলেই মনে হল তাদের।

ঘরে অত্যধিক গরম যাতে না হয়, তার জন্যে পেলমেনি রান্না হচ্ছিল প্রতিবেশীর চুল্লিতে।

পেলমেনি দেখে ত্রফিমের চোখে ফের জল আসে আর কি।

'ভগবান, ভগবান... এই অভিশপ্ত লোকটার জন্যে তুই তাহলে এতও করেছিস... আমেরিকায় পেলমেনি যা দেখেছি সে শুধু স্বপ্নে। এ যে সেই ছেলেবেলার দিনে ফিরে এলাম, বল... ভগবান, ভগবান!'

ত্রফিম সযত্নে একটির পর একটি পেলমেনি তুলতে লাগল প্লেটে। যেন কী এক নৈবেদ্য।

আর টেনর অন্তত সপ্তাহে একদিন করে পেলমেনি খেতে অভ্যস্ত লোকের মতো প্লেটে ভিনিগার, মাস্টার্ড আর লঙ্কা নিয়ে মিশিয়ে একসঙ্গে গোটাকুড়ি পেলমেনি নিয়ে খেতে শুরু করে দিলে একেবারে খাঁটি উরালবাসীর মতো।

'উ'হু,' ত্রফিমের কথায় আপত্তি করলে সে, 'নিউ ইয়র্কেও পেলমেনি পাওয়া যায়... তবে যে মাটিতে যে গাছের জন্ম, সেখানেই তা ভালো বাড়ে। আরো কতগুলো পেলমেনি আমি খেতে পারি?'

'আরো শ দুয়েক খান না কেন,' বললে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, 'ঢের রাঁধা হয়েছে।'

'ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, আমার বৌকে বলে দেবেন না যে আমি আজ তাঁর

বিরহে সুখী। উনি আমায় খাওয়ান শুধু গাজর ঘ্যাঁট আর শুকনো ছানা, ওঁর ধারণা তাতে ইহজগতে আমার সাহচর্য উনি দীর্ঘদিন লাভ করতে পারবেন এবং পরলোকে আমার নরক যাত্রার খরচটা কিছু কমবে। বিশ্বাস করুন, আমেরিকায় পরলোক যাত্রার খরচটাও কম নয়।'

টেনর দেখল তার কথাটা যোগ্য মূল্য পেল না, তাই কৈফিয়তের মতো করে বলল:

'ভোদকা আর পেলমেনিতে ভারি একটা বাচাল মিকশ্চার তৈরি হয়, তাই না, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ? সেটাকে চাপা দেওয়া দরকার, তাই না?'

টেনর ফের তার গ্লাস ভর্তি করল। তারপর ফের ভিনিগার, মাস্টার্ড আর লঙ্কা মিশিয়ে আরো গোটা ত্রিশেক পেলমেনি নিয়ে বললে:

'আর পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আপনার আমুদে আমেরিকান মিঃ টেনর আপনার ঐ গোয়ালটার নিচে বিচালির ওপর শুয়ে নাক ডাকাবে... কারণ লোকটা সর্বদাই টেবলে বসবার সময় ঘুমের জায়গাটা আগে দেখে নেয়।'

'আমাদের এখানে ক্যাম্প খাট আছে, মিঃ টেনর। আমি এক্ষুনি ওটা ছায়ার নিচে পেতে দিচ্ছি, আরাম করে নিন...'

'আপনার যা অভিরুচি, ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা... যাই হোক না কেন, আমার মদির অবস্থার কারণে আমার প্রস্থান এখন নিশ্চয়ই বোধগম্য ও মার্জনীয়; তাছাড়া বাখরুশিনরা দুভাই নিজেরা আলাদা একটু আলাপেরও সুযোগ পাবে।'

টেনর ভদ্রভাবে অভিবাদন করে চলে গেল গোয়ালের দিকে। বাখরুশিন তার জন্যে ক্যাম্প খাটটা পেতে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে:

'আপনার এই ভদ্রতার প্রয়োজন ছিল না, মিঃ টেনর। ত্রফিমের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হতে পারে যে কোনো লোকের সামনেই... আপনার কথা তো ছেড়েই দিলাম।'

'তা হোক... আপনাদের কাছে আমি হাজার হলেও বিজাতীয়,' ক্যাম্প খাটে টান হয়ে বললে টেনর।

'আপনার যা ইচ্ছে।'

টেনরের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। মনে পড়ল সেই ঠাকুমার প্রবাদটা: কাহিনীর বিচার তার শুরু দিয়ে নয়, শেষ দিয়ে।

১৩

বাড়ি ফিরে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের ইচ্ছে হল না একা একা ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে। "আমি বাজনা ভালোবাসি," ত্রফিমের এই কথাটা লুফে নিয়ে সে তার রেডিওগ্রামের ঢাকনা খুলে গ্রামোফোনটা চালু করল, তারপর এক বাক্স রেকর্ড টেনে আনল, বাক্সের ওপরে লেখা, চাইকোভস্কি। বাছবিচার না করে একটা রেকর্ড টেনে নিল সে: "প্রথম কনসার্ট"।

'বলছিলি বাজনা ভালোবাসিস। আমিও তাই। এ ব্যাপারে আমরা এক।'

বেজে উঠল প্রথম কনসার্ট। ত্রফিম এক মিনিট শুনে ফের মন দিলে পেলমেনিতে। তারপর জিজ্ঞাসা করল:

'এটা কী বাজনা?'

'এটা আমাদেরই দেশের লোক পিওতর ইলিচ চাইকোভস্কির সঙ্গীত।'

পেলমেনি চিবতে চিবতে ত্রফিম বলল, 'শুনিনি।'

'কী শুনিসনি, চাইকোভস্কির নাম, নাকি বাজনাটা?'

'দুই-ই।'

'আফশোসের কথা।'

'সকলকার খোঁজ কি আর রাখা যায়, পিওতর। আমাদের আমেরিকায় তোর এই সব রেকর্ড একেবারে গাদা গাদা। এমন সব রেকর্ড যে একেবারে নাড়ি উলটে আসে। ঝনঝন, গাঁক-গাঁক। কোত্থেকে যে সব পেয়েছে। কেনই বা হু-হু, কেনই বা হাঁক-ডাক। তোদের এখানেও সব এসে যাবে। ভুল হয়ে গেল। গোটা পাঁচেক রেকর্ড নিয়ে এলেই হত। শুনলে পারতিস। গায়ে কাঁটা দেবে। বিশেষ করে যখন কুকুর কান্নার মতো করে শিঙ্গা বাজে। নয়ত আধা জবাই ভেড়ার মতো করে বাঁশি। যাই বল, আমেরিকা একটা আশ্চর্য দেশ। আমাদের এমন একটা রেকর্ড আছে, শতেক বার শুনলেও শরীর কেঁপে উঠবে। একে বলে, রুশী ভাষায় তর্জমা করলে দাঁড়াবে, "চালের ওপর মার্চ", বুঝেছিস। তাতে এমন বেড়ালের ডাক আছে যে কথার দরকার হয় না। সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কানে শুনবি বেড়ালের ডাক, আর চোখে ভেসে উঠবে গার্ল্‌স্ — মানে মেয়ে...'

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পিওতর রেকর্ড বন্ধ করে দিল।

'তার চেয়ে বরং দুজন দুজনের খবরাখবর জিগ্যেস করা যাক,' প্রস্তাব করল ত্রফিম।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বললে, 'বেশ, তাই কর।'

প্রথমে জিজ্ঞেস করলে ত্রফিম। যথাযথ উত্তর দিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, ত্রফিম অনাহূত হলেও তার অতিথি, এজন্য কোনো রকম ঢেকে চেপে, নরম করে বললে, তা নয়।

দারিয়ার প্রশ্নেও পিওতর বাখরুশিন সমান অকপটেই বললে:

'ও তোর সঙ্গে দেখা করতে চায় না, ত্রফিম। নিজের মরণের ভয়ে তুই তো কেবল নিজের কথাই ভেবেছিলি; ওর কথা ভাবিসনি, বাচ্চার কথা ভাবিসনি, ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলি।'

'বাচ্চা হয়েছিল ওর? আমার বাচ্চা?'

ত্রফিমের গলার স্বর কেঁপে গেল। শাদা শাদা ছোপ জেগে উঠল মুখে।

'হ্যাঁ, মেয়ে হয়েছিল দারিয়ার, নাম দিয়েছিল নাদেজদা...* হয়ত একেবারে অকারণে নয়। নাদেজদার এখন নিজেরই তিনটি ছেলেমেয়ে। অন্য সব কথা টথা যদি না ধরি, তাহলে বলতে হয় তোরই নাতি।'

'নাতিনাতনিদের কী নাম, পিওতর?'

'এ সব কথা বরং জিজ্ঞেস না করলি... কোনো লাভ নেই। একই চালের নিচে তুই আমি জন্মেছি, এটা এক কথা... কিন্তু ওদের ব্যাপারটা ভিন্ন কথা... তোর সম্পর্কে ওরা, বা ওদের সব সম্পর্কে তোর জেনে হবেটা কী!

'পিওতর,' মিনতি করল ত্রফিম, 'ওদের না দেখে কী করে পারি বল। ওরা তো আমারই রক্ত মাংস!'

'তোকে একটা কথা বলি, ত্রফিম। আমরা তো আর ঘোড়ার আস্তাবলে আলাপ করছি না যে রক্তের কথা তুলতে হবে। ঘোড়া গরুর বেলায় রক্তের হিসেব নেওয়ার একটা মানে হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় নিতে হয় অন্য হিসেব। সোজা কথা বলছি বলে রাগ করিস না। ওদের কাছে তুই বিশ সাল থেকেই মরা, ওমস্ক শহরের কাছে।'

---

* আশা। — সম্পাঃ

'নাদেজদার পিতৃনাম কী?'

'সাতকাণ্ড রামায়ণের পর ফের ঐ এক কথা! পিতৃনামে কী এসে গেল। এই তো তোর পিতৃনাম তেরেন্তিয়েভিচ, আমিও তেরেন্তিয়েভিচ। দুজনেই আমরা বাখরুশিন। তাতে হল কী? নদীর বিচার তার উৎস দেখে নয়, কীভাবে কোথায় সে বইছে তাই দেখে। খুব একটা ভালো উপমা হল না হয়ত, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস। তুই বরং নিজের কথা বল। আমারও জানা দরকার কেমন ভাবে তুই বইলি. কোন দিকে চলেছিলি, কোন সাগরে পড়লি।'

'তা বেশ, পিওতর। তবে চল্লিশ বছরের কথা, এক সন্ধ্যায় তো শেষ হবে না।'

'প্রধান প্রধান কথা। আত্মপরিচয় দলিলে যেমন লেখে।'

'কী সেটা?'

'মানে ছোটোখাটো জীবনীর মতো। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি,' মাথা নাড়ল ত্রফিম।

তারপর শুরু করল বলতে:

'সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই। ওমস্কের কাছে এক পলাতককে ধরেছিলাম। লেখাপড়া জানে। ভেবেছিলাম, যা উচিত সেইভাবে যথাস্থানে ওকে সোপর্দ করে দেব, কিন্তু পলাতকটা আমায় বললে, তা কোরো না; ফ্রণ্টের হালচাল আমায় জানাল। যা ঘটছিল সব কিছু। অবিশ্বাস করা চলে না। খেল খতম আর কি। তাতে আবার পেছন থেকে ওরা গুলি চালাতে শুরু করেছে। সাইবেরিয়া ভেঙে পড়েছে। মজুর খাটায় এমন সব বিশ্বাসী চাষীরাও বুঝল, কলচাক মোটেই তুরুপের টেক্কা নয়, নেহাৎ অ্যাডমিরালের পোষাক পরা এক দাবার বোড়ে। আমি ভেবে ভেবে দেখলাম আর ঐ পলাতকটার সঙ্গে বনে খানিক ঘুরে বেড়ালাম। তারপর উদ্বাস্তুরা আসতে লাগল। ব্যবসায়ী লোক সব। চার পাঁচটা করে মালগাড়ি। এরাও জানে না যাবে কোথা। ওদের লুটপাট করিনি। ভালোয় ভালোয় বললাম, “তোমাদের জানপ্রাণ বাপু তোমাদের কাছে দামী, আমাদের কাছেও আমাদের জীবনটা তাই। আমাদের খেতে দাও কিছু, কিছু পরিষ্কার কাপড়চোপড়, আর সম্ভব হলে কিছু দলিল।” কাপড়চোপড় ওরা দিলে। জামাজুতো বদলে নিলাম আমরা... দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম... ভালোমানুষের

মতোই বিদায় নিলাম। দাম দিতেও চেয়েছিলাম... ওরা নেয়নি। বোঝা যায়, টাকা নিয়ে ওদের মাথা ব্যথা ছিল না। তাতারস্কায়া স্টেশন পর্যন্ত আমরা পেণছলাম। দ্বটো একটা জিনিস যা দরকার ছিল কিনে রেলপথে পেণছলাম নভো-নিকোলায়েভস্ক পর্যন্ত। সঙ্গী ঠিক করল সেখানে থাকবে ও লালদের অপেক্ষা করবে। এ এলাকার কোথায় যেন ওর এক খ্বড়ী ছিল। আমি এগিয়ে গেলাম আরো দ্বরে। বিদায় জানালাম লোকটাকে, নিজের নাম সে বলেছিল নিকোলাই নিকোলায়েভিচ স্বদারব্শকিন, কিন্তু মনে হয় ওটা বানানো নাম। আমার তাতে বয়েই গেল। ওকে আমি অনব্রোধ করি, সবকিছ্ব শান্ত হয়ে এলে দারিয়াকে একটা চিঠি আর তার ছবিটি যেন পাঠিয়ে দেয়। এ চিঠিটি ও লেখে আমার কথা মতো, এমনভাবে যেন আমার কোনো সাথী লিখছে। যেন সে আমায় খ্বন হতে দেখেছে। উধাও হয়ে গিয়ে দারিয়ার জীবন পরিষ্কার করে দেওয়া আর কি। অন্য কোনো পথ ছিল না।'

ত্রফিমের গলা কেণপে গেল। জল এসে গেল চোখে। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের মনে হল, চোখের জল যেন ওর জমেই আছে। সহজেই তা বেরিয়ে আসে পচা পাইনগাছের রসের মতো।

'আর কোনো পথ ছিল না, ভান করতে হল যেন মারা গেছি,' প্বনর্বক্তি করলে ত্রফিম।

'না হয় তাই হল,' সায় দিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, 'এটা ছাড়াও তাকে শ্বেতরক্ষীর বউ হিসাবে কম সইতে হয়নি। তুই মারা গেলে, ওর সমস্ত অতীতও মারা গেল বলে ধরতে হয়। যা হোক, বলে চল।'

'তারপর দাদ্বর সোনাদানাগ্বলো কাজে লাগল। দারিয়ার কাছ থেকে এ ব্যাপারটা বোধ হয় শ্বনেছিস।'

'জানি, দারিয়া বলেছিল।'

'সাংহাইয়ে কিছ্বদিন ছিলাম। ধরা পড়তে পারতাম। ভেবে ভেবে... বাকি যা ছিল হিসেব করে... ভেসে পড়লাম আমেরিকার দিকে। বাছবিচারের খ্বব অবকাশ ছিল না... পেণছে নিজের সত্যি নামটা দিলাম, ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ বাখর্বশিন। কিছ্বদিন বসে রইলাম কোয়ারানটাইনে আটকের মতো... তারপর দেখল, লোকটা সত্যি কথাই বলছে। যাবার জায়গা নেই

কোথাও, ছেড়ে দিলে। অস্থায়ী কিছু সার্টিফিকেট দিলে। যে দিকে খুশি যাও। আমিও বন্দরে বন্দরে, খামারে খামারে ঘুরে বেড়ালাম।'

'কথাবার্তা চালালি কী করে?' বলে উঠল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

'ঠ্যালায় পড়লে কথা বেরয়। কখনো একটা শব্দ, কখনো একটা কথা… আসবার সময় জাহাজের খালাসীদের কাছ থেকে খানিকটা শিখেছিলাম। আমেরিকায় অল্প কয়েকটা কথাতেই চলে যায়। প্রধান ব্যাপার টাকা। যে কোনো ভাষায় কথা কইতে পারে টাকা। কিছুটা জমিয়েছিলাম … পোষাক আষাক ঠিক করে নিই। তারপর হঠাৎ কানে এল দুটি মহিলা রুশী বলছে। আমিও অমনি ওদের কাছে হাজির। এই করে গড়াল। ঠিকানা দিলে… তারপরে, ভাই, গিয়ে পড়লাম এক মার্কিনী ভিসিম-এ। রুশী কেরজাকদের* মধ্যে। চারিদিকে আমেরিকা আর ওরা তার মাঝখানে রুশী চুল্লি ধরাচ্ছে। ঢাকা আঙিনা, কাঠের বাড়ি। পেতলের দেবপট। শব্জি বাগানে মটর, বীন, শালগম, রুশী সবজি সব। ভাবলাম এখানেই বিয়ে করে ঘর বাঁধব… তার অসুবিধা ছিল না… একটি অল্পবয়সী বিধবা ছিল মার্ফা নাম। ঘরখানা ভালো… দারিয়ার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না… কিন্তু কী করা যাবে। জীবন তো কাটাতে হবে… কিন্তু ব্যাপার ভেস্তে গেল।'

'রাজী হল না?'

'রাজী আবার হবে না! কেঁদে কেঁদে একশা… কিন্তু আমার মনটা ততদিনে শক্ত হতে শুরু করেছে। বাখরুশিতে যা হারিয়ে এসেছি, তারপর অল্পে মন উঠছিল না… এলজা এসেছিল গ্রামে… কালো ঘোড়ার জুড়ি গাড়িতে করে… নিজের খামারের জন্যে কের্জাকদের মজুর ধরতে… ওকে দেখেই আমি হয়ে গেছি…'

এই সময় ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলে সামোভার আনার সময় হয়েছে কিনা। ত্রফিম তার কথার মাঝখানে থেমে গেল।

'পরে বলিস,' প্রস্তাব করলে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। 'এখন একটু চা খেলে দোষ হবে না।'

---

* ভিসিম হল উরালের একটি গ্রাম — কেরজাক বা সনাতনপন্থী রুশীরা এখানে বসত গড়েছিল। — সম্পাঃ

১৪

যেমন আচমকা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তেমনি আচমকা জেগে উঠল টেনর। বাখরুশিন ভাইয়েরা চা খাচ্ছিল। ঘরে ঢুকে ও বললে:

'বলছিলাম যে, অতিথিদের এবার প্রস্থান করার সময় হয়নি কি। আর তারপর জানা দরকার তাদের ডেরাটা কোথায়...'

'আমি আপনাকে পেঁছে দেব, মিঃ টেনর। আসুন এক কাপ কড়া চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে নিন।'

'বরং নোনা শসার রস একটু?' প্রস্তাব করলে ইয়েলেনা।

'ঠিক। জিনিসটার কথা বহুবার পড়েছি, তবে নিজে কখনো চেখে দেখিনি। কিন্তু রুশ সাহিত্যে আমার বিশ্বাস আছে।'

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার জন্যে অপেক্ষা করতে হল না। আগে থেকেই আন্দাজ করে সম্ভবত নোনা শসার রসটা একটা জাগে ঢেলে রাখা হয়েছিল।

'এখন দেখছি, ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, রাশিয়ায় এসব টোটকা জিনিসের কী জোর,' অভিবাদন করে জাগটা নিঃশেষ করে বলল টেনর।

চা খাওয়ার পর ত্রফিমও তার কথামতো "অধিষ্ঠান" হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে।

অচিরেই মোটরগাড়ি চলল অভ্যাগত ভবনের দিকে।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ যা আশা করেছিল, দেখা গেল কৌতূহলীর সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। মার্কিনদের সঙ্গে কলখোজ সভাপতি যখন গাড়িতে উঠল তখন তার চারপাশে সবরকম বয়সের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের ভিড় লেগে গেল। জানলা দিয়ে দেখলে লোকে। ফূর্তিবাজ টেনরের খবর ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে পেঁছে গিয়েছিল। গাঁয়ের সবকিছুই যে চলে লোকের চোখ কানের সামনে।

'টেনর... ঐ যে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে,' বছর নয়েকের একটি ছেলে দেখালে টেনরের দিকে।

টেনর তার বেরে টুপিটা দোলালে তাদের উদ্দেশে।

এটা যথাযোগ্য তারিফ পেল তাদের কাছ থেকে। এইটেরও তারিফ হল যে সুযোগ মিললে ওর সঙ্গে রুশ ভাষাতেই কথা বলা যায়।

আর সুযোগও তৈরি ছিল। আমেরিকানটাকে বিভার সরোবর, ছাড়া হরিণ, বনের মধ্যে তাদের বানানো টম কাকার কুটির, আর অবশ্যই পায়রা-ঘরটা দেখাবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাদের।

লেনিভি চড়াইয়ে অভ্যাগত ভবনটার দিকে ছেলেরা ছুটল একটা সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে। ইচ্ছে হল দেখবে, বুড়ি তুদোয়েভা কেমন ব্যবহার করে আমেরিকানের সঙ্গে।

অসমাপ্ত অভ্যাগত ভবনটার প্রথম অভ্যাগতদের জন্যে তুদোয়েভা অনেক আগে থেকেই তার সেরা পোষাকে সেজে অপেক্ষা করেছিল। মোটরটা আসতেই বুড়ি এগিয়ে গেল ত্রফিমকে স্বাগত করতে, কথাগুলো সে আগেই মুখস্থ করে রেখেছিল।

রাস্তায় আসতে আসতে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ তুদোয়েভার কথা বলে। ত্রফিম ভাব করল যেন সে চিনতে পেরেছে।

'কেমন আছিস বোন, পেলাগেয়া কুজমিনিচনা,' মাথা নুইয়ে বললে ত্রফিম, নিজের বড়ো বড়ো ফোলা ফোলা হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

'নমস্কার ভাইটি আমার, ছেয়ে নেকড়ে, ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ,' প্রত্যভিবাদন করে জবাব দিলে বুড়ি, 'আমাদের এখান থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিস তুই, তা দেশের লোকদের কথা এবার মনে পড়েছে তাহলে।'

'মনে পড়বে না কি, পেলাগেয়া কুজমিনিচনা! নিজের পা দুখানাকে বিশ্বাস হচ্ছে না যে দেশের মাটিতে হাঁটছি।'

'রুশ ভাষা এখনো ভুলে যাসনি তো?'

'এখনো ভুলিনি। কিছু কিছু শব্দ অবিশ্যি মনে নেই,' স্বীকার করলে ত্রফিম, 'কিন্তু আমার খামারে কিছু রুশী বাস করে। দেশের ভাষা ভুলতে দেয় না।'

তুদোয়েভাকে টেনরও নমস্কার জানাল:

'এমন মান্য গণ্য হোটেল ম্যানেজারের দেখা পেয়ে ভারি খুশি হলাম। আমার মা আমায় জনি বলে ডাকত, আপনি আমায় রুশী ভাঙ্কা বলে ডাকতে পারেন।'

'ভাঙ্কা কেন, আদর করে ডাকব ভানিউশকা...' পরিহাসের জবাবে

পরিহাস করল পেলাগেয়া; আহ্বান জানাল "এখনো কেউ বাস করেনি" যে ঘরখানায়।

"দূরপ্রসারী মম দেশ" রুশী গানটা গেয়ে উঠল টেনর ও ঘোষণা করলে সোভিয়েত দেশে তার সফরের মেয়াদ বাড়ানোটা যদি তার হাতে থাকত তাহলে সাতসালা পরিকল্পনার শেষ অবধি সে এইখানেই থেকে যেতে রাজী।

অমায়িকভাবে হাসল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, টেনরের বলা প্রত্যেকটি কথা ও গিলছিল। "রাজনৈতিক শিক্ষাটা বেশ ভালোই আছে, আমাদের ব্যাপার স্যাপারেও বেশ অভিজ্ঞ," মনে মনে ভাবল বাখরুশিন। কিন্তু ঠিক করলে আপাতত কোনো সিদ্ধান্ত টানবে না। স্তেকোলনিকভের কথাগুলো মনে পড়ল তার: "তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্তে প্রায়ই বিপথে গিয়ে পড়তে হয়, খাঁটি মানুষটার বদলে তার সম্পর্কে গড়ে তোলা ধারণাটাই জমে বসে।"

'তা এটা বরং ভালোই করেছিস, পিওতর,' যেন অনুক্ত একটা আলাপ চালাতে চালাতে বললে ত্রফিম, তার জন্যে বরাদ্দ ঘরটায় স্যুটকেস নামিয়ে রাখল। 'তোর ওপরেও ভার চাপবে না, নিজেও বিব্রত বোধ করব না।'

'যা বলেছিস, ত্রফিম। খোলাখুলি হওয়াই ভালো... তুই কি এখন একটু বিশ্রাম করবি, নাকি যাবি কোথাও?'

'যেতে পারলেই ভালো... হঠাৎ এখানে একা একা লাগবে... কী বলিস, পিওতর, একটা দিন নয় আমার জন্যে দে। নদীর পারে যাব... পুরনো স্মৃতিতে একবার ডুব দেওয়া যাবে... নিজের জীবনের কাহিনীটাও তোকে শেষ পর্যন্ত শোনাব।'

টেনর ড্রাইভারের পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছিল। ভাইদের ফের একলা থাকতে দেবার জন্যেই সম্ভবত পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে বললে:

'আর আমার ইচ্ছে নোনা শসার রসের সঙ্গে ভোদকার সম্পর্কটা স্থির হতে দেওয়া ভালো, আর ততক্ষণ নতুন খাটের উৎকর্ষটাও যাচাই করে নেওয়া যাবে।'

তাই ঠিক হল।

মাঠে পড়তেই ত্রফিম তার কাহিনী শুরু করল। নিষ্প্রাণ কাহিনী, চিঠিতে যে স্বীকারোক্তির প্রতিশ্রুতি ছিল মোটেই তেমন কিছু নয়। আর ত্রফিমের কথা শুনতে শুনতে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের এমন কি যা সত্যি তাতেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাছাড়া, তার জীবনের প্রথম ভাগটা,

আমেরিকা যাবার আগের টুকুই ছিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কাছে আকর্ষণীয়।

নদীতে পেঁছৈে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বললে:

'কাহিনীর সবটা তো আর এখুনি শেষ করতে পারছিস না... বরং একটু জলে ডুব দিয়ে নেওয়া যাক।'

ছেলেবেলায় এখানে তারা স্নান করেছে। মাছ ধরেছে এখানে। জীবনের অপরাহ্ণে ফের তারা এসে দাঁড়িয়েছে এখানেই। নদী কিন্তু বয়ে চলেছে আগের মতোই। হয়ত বা একটু ছোটো হয়ে গেছে নদীটা। হয়ত বা তখন সেই দূর শৈশব কালে এটাকে আরো চওড়া, গভীর মনে হত মাত্র।

'তা... মন্দ নয়,' পরিচিত তটের দিকে দৃষ্টিপাত করে মৃদুস্বরে বললে ত্রফিম, 'কত জল এতদিনে গড়িয়ে গেছে, পিওতর।'

'ঢের জলই বটে,' সমর্থন করল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, তারপর ভাইয়ের অনুসরণ করে ধীরে সুস্থে পোষাক ছাড়তে লাগল।

১৫

সেইদিন সন্ধ্যায় বুড়ো তুদোয়েভ ও কলখোজ পার্টি কমিটির সেক্রেটারি দুদোরভকে পিওতর বাখরুশিন ডেকে পাঠাল।

ওদের আগমনে খুশি হয়ে রসিকতা করল সে, 'যাক, পেলমেনিগুলো বেকার নষ্ট হবে না। উপস্থিত ব্যাপার নিয়েও একটু আলোচনা করা উচিত।'

উত্তপ্ত দিনটা নরম হয়ে এসেছে উষ্ণ সন্ধ্যায়। সূর্য তখনো পাটে বসেনি। ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার বাগানে পোঁতা ফুলগাছের গন্ধ উঠছে। দূর থেকে ভেসে আসছে তরুণদের রবিবাসরীয় ফুর্তির গানের রেশ।

অবিলম্বেই কথা পাড়ল না পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। লোকেদের কুশল জিজ্ঞেস করতে হয় আগে, আনতে হয় দিন কেমন কাটল, "শান্ত সরোবরে" কীরকম মাছ ধরল দুদোরভ, প্রতি রবিবারে সেখানে সে একবার যাবেই।

'তুই বাপু মাছ ধরার আলাপ না করে ত্রফিমের কথা বল,' তুদোয়েভ বললে, 'মাছের কথা ও তোকে বলবে কাল, কিন্তু এই "মাছটার" কথা যে আজকেই জানতে হয়।'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ এক মুহূর্ত দ্বিধা করে শুরু করল:

'একজন বেশ "টনটনে", অন্যটির ইস্ক্রুপ ঢিলা। ত্রফিমের কথা বলছি। একেবারে বাজে, কিংবা বলা ভালো অন্তঃসার শূন্য। মনে হয় পড়াশুনা করেছে কম, অথবা একেবারেই করেনি হয়ত। কিন্তু মনে হয় নিজের খামারটা চালাতে বেশ জানে। রুশ ভাষা খানিকটা খানিকটা ভুলে গেছে, কিন্তু ভালোই বলে। রাজনৈতিক বিশ্বাস কিছু নেই। ওর জন্যে কেমন লজ্জাই লাগে। লোক ওর কাছে সেই উনিশ সালের মতোই লাল শাদা ভাগ করা। ঐ হল ওর যা কিছু রাজনৈতিক জ্ঞান। নিজের দোষ চাপা দেয় না। কিন্তু তার জন্যে আফশোসও নেই। লোককে বিচার করে তাদের পোষাক, তার বাসের বাড়িটা দেখে। আমার মনে হয় ওর মধ্যে একমাত্র ও প্রধান কথাটাই হল টাকা। ওর যদি কোনো হৃদয় আদৌ থেকে থাকে তবে সেটা আকারে একটা পেঁয়াজের চেয়ে বড়ো নয়। এক কথায় ঝানু মুজিক। খানিকটা কৃপণ গোছের... লোভী। নিজের সম্বন্ধে বড়ো ধারণা। কেবল "আমি" "আমি"... বউ এলজাকে ভালোবাসে না। ভগবানে বিশ্বাস না করলেও মুখে খুব। আমেরিকায় অমন আরো অনেকে আছে। আমাদের এখানেও নেই নয়। কলখোজে ওর দেখার কিছু নেই, এখান থেকে কিছু নিয়ে যাবে আরো কম। নেবে কোথায়। মাথাটা ওর বড়ো বটে, কিন্তু মনে হয় না সেখানে কিছু ধরবে। নতুন সব কিছুর জন্যে তা একেবারে নিশ্ছিদ্র সীল করা। আর ভেতরকার পুরনোটা পচেছে। মোটের ওপর ও একটা শুকিয়ে যাওয়া লোক।'

'কী রকম, কী রকম লোক?' জিজ্ঞেস করল দুদোরভ।

'শুকিয়ে যাওয়া লোক,' বাখরুশিন বুঝিয়ে বলল। 'জোয়ান কালে ওর খানিকটা মাথা খেলত। কোনটা গরুর লেজ আর কোনটা সোশ্যালিস্ট রিভলিউশানারি, সে তফাৎটা ধরতে পারত। কিন্তু তারপর ওকে যেন এয়ারটাইট কৌটোয় ঢুকিয়ে চল্লিশ বছর রেখে দেওয়া হয়েছে। এখন কৌটো খুলে ও আমাদের কাছে বেরিয়ে এসেছে বিশ সালের তোলা নোনা শব্জীর মতো... হয়ত ভুল হতে পারে, বাড়াবাড়ি করছি, নিন্দে করছি। হতে পারে। আমার সঙ্গে তো ওর একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে... কিন্তু সে ব্যাপার যাই হোক, আমার কাছে ও মৃত।'

'আর উনি কেমন?' টেনর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ তুদোয়েভ, 'ছেলেরা ওকে বেশ পছন্দ করেছে।'

'হ্যাঁ, আমি বা ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা ওর সম্পর্কে খারাপ কিছু আপাতত বলতে পারি না। লোকটা আমেরিকান। ও লোক আমার দেখা। অবশ্যই বইয়ে। অন্য নামে অন্য চেহারায়, কখনো হয়ত বা অন্য লিঙ্গে, কিন্তু ঐ একই লোক। কিন্তু এসব হল,' দুদোরভকে উদ্দেশ করে বললে ও, 'প্রাথমিক ধারণা, গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ। আমার মনে হয় ওপর ওপর ধারণা। তবে যত ওপর ওপর হোক, এটা বলা যেতে পারে যে টেনর মিশুক লোক, মানুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার করে। কথাবার্তায় খুব তুখোড়। রুশ ভাষা বেশ জানে, আর তা দেখাতেও চায় দেখেছি। তীক্ষ্ন দৃষ্টি। উৎসুক, অকপট। অন্তত ভাব করে অকপট। ত্রফিমের চেয়ে শতগুণ ভালো করে ও জানে আমাদের। গাড়িতে আসার সময় সাতসালা পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা হয় দেখা গেল ও কংগ্রেসে নিকিতা সের্গেয়েভিচের রিপোর্টও পড়েছে। গোটা কয়েক সংখ্যা-রাশিও মনে আছে। ইস্পাৎ। শস্য। উৎপাদিকার বৃদ্ধি। বিদ্যুতীকরণ নিয়ে খুব তারিফ করল।'

'আমরা আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাব এটা মানলে?' জিজ্ঞেস করল দুদোরভ।

'আমরা এ প্রশ্ন তুলিনি, কিন্তু ও নিজেই বললে আমাদের চেয়ে লম্বা কদমে দুনিয়ায় আর কেউ চলছে না। তবে সেই সঙ্গে যেন কথাচ্ছলে জানিয়ে দিল লম্বা পা ফেলতে গিয়ে অনেক কিছু ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ আধখেঁচড়া করে চলে যাচ্ছি। মন দিচ্ছি না। কিছু কিছু জিনিসের উৎকর্ষের জন্যে যত্ন নিই না। একথা অবশ্য না মেনে উপায় ছিল না, বিশেষ করে আমরা তখন যাচ্ছিলাম আমাদের ঐ পুরনো সাঁকোটার ওপর দিয়ে। ওর থামগুলো না বদলে এই ব্রিজের ব্যাপারটাতেও তো আমরা ডিঙ্গিয়েই গেছি।'

'ওকে দেখে আমারও খারাপ লাগল না,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে অবাক করে দিয়ে মন্তব্য করল দুদোরভ।

'সে কী! তোর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল নাকি, গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ?'

'নয়ত কী। অভ্যাগতদের অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটা পার্টি কমিটির সেক্রেটারির জিজ্ঞাসা করতে হয় বৈকি।'

'আর ও কী বললে?'

'কোনো অসুবিধা নেই। বললে, যা সম্ভবপর তার চেয়ে ভালোই বোধ

করছে। জিজ্ঞেস করল, কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে তার। আমি নাম, বাপের নাম, উপাধি, পার্টি পদ সব জানালাম।'

'তারপর?' আগ্রহ বোধ করল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

'খুব খুশি হল, আমার আগমনে এক বিন্দু অবাক হল না। পরে গ্রামটা দেখাবার অনুরোধ করল। আমি আপত্তি করলাম না। একজন আমেরিকানের সঙ্গে আপনারা যখন চান করছিলেন সেই অবসরে অপর জনকে নিয়ে আমরা নতুন বাগান, লাইব্রেরি, সঙ্গীত স্কুল দেখিয়ে আনি। টেনর বেহালা বাজাতে পারে দেখা গেল। আহামরি কিছু নয়, তবু বাজায়... আমেরিকান ছেলেদের বাজনা শোনাল, খুশি হয়েই শুনল আমাদের ছোকরা বেহালাবাজিয়েরা। পরে বাজাল গ্লিঙ্কার "সন্দেহ"। আপনি ছিলেন না, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, ঠকলেন।'

'টেনর যে সঙ্গীত ভালোবাসে, ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে তাতে আমার সন্দেহ নেই। এর জন্যে কাল ওকে উপহার হিসাবে এক বোতল পেত্রভস্কি ভোদকা পাঠাব।'

'তাহলে বরং দু বোতলই জোগাড় করুন', দুদোরভ বললে, 'বাচ্চা বেহালাবাজিয়েদের ফিল্ম তুলেছে টেনর আমেরিকার টেলিভিজনের জন্যে, ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডে ওদের বাজনাও তুলে নিয়েছে। আপনার খুব ভালো লাগত পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। কলখোজে সঙ্গীত স্কুল, সে তো হামেশাই দেখা যায় না। আমি তাকে সে কথা বললাম।'

খুশি হল পিওতর বাখরুশিন, হতে ও পারে। দেখে যা মনে হচ্ছে আসলেও টেনর হয়ত তাই। নিজের স্বার্থের জন্যে ভান করছে না হয়ত। যদিও...

দুনিয়ায় সবই হতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাখরুশির অনেক বাড়িতেই আলাপ চলল টেনর আর ত্রফিমকে নিয়ে। এমন একটা বাড়ি, পৈঠা বা পাড়া ছিল না যেখানে এ নাম-দুটোর কথা ওঠেনি, দিনের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মুখে মুখে ছড়ায়নি। তবে এ সবই হল পেলাগেয়া কুজমিনিচনা তুদোয়েভা যা বলত, সেই পালার গৌরচন্দ্রিকা, আসল পালাটা এখনো ভবিষ্যতে। আর সে পালাটা কেমন তা এখনই কি আর আন্দাজ করা যায়।

'সাঁজের চেয়ে সকাল জ্ঞানী,' রূপকথার সুপরিচিত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল তুদোয়েভা, তার সঙ্গে জুড়ে দিলে নিজের টুকু: 'সকালের চেয়েও দিন। যত দিন যাবে, ততই জ্ঞান বাড়বে তা নয়। তবে বেঁচেও থাকব, দেখেও যাব, হয়ত...'

১৬

কলখোজের কাজের দিনগুলো যথারীতি চলল...

বিচালি তোলার প্রথম দিনে বরাবরের মতো পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ উঠল ভোরের আগেই, শিশির যাতে শুকিয়ে না যায়, অন্যেরাও উঠল একই সময়ে।

বিচালি করার ব্যাপারটা এখনো গাঁয়ের কাছে একটা ফুর্তির পরবের মতো। এমন কি অ্যাকাউণ্ট দপ্তরের লোকেরাও ঘাস কাটা, টানা, গাদা করার কাজে যোগ দেবার অনুমতি চাইল। কলখোজের কাজে যন্ত্র অনেক দিন হল ঢুকলেও কাস্তেকে একেবারে হটিয়ে দিতে কলখোজের টেকনিকাল সমৃদ্ধি এখনো পারেনি। সাবেকি কাঠের আঁচড়া এত যুগ পেরিয়ে এসেছে যে তার বয়সের আর হিসাব নেই। এই আঁচড়ার মতোই কাস্তে এখনো সজীব, ক্ষিপ্র মোয়িং মেসিনের অজর এক প্রপিতামহ। তার কারণ এই:

বাখরুশির সবচেয়ে সরস, পুষ্টিকর ঘাস জন্মায় বনের মধ্যে, ছোটো মেঠো জায়গায়, সেখানে এমন কি এক-ঘোড়ায় টানা মোয়িং মেসিনও অচল। কিন্তু প্রতিটি গাছ, প্রতিটি গুঁড়ির আশেপাশের সমস্ত ঘাসই কাটা যেত কাস্তেতে, এনে দিত স্বভাবজাত এক সবুজ ঐশ্বর্য, যা চাষ করা ঘাসের চেয়ে মোটেই নিকৃষ্ট নয়।

"আড়িমুড়ি ভাঙার" জন্যে খামার সভাপতিও ঘাস কাটায় লাগত। কেবল যারা একেবারে অনিবার্য তারাই শুধু থেকে যেত নিজেদের যথা নির্দিষ্ট পূর্ব পদে। পোলট্রি খামার, হট হাউসের মেয়েরা, গোয়ালিনীরা, পাহারাদার, পাম্প ঘরের ডিউটিরত, টেলিফোনের কাছে সেক্রেটারি... তারাও অবশ্য ফিকির করে অন্তত দিন দুয়েকের জন্যে আন্দোলিত বাতাসের মধ্যে বিচালি তোলার কাজে লেগে যেত।

অধিকাংশ ঘাস কাটিয়েরা আগের রাতেই নিজের নিজের বরাদ্দ অংশটায়

চলে যায়, সেখানেই রাত কাটাবে ডালপালা দিয়ে তৈরি করা কোনো ছাউনিতে, নয়ত স্রেফ একটা ঝাঁকড়া ফারগাছের নিচে আগুন জ্বালিয়ে।

অমনি-অমনি বনে গিয়ে রাত কাটানোটা এমনিতে অস্বাভাবিক কিন্তু বিচালি তোলার অজুহাত থাকায় সেটা সকলের কাছেই খুব আকর্ষণীয়। বনের মধ্যে উষ্ণ রাত, গানের ঝঙ্কার, বনজ গন্ধ, প্রথম ব্যাঙের ছাতার ভাপ, ধোঁয়াটে স্বাদের মাছের ঝোল, মদের সঙ্গে নৈশাহার আর পোড়া আলু — অপূর্ব।

ছোটো থেকে বুড়ো সবাই ফুর্তিতে মাতে। কেউ শোনায় অতীতের স্মৃতি, কেউ আচ্ছন্ন হয় ভবিষ্যতের আশায়...

উরালের বনের দাক্ষিণ্যে, ঐশ্বর্যে নির্বাক হয়নি কে!

দারিয়া স্তেপানোভনার নাতনি কাতিয়ার বয়স সতের বছর। সতের বছর! বয়সের আন্দাজে কাতিয়া এখনো তন্বী, লঘু, ভীরু। পাইন বনে ফুটে উঠতে, ফারগাছের ঝোপঝাড়ে কাকলী তুলতে এখনো তার দেরি, হায়, এখনো কত দেরি... কিন্তু কী করবে সে, মাস খানেক আগে যে কাতিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার, আয়নার মতো চকচকে নীল মোটরসাইকেলটার ব্রেক কষে সে নিজের গলার আওয়াজেই যেন বা সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল:

'নমস্কার, কাতিয়া! পৌঁছে দিতে পারি আপনাকে?'

আর কাতিয়ারও কেমন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বসল। সেও উত্তর দিয়ে বসল "আপনি" বলে, ছেলেটা যেন তার পাইওনিয়র দলের প্রাক্তন নেতা আন্দ্রেই লগিনভ নয়। অন্য কেউ।

'না, না, আন্দ্রেই সেমিওনোভিচ, আমি পায়ে হেঁটেই যাব; মাত্র তিন কিলোমিটার তো পথ...'

'তিন কে বললে, পাঁচ!' সাইড কারের ঢাকনা খুলে ফের নেমন্তন্ন করেছিল সে, 'চলে আসুন!'

আমন্ত্রণ কাতিয়া হয়ত প্রত্যাখ্যান করত কিন্তু সেই সময় সাইড কারের মধ্যে সিল্কের তাকিয়াটা তার চোখে পড়ল, আর মনে হল মসৃণ বড়ো রাস্তার পাশাপাশি চলা বনের মধ্যেকার এই পায়ে হাঁটা পথটায় আন্দ্রেই হয়ত বা অকারণে আসেনি।

সেই দিন থেকে বাখরুশির পাত্রীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে

কলখোজের তরুণ হেড মেকানিক মোটরসাইক্লিস্টটির লোভনীয় ও সদাই শূন্য সাইড কারটার পাকাপাকি দখল পেয়ে গেছে দারিয়া স্তেপানোভনার নাতনি — কাতিয়া।

আজকেও পিছনে একটা নীলাভ ধোঁয়ার রেশ ছেড়ে আন্দ্রেই লগিনভ বনের ছাউনিগুলোয় ঘুরছে। টেকনিক যাচাই করাটা উপলক্ষ। কেননা সবার কাছেই পরিষ্কার যে বনের ঘাস কাটার টেকনিক কাস্তে আর আঁচড়ার জন্যে প্রধান মেকানিকের অমন যত্নের দরকার ছিল না।

আন্দ্রেই জানত না যে দারিয়া স্তেপানোভনা কড়া হুকুম দিয়ে গেছে, কাতিয়া যেন এই গোটা মাসটা বাখরুশিতে দেখা না দেয়। আর "দিদিমার শনি"টা যতদিন আমেরিকায় ফিরে না যাচ্ছে, ততদিন সে তাই ভাইদের সঙ্গে থাকবে দূর শুতিওমির কাছে, মিতিয়াগিন ডাঙ্গায়।

দারিয়ার মেয়ে নাদেজদা মায়ের সঙ্গে একমত হয়নি। যে লোকটার প্রতি তাদের কোনো রকম টান নেই, থাকা সম্ভব নয়, তার কাছ থেকে নিজেকে বা নিজের ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখেনি সে। বরং ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচের কাছে নিজে এবং নিজের ছেলেমেয়েদের দেখানোর ইচ্ছেই হয়েছিল তার।

'দেখুক না আমাদের কাছ থেকে ও কত দূরে,' মায়ের সঙ্গে তর্ক করল ও, 'অতীতের জন্যে এতে ওর খানিকটা অনুতাপই হতে পারে।'

কিন্তু দারিয়া মেয়ের কথা শোনেনি। এমন কি এমন যুক্তিও দিলে যাতে ওর বিশ্বাস নেই, 'ছেলেমেয়েদের ওপর চোখ দেবে। বিশেষ করে কাতিয়ার ওপর।'

বনের মধ্যে আন্দ্রেই লগিনভের মোটরসাইকেল আজ বৃথাই গর্জন করে গেল। কাতিয়ার কানে গেল না তা, অপরূপ হয়ে দেখা দিল না সে, বললে না "ফের দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে।"

ভোর হল। শিস দিয়ে উঠল কাস্তে। এ বছর বনের ঘাস, কোমর পর্যন্ত উচু হয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা ঢলে পড়তে লাগল।

গলা খোলা একটা শাদা শার্ট পরে ঘাস কাটছিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। জোয়ানদের পেছু পেছু সেও নেমে পড়েছে, মুশকিলের জায়গাগুলোতে কাস্তে চালাচ্ছে সে।

শুরু হয়ে গেল ঘাস কাটা...

১৭

আকাশে উঠে এসেছে সূর্য, কিন্তু বনের ভেতর তখনো ঠাণ্ডা, শিশির ভেজা ঘাস তখনো শুকিয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি।

ঘাস কাটায় মগ্ন হয়ে ছিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, টের পায়নি কখন এসে দাঁড়িয়েছে ত্রফিম। তারও গায়ে একটা বেল্ট-না-বাঁধা রুশী কামিজ, হাতে কাস্তে।

'সে কী!' ভাইকে দেখে বলে উঠল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, 'ঘাস কাটার খেলা খেলবার সখ হয়েছে বুঝি।'

'কে জানে, হয়ত খেলাই। চমৎকার দিন, ভাই, চমৎকার কাস্তে চলুক,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের দিকে অভিবাদন করে ত্রফিম পাকা হাতে কাস্তে ধার দিতে লাগল।

'তুদোয়েভা তোকে এই সাজ দিয়েছে নিশ্চয়।'

'সেই দিয়েছে। কাস্তেটাও ওই দিয়েছে,' উত্তর দিল ত্রফিম।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ভাইয়ের দিকে চাইল, বুড়ো তুদোয়েভের পরিচিত পাতলুনটায় ভাইকে দেখে হাসল। বলল:

'একেবারে খাঁটি রুশ হয়ে গেছিস যে রে।'

'আমি তো রুশীই, পিওতর!' সজোরে ঘোষণা করল ত্রফিম, "রুশ জাতি কেবল রুশ মাটিতেই বাস করে তা তো নয়।'

'কথাটা অবিশ্যি ঠিকই, তবে পুরো ঠিক নয়। কিন্তু ও কথা যাক... বরং কাস্তে চালানো যে ভুলে বসিসনি, সেইটে দেখিয়ে দে।'

কাস্তে চালাতে শুরু করল ত্রফিম। কাস্তেটা ঠিক ওর হাতসই নয়। হালকা। কিন্তু গণ্ডা কয়েক টান দেবার পর ওর হাত ঠিক হয়ে গেল। ঘাস কাটতে লাগল একেবারে গোড়া ঘেঁসে, প্রায় দাড়ি চাঁছার মতো করে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে কাস্তে প্রায় চলে না, এমন কি সেখানেও বাদ দিলে না।

'এখনো ভুলিসনি দেখছি,' ভাইয়ের তারিফ করল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

'পারি, তবে দম থাকে না। আমার খামারে একটা ছোটো বনজমি আছে। বছর দশেক আগে এক দিনেই ওটা কায়দা করে ফেলতে পারতাম। এখন

তিন দিন ধরে কাটি। সেখানেও ডালপালার একটা ছাউনি ফেলি, যদিও বাড়িটা আমার কাছেই।'

'বুড়ো আর ছেলে সমান,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বললে, 'খেলা পেলেই ভোলে। ওখানকার বনও এমনি?'

'এমনিই বটে, তবে ঠিক এই রকমই নয়। আমেরিকায়, বুঝেছিস পিওতর, রুশী বার্চও মার্কিনী ধাঁচে বাড়ে।'

ঘাস কাটা থামিয়ে হো হো করে হেসে উঠল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

'দেখছিস তো ত্রফিম, বার্চও যদি নানান মাটিতে নানান ধাঁচে বাড়ে, তাহলে মানুষের বেলায় সে আর বলতে! জাত সে তো আর এক ভাষা নয়, বা ঘাস কাটার ধরন দেখে তার বিচার হয় না। জাতি — এ শুধু সাধারণ মাটিটা নয়, তার বাতাসটাও। কিসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কেমন ভাবে ভাবছে এটা সম্ভবত কী ভাষায় কথা বলছে তার চেয়েও জরুরী।'

'তাহলে আমি লোকটা কে? জাত বংশ নেই আমার?' জিজ্ঞেস করল ত্রফিম। 'আমরা একই বীজের ফল নই কি? এই জমিতেই কি খাইনি, মানুষ হইনি? কী বলতে চাস তুই? রাজনীতি কি রক্তের চেয়েও জোরাল?'

'বনে আজ অনেক লোক,' হুঁশিয়ার করল বাখরুশিন, 'রক্তের কথা থাক। তুই আমার অতিথি, আমি গৃহস্বামী। আমাদের মধ্যে ঝগড়া নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথায় অতীত ঘেঁটে তুলে লাভ নেই...'

'তোর যা ইচ্ছা, পিওতর। তুই গৃহস্বামী, আমি অতিথি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, রাজনীতি ছাড়াই আমাদের বলার কথা কিছু থাকবে।'

'রাজনীতি ছাড়া যদি চাস, তো রাজনীতি ছাড়াই। ফার গাছটার তলায় কোয়াস আছে। অনভ্যাসে তুই কাহিল হয়ে পড়েছিস। একটু খেয়ে নে। বিশ্রাম কর খানিকটা, আমি এই ডাঙ্গাটা কেটে সমান করে ফেলি। তারপর যদি চাস তোকে সঙ্গে করে চারিদিকটা ঘুরে আসব। আমাকে তো এমনিতেই যেতে হবে...'

ফার গাছের নিচে চুপ করে বসে রইল ত্রফিম, পাইপ ভরতে শুরু করল। জামাটা ভিজে উঠেছিল। পেটটার জন্যে পা ছড়িয়ে বসতে অসুবিধা হচ্ছিল।

শোনা গেল মোটরসাইকেলের আওয়াজ। কিছুক্ষণ পরেই দেখা দিল সাইকেলের সঙ্গে আরোহী।

'কাজের সময়ে কাতিয়ার খোঁজ করে বেড়াচ্ছিস না তো কমরেড হেড মেকানিক।'

'তাই করছি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ,' কবুল করল লগিনভ। 'নমস্কার। শুনছি ও নাকি দারিয়া স্তেপানোভনার সঙ্গে বাখরুশি থেকে চলে গেছে।'

'মানে শুনছিস যখন তখন সত্যি। তাতে হল কী?'

'কাতিয়ার জন্যে একটা অ্যালবাম জোগাড় করেছি। সহজে পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সব গরুর ছবি। রঙীন ছবি, ফোটোগ্রাফ। কী করে পেঁাছে দেওয়া যায়? ও আছে কোথায়?'

'আমার সেটা জানার কথা নয় আন্দ্রেই,' ত্রফিমের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। 'মানে ওর দিদিমা চায় না সমুদ্র পারের দাদু তার নাতনিকে দেখবে। তাই ঠিকানা না দিয়ে চলে গেছে। পরিচয় কর আন্দ্রেই। মিঃ বাখরুশিন ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ।'

এমন অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল আন্দ্রেই, কী করবে বুঝে পেল না। কিন্তু পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ চালিয়ে গেল:

'লজ্জা করিস না। নতুন পশুবিদটির অটোমোবিল "মস্ক্‌ভিচের" চাইতে যদি তোর ফটফটিটাই কাতিয়ার মনে ধরে যায়, তাহলে যথাকালে তুইও কুটুম্ব পেয়ে যাবি আমেরিকায়। পশুবিদ ওদের চারজনকে নিয়েই এক অজানা লক্ষ্যে যাত্রা করেছে। আর সুন্দরী কাতিয়া কাতেরিনাকে বসিয়েছে সামনের সীটে, উইন্ড স্ক্রীনের তলে ফ্রেমে বাঁধা ছবির মতো, নিজের পাশে ...'

আন্দ্রেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। আনাড়ীর মতো সে এগিয়ে গেল ফার গাছটার দিকে, যেখানে বসেছিল ত্রফিম।

'নমস্কার মিঃ বাখরুশিন। আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি আমরা।'

তরুণ সহকারীটিকে যে সে ভারি তারিফ করে সেটা না দেখাবার জন্যে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ওদের দিকে পিছন ফিরে ঘাস কাটতে লাগল।

'নমস্কার ছোকরা। আমারও নিজের মেকানিক আছে তবে তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো।'

এর বেশি কথা এগুল না। লগিনভ দাঁড়িয়ে রইল, ইতস্তত করল, তারপর ঠিক করল কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে যাবে।

'তিন নম্বর প্লটটায় যেতে হবে। সেখানকার ট্র্যাক্টরদুটো সবেমাত্র মেরামত হয়ে বেরিয়েছে... একবার দেখতে হয়।'

যেমন সহসা এসেছিল তেমনি সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল আন্দ্রেই। মোটরসাইকেলের গুঞ্জন থেমে এলে ত্রফিম জিজ্ঞেস করল:

'তার মানে কাতিয়ার এখন বিয়ের বয়স?'

'বিয়ের এখনো অনেক দেরি,' উত্তর দিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, 'পশুবিশেষজ্ঞ স্কুল শেষ না করা পর্যন্ত সে ভাবনা নেই। তুই বরং জিজ্ঞেস কর, দেখতে কেমন!'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ডালে তার কাস্তে ঝুলিয়ে রেখে কাতিয়ার বর্ণনা দিতে শুরু করল। বলতে গিয়ে না ভেবেই সে যে মূর্তিটা ফুটিয়ে তুলল সেটা অতীত দারিয়ার, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় দারিয়াই যেন দ্বিতীয় বার রূপ নিলে তার নাতনির মধ্যে।

কাল সন্ধ্যায় যা মনে হয়েছিল বাখরুশিতে তেমনি সহজেই সবকিছু হয়ে যাবে এমন নয়। এ নিয়ে ভাবনা না করার জন্যে, হয়ত বা তার মনঃপীড়াটা চাপা দেবার জন্যে কাস্তেটা নিয়ে ত্রফিম গোঁ ধরে ঘাস কাটতে লাগল, ঘাসের ওপরেই যেন সে তার রাগ মেটাবে।

১৮

মিশুক, গপ্পে ও কুতূহলী কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ তুদোয়েভ সহজেই টেনরের সঙ্গে জমে গেল। টেনরকে বুড়ো ডাকত জন এমনকি "ছোকরা" বলেও। সেদিন সে তাকে বড়ো ডাঙ্গাটায় নিয়ে গিয়ে বললে:

'তুই ছোকরা একবার চেয়ে দ্যাখ দিকি কেমন দিনখানা আজ, ঘাস কাটার খাসা সময়। কেমন চনচনে, হাওয়া সনসনে। বিচালি শুকিয়ে উঠছে যেন গরম তাওয়ায়। দেখ কেমন ঝরঝরে, খরখরে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ... চনচনে, সনসনে। ঝরঝরে, খরখরে।' তার কাছে এই অপরিচিত শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করল টেনর। তারপর নোট-বুকে শব্দগুলো টুকে নিয়ে এই প্রথম শোনা শব্দকটার মানে জেনে নিল বুড়োর কাছ থেকে।

অসহ্য গরমের ফলে হাই বুট খুলে ফেলল কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ। বুট ছুড়ে ফেলে পুত্রবধূ গ্লাশেঙ্কার হাতে চমৎকার করে কাচা শাদা পট্টি খুলে মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল।

'দেখুন দিকি!' চেঁচিয়ে উঠল টেনর। 'আপনি এখনো ঘাস কাটতে পারেন, কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ?'

'আরে ছোকরা!' উত্তর দিল বুড়ো। 'পারব না কেন? সে কথা আবার জিজ্ঞেস করতে হয়!'

'মানে, কেন যে জিজ্ঞেস করলাম সে বুঝবেন না। আপনি অতি অসাধারণ লোক। আপনাদের মহান লেখক লিও তলস্তয়ের মতো দেখতে আপনাকে। উনিও খালিপায়ে ঘাস কাটতেন।'

কথাটা পছন্দ হল তুদোয়েভের। এই সাদৃশ্যের ব্যাপারটা সে আগেও অনেকবার শুনেছে, ওর গল্প বলার গুণটার দারুণ সে এই সাদৃশ্য পেয়েছে বলেই ও ভাবত।

'আপনি তাহলে একটু ঘাস কাটা চালিয়ে যান, আমি একটা ভালো রকম ছবি তুলে নিই আমাদের সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে... বুঝছেন না... ঝরঝরে খরখরে ঘাস... চারিদিক চনচনে, হাওয়া সনসনে... ভারি চমৎকার।'

'তা মন্দ নয়। লজ্জার কী আছে। তবে এখানে তো কাস্তে নেই। দেখছিস, কী দিয়ে কাটছে,' তুদোয়েভ যন্ত্রগুলোর দিকে দেখাল। 'চল, বনের মধ্যে যাই।'

গাড়িতে তাজা বিচালি চাপিয়ে ওরা চলল বনের দিকে। "সহিসদের কর্তার" হাতে ভালো দানাপানি পাওয়া জাত ঘোড়া 'ঝোড়ো' সরু সরু লম্বা পা বাড়িয়ে হালকা চালে ছুটল।

কাছের বনের রাস্তাটা বিশেষ দূর নয়। টেনর যতক্ষণ ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখছিল, কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ ততক্ষণে ছুটে গিয়ে কাস্তে জোগাড় করল। বনের মধ্যে তার সঙ্গে জুটে গেল সব কৌতূহলীরা। তাদের মধ্যে ছিল জেলার পার্টি সেক্রেটারি স্তেকোলনিকভ, ঘাস কাটার সময়টায় সে সাধারণত এসে হাজির হয়।

'লেভ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়ের ভূমিকায় কিরিল আন্দ্রেয়েভিচের ছবি কেমন তোলা হচ্ছে সেটা দেখতে হয় বৈকি,' বন থেকে বেরবার সময় সে

প্রধান কৃষিবিদ সের্গেই সের্গেয়েভিচ স্মেতানিনকে রহস্য করে বলল, 'মন্দ কি, একটা জ্যান্ত আমেরিকানকেও চোখে দেখা যাবে। এক সময় অবিশ্যি হাজার হাজার আমেরিকানকেও দেখেছিলাম...'

পদক্ষেপ কমিয়ে আনল স্তেকোলনিকভ, ফোটো তোলায় যাতে ব্যাঘাত না হয়। কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ পোজ দিল চমৎকার। কয়েকটা স্ন্যাপ নেওয়ার পর টেনর ক্যামেরাটা বদলে নিল।

'এবার আমার দিকে হেঁটে আসুন,' হুকুম দিল টেনর, 'ভগবানের দোহাই, কপালের ঘামটা যেন মুছবেন না, আর ক্যামেরার দিকে তাকাবেন না।

টেনর তার ছোটো কিনো ক্যামেরাটা ঠিক করে নিয়ে নিচু হয়ে বসে ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ রেখে ধীরে ধীরে কিরিল আন্দ্রেয়েভিচের ঘাস কাটা লক্ষ্য করে যন্ত্র চালাল।

'এবার শেষ। বড়ো মতো একটা। সারা পর্দা জুড়ে কেবল মাথাটা।'

টেনর কিরিল আন্দ্রেয়েভিচের দিকে ছুটে গিয়ে বললে:

'এবার আপনি ক্লান্ত হয়েছেন। হাত দিয়ে ঘাম মুছে ফেলুন এবার...'

বুড়ো তোফা অভিনয় করল; প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল টেনর।

'হাঁ, হাঁ, চমৎকার! এমন অপ্রত্যাশিত। একেবারে স্বাভাবিক!'

'জানি না জন টেনর এখন যা তুলল সেটা কতটা অপ্রত্যাশিত, কতটা স্বাভাবিক,' প্রধান কৃষিবিদকে বলল স্তেকোলনিকভ, 'কিন্তু আমার ধারণা এ ছবির উপসংহার টেনরের পক্ষে সত্যিই খুব অপ্রত্যাশিত হবে, যদি আমার স্মৃতি ও শ্রবণে ভুল না হয়ে থাকে।'

'তার মানে ফিওদর পেত্রভিচ?' জিজ্ঞাসা করল স্মেতানিন।

'স্মৃতি ও শ্রবণে যদি ভুল না হয়ে থাকে,' পুনরাবৃত্তি করল স্তেকোলনিকভ, 'তাহলে ঐ বহুব্যবহৃত অর্ধসত্যটা বলতে হয়, দুনিয়াটা তেমন বড়ো নয়। একে আমি দেখেছি এলবা তীরে*। দোভাষীর কাজ করত তখন। সত্যি আশ্চর্য...'

---

* ফ্যাসিবিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পূর্ব থেকে সোভিয়েত বাহিনী ও দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে মার্কিন বাহিনী বন্ধুর মতো মিলিত হয় এলবা নদীর তীরে। — সম্পাঃ

'জীবনে কী না ঘটে দেখুন, ফিওদর পেত্রভিচ! কিন্তু যদি ও না হয়! চেহারার মিল তো হামেশাই দেখা যায়।'

'কিন্তু গলার স্বর? ঐ ছটফটানি?.. ছোটো ছোটো আঙুলগুলো। উঁহু, এ সেই লোক, সের্গেই সের্গেয়েভিচ, এ সেই।'

'কাছে গিয়ে দেখলে হয় না ফিওদর পেত্রভিচ?'

'না, না, কী দরকার। নয় পরে... শুধু, সের্গেই সের্গেয়েভিচ, কথাটা কাউকে জানাবেন না। হয়ত সত্যিই ভুল হচ্ছে আমার... চেহারার মিল তো হামেশাই দেখা যায়।'

'যা বলেছেন... তাছাড়া ওকে চিনবার দরকারই বা কী... আপনি হয়ত কোনো রকম... অবিশ্যি এর মধ্যে খুব একটা বিশেষও নেই যদিও, তবু...'

স্তেকোলনিকভ হাসি চাপল না, স্মেতানিনের ছোটো ছোটো ধূসর চোখের দিকে চেয়ে বললে:

'আপনি অতি সূক্ষ্ম ও অসাধারণ দূরদর্শী রণনৈতিক।'

সবিনয়ে চোখ নামাল কৃষিবিশেষজ্ঞ।

'বড়াই করছি না ফিওদর পেত্রভিচ, তবে চিরকালই আমি অমনি একটু সতর্ক। এমন কি আমি যখন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইনি, তখনো আমি হলে কখনও অমন খালি পায়ে কাস্তে হাতে ছবি তুলতে দিতাম না, চারিদিকে যন্ত্রপাতি তো কম নেই...' স্মেতানিন ঢালাও ভঙ্গিতে হাত নেড়ে যেন দেখাল বিরাট মাঠখানাকে। যন্ত্রে সেখানে ঘাস কাটা, তোলা, বোঝাইয়ের কাজ চলছে।

স্তেকোলনিকভ আর একবার মৃদু হেসে বনের দিকে চলে গেল।

১৯

এই কয়েকদিনে ফিল্মের ওপর বাখরুশির যত ছবি উঠল, সম্ভবত সেটা তার বহুবছরের দীর্ঘ ইতিহাসেও কখনো ঘটেনি। টেনরের ক্লান্তি ছিল না, সবকিছুর ছবি নিল সে — কলখোজের আপিস ঘর। কর্মরত যন্ত্রবিদ। শবজি ক্ষেত। কাদাপাঁকের মধ্যে শুয়োর। পুরনো কুটির। লেনিভি চড়াইয়ের নতুন দালান।

বুড়ি তুদোয়েভা তার পোষাক বদলিয়ে হয়রান হয়ে গেল। তার ছবি

নেওয়া হল নতুন সেই শহুরে পোষাকটায়, যা পরে সে তার "এক যে ছিল" কাহিনী বলেছিল টেলিভিজনের সামনে। ফটো তোলা হল তার সাবেকি গ্রাম্য পোষাকে, সুতো-কাটুনির চেহারায়। নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে আছে — সে ফটোও উঠল। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ছবি তোলায় আর শেষ ছিল না টেনরের।

কোনো রকম বাধো বাধো ভাব ছিল না টেনরের, রুশ ভাষায় তার জ্ঞান ও চটপট নতুন কথা রপ্ত করে নেবার গুণে সে সহজেই পরিচয় পাতিয়ে ফেলত যৌথখামারীদের সঙ্গে, সবাই অবাক হত তার উদ্যম দেখে। আমেরিকা সম্পর্কে তাকে যত প্রশ্ন করা হত তার জবাব দিতেও দেরি হত না তার। এসব জবাবে মার্কিনী ধাঁচের জীবন নিয়ে বাড়াবাড়ি করত না, এমন কি আমেরিকায় বহু তর্কাতীত সাফল্যেরও বড়াই করত না। বরং উল্টো তাকে মনে হত একজন সোভিয়েত দেশের প্রচার কর্মী বলে যে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সংখ্যা তথ্যে পারদর্শী।

'হ্যাঁ, তা বটে, কাঠের কুঁড়ে... ঘেঁসাঘেঁসি...' বলত টেনর। 'কিন্তু আপনাদের প্রতিটি কুঁড়েই যেন গর্ভবতী সুখী মেয়ের মতো, এবছরে না হলেও ও বছরেই যার একটি সুন্দর বাচ্চা হবে। নিজের মায়ের সঙ্গে তাদের মিল থাকবে কেবল ঐ কাঠগুলোয়... হ্যাঁ, হ্যাঁ... শুধু কিছু কাঠের ব্যাপারে... ওদের থাকবে চমৎকার কাচের শার্সি দেওয়া বড়ো বড়ো আলো ভরা চোখ; চমৎকার ছাদ আর গরম ঘর... এ আমি জানি, আমি দেখছি... আপনাদের ঐ চড়াইয়ে মাথা তুলছে এমনি সব চমৎকার চমৎকার কাঠের বাচ্চা, দেখতে পাচ্ছি... জাগছে নতুন নতুন রাস্তা... হ্যাঁ, হ্যাঁ! এতে আমি নিঃসন্দেহ...'

চিরকালই, এমন কি আগের দুর্বৎসরগুলোতেও বাখরুশি ছিল বেশ মজবুৎ যৌথখামার আর এখন আশেপাশের কলখোজগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মেসিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেবার পর খুবই বড়ো ও সমৃদ্ধ একটা উদ্যোগ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার। এই নিয়ে টেনরের সঙ্গে অনেক কথা হত পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের। বলত, কেমন করে বেড়ে উঠেছে কলখোজটা, কেমন করে আরো বাড়বে।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সংখ্যাগুলো টেনরের কাছে দুর্বোধ্য ছিল

না। তর্কাতীত প্রমাণ দেবার একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল বাখরুশিনের। খুবই সরল প্রমাণ: আগামী দিনটা দেখাবার জন্যে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ তাকাত বিগত দিনটায়। টেনরের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে গতি রেখাটা যদি বছর বছর এইভাবে উঁচু হয়ে এসে থাকে তাহলে তার ঊর্ধ্বগতিটা বদলে যাবে একথা ভাবার যুক্তি কী থাকতে পারে!

বাখরুশিনকে প্রথম দেখে মনে হত এক স্বপ্নদর্শী, সম্ভাবনাগুলো যে খুবই বাড়িয়ে দেখে। টেনরের তাই মনে হয়েছিল। কিংবা এটা সে দেখাত কেবল তর্ক খুঁচিয়ে তোলার জন্যে। সঙ্গীর মনে যাতে সন্দেহ ঘনায়। তারপর সে সন্দেহ প্রকাশ করা মাত্র তথ্য সংখ্যা টেনে আনত বাখরুশিন। তথ্য সংখ্যায় সন্দেহ ঘুচে গেল টেনরের, প্রকল্পের খসড়ায় এখনো যা জাগেনি, কলখোজের সেই খাদ্য-প্যাকিং কারখানা, অনতিবৃহৎ মাংস প্রসেসিং মিল, যন্ত্রচালিত শস্য গোলা, বাখরুশির নতুন ড্রেন ব্যবস্থা, ঘরবাড়ি গোয়াল ইত্যাদি থেকে নর্দমার ময়লা পাম্প করে মাঠে পাঠানোর ব্যবস্থা — এ সবই দেখতে পেল টেনর।

শহরবাসী হলেও টেনরের বুঝতে একটুকু অসুবিধা হল না, কত বিচক্ষণ ও লাভজনক ব্যবস্থা এগুলি। এমন কি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে সে একদিন বলেও ফেলল, হয়ত ছোটো একটা বই লিখে সে তার নাম দেবে “স্বপ্ন ও সংখ্যা”।

সেটা সত্যি হোক না হোক, কথাবার্তার নোট নেওয়া টেনরের দ্বিতীয় মোটা খাতাটাও শেষ হয়ে আসছিল। স্টেনোগ্রাফিক দাগ ফুটকিতে ঠাসা এ পাতাগুলো হয়ত ও কু-উদ্দেশেও লাগাতে পারে। এ সম্ভাবনা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বাদ দেয়নি। টেনরকে যতই পছন্দ হোক, বাখরুশিনের কাছে মনে হত যেন সে এক ব্যাপারী, তার মোটা ফাউণ্টেন পেনটার মাল বেচতে চায়। এমন ব্যাপারী যে চাহিদার ওপর নির্ভর করছে। আর আমেরিকায় মুদ্রণের যে স্বাধীনতার কথা ও বলত, সেটা মনে হত যেন ঘরোয়া পায়রার স্বাধীনতা যে নিজের খোপটি ছাড়া আর কোথাও যায় না।

ওর লেখা যারা ছাপাবে তাদের ওপর সে যে নির্ভর করছে, হয়ত এটা মাথায় ঢুকত না টেনরের, যেমন ত্রফিম বুঝত না যে পরিণত পুঁজিবাদী দেশে ক্ষুদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল একটা ভাড়া নেওয়া মোটরগাড়ির মতো যার

আসল মালিকানা পুঁজিপতিদের, একচেটিয়াপতিদের। কিন্তু সে কথা টেনরকে কী করে বলে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ? হয়ত আহত হবে... সেই জন্যে লোকটা যাতে তাদের কলখোজটুকুই দেখে, দেখে শুধু ক্যামেরার চোখ দিয়ে নয় মানুষের চোখ দিয়ে, আবছা রেখায় হলেও যা ভবিষ্যৎটাও আঁচ করবে — শুধু এইটুকুর মধ্যে সে সীমাবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে।

টেনর যে ভাবে আলাপ করত সেটা যৌথখামারীদের বেশ লাগত। তার কথার সঞ্চয় অল্প এবং উচ্চারণে ত্রুটি থাকলেও চিত্রবহুল বলে সেটা অন্তরঙ্গ লাগত তাদের কাছে। লেনিভি চড়াইয়ে উঠে যাবার কথা ভাবত প্রতিটি কুটির, অপেক্ষা করত কবে, ঈস্, কবে যে শুরু হবে বাখরুশির মধ্যে দিয়ে ঐ রেল রাস্তাটা; বাখরুশিতে এসে পোঁছবে পুনর্বসতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও মালমসলা।

গাঁয়ের সবকটি জরুরী দিকগুলোকে কত তাড়াতাড়ি কত বড়ো করে শহরের পর্যায়ে তোলা যায়, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের এই স্বপ্নে আকৃষ্ট হয়ে টেনর বাখরুশিনের ভাবনাগুলোর প্রচারক হয়ে দাঁড়াল। আর প্রচার করত এমন চমৎকার করে যে কিছু কিছু সংকীর্ণচিত্ত লোক এবং এমন লোক যারা কেবল ভালোটাই দেখতে চায়, তারা টেনরকে ভাবত কমিউনিস্ট। কারো কারো এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গিয়েছিল, বলত ও তার পার্টি আনুগত্য লুকিয়ে রাখছে। লুকিয়ে রাখছে কারণ দেশে ফিরলে ওকে হয়ত মুশকিলে পড়তে হবে।

কিন্তু একদিন ওকে প্রশ্নটা করা হল সোজাসুজি... কিন্তু সে কথা বলতে হয় একটা বিশেষ অধ্যায়ে অন্তত শুধু এই কারণে যে, প্রতি উপন্যাসেই যে সব মন্তব্য ও উপাখ্যান অনিবার্য তা দিয়ে ঘটনা-প্রধান অধ্যায়কে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়।

তাই সে কথা পরের অধ্যায়ে।

২০

একদিন টেনরকে সোজাসুজি প্রশ্ন করা হল:

'স্যার, আপনি কমিউনিজম সম্পর্কে প্রায়ই এত সব কথা বলেন, কমিউনিজমে বিশ্বাস করেন নিশ্চয়?'

প্রশ্নটা করেছিল এক নীল চোখ, পাঁশুটে চুলো মেয়ে, গায়ে একটা হালকা ডাস্ট-কোট, হাতে নাইলনের দস্তানা, সেই বছরেই যার খুব চল হয়েছে। টেনরের কাছে সে পরিচয় দিয়ে বলে যে সে সারা ইউনিয়ন রেডিওর সাংবাদিক, ইয়েলেনা মিখাইলভনা মালিনিনা।

'আমি একজন রিয়ালিস্ট, সহযোগী মালিনিনা,' উত্তর দিল টেনর। 'যা আছে তা সবেতেই আমি বিশ্বাস করি... যা দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়...'

'সিধে জবাব দিলেন না কিন্তু। আমি জিজ্ঞেস করছি, এলবা তীরে যেমন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল... রেডিওর জন্যে অবশ্যই নয়... দেখতেই পাচ্ছেন সঙ্গে টেপ রেকর্ডার নেই...'

'আপনি এলবার কথা তুললেন মালিনিনা দেবী। কিন্তু আপনার এত অল্প বয়স যে এলবা তীরের ব্যাপারটায় কিছুতেই আপনার থাকা সম্ভব নয়...'

'না মিস্টার টেনর, সম্ভব। আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। কবুল করতে হল বলে আফশোস হচ্ছে... এলবা তীরে আমি না থাকলেও, থাকা সম্ভব ছিল বৈকি... কিন্তু যদি আমি থাকতাম তাহলে নিশ্চয় আপনার মতো চেহারার একটি লোককে দেখতে পেতাম কি, একজন দোভাষীকে, যার ঘড়ির ডায়ালে ছিল তার বৌ বেটসির একটি জ্বলজ্বলে পোর্ট্রেট?.. পোর্ট্রেটটা দেখা যেত কেবল অন্ধকারে... ঘড়ির কাচের মধ্যে থেকে হেসে উঠত বেটসি...'

অপ্রত্যাশিত এই ব্যাপারে টেনর বসেই পড়ল অভ্যাগত ভবনটার সিঁড়িতে, যেখানে আলাপ হচ্ছিল।

'না, না... এলবায় আপনি ছিলেন এ হতেই পারে না।'

'তাতে কী এসে যায়!.. আমি জিজ্ঞাসা করছি ঘড়িটার কথা...'

'শ্রীমতী মালিনিনা... এই সেই ঘড়ি... এদিকে আসুন,' সিঁড়ির তলাটায় মালিনিনাকে আমন্ত্রণ জানাল টেনর, 'আমার বৌকে দেখতে পাবেন... এখন আর অবিশ্যি অমন যুবতী নয়, কিন্তু তাই বলে তো এই চমৎকার ঘড়িটার ডায়াল বদলানো যায় না।'

আলো থেকে ডায়ালটা আড়াল করল টেনর। মালিনিনার চোখে পড়ল প্রচুর হালকা চুল ভরা মাথা, হাস্যময়ী একটি মেয়ের ঝিকিমিকি ফসফরেসেণ্ট ছবি।

'চমৎকার। আমার একজন পরিচিত লোক কাল আপনাকে দেখে আমায় যা ভার দিয়েছিল সেটা পূরণ করা গেল তাহলে।'

'কে?'

'সম্ভবত তার কথা আপনার মনে নেই। উনি ছিলেন ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার। মার্কিন সৈন্যদের উদ্দেশে তার বক্তৃতাটা আপনি অনুবাদ করেছিলেন। মিলিত সাক্ষাৎকারের সন্ধ্যায় আপনি তার সঙ্গে ছিলেন... তখনও বোধ হয় ভোদকার প্রতি বেশ টান ছিল আপনার।'

'আপনি রীতিমতো ওয়াকিবহাল... কিন্তু আমার স্মৃতি শক্তি কম... অনেক বক্তৃতাই অনুবাদ করতে হয়েছিল আমায়... সে সময় সমস্ত রুশীয় চেহারাই আমার কাছে মনে হত এক, সৈন্য... এলবা তীরে আমায় জানতেন যিনি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় কী ভাবে?'

'আপনার কাছেই সে এসে যাবে, বোধ হয়ত আজই। এবার আমি আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই। এই নিন, লিখে রেখেছি আপনার জন্যে। আশা করি মিঃ টেনর, আপনি এমন বুদ্ধিমান, আমাদের জীবন ও রুশ ভাষা সম্পর্কে আপনার এমন জ্ঞান, বিদেশীদের কাছে যা আশা করা যায় না, আশা করি কাল রেডিওর জন্যে টেপ রেকর্ডে আপনি আপত্তি করবেন না?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়... কিন্তু আমি এপর্যন্ত বাখরুশির এত অল্প দেখেছি...'

'তাতে কিছু না... আমরা এ আলাপের নাম দেব "বাখরুশি সম্পর্কে মিঃ টেনরের প্রাথমিক ভাবনা"।'

'তা বেশ।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

মালিনিনা বিদায় নিল।

তুদোয়েভা তাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল ঘরের ছায়ায়। খেড়ে নেকড়ের কাহিনীটায় এবার কী রূপ দেওয়া যায় সেই কথা ভাবতে ভাবতে ত্রফিমের জন্যে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ উলের মোজা বুনতে লাগল।

তুদোয়েভা না চাইলেও টেনর যেন একটা বিদঘুটে সুতোর মতো কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। এ কয়দিনের এ কাহিনীটা পেলাগেয়া

কুজমিনিচনা গিঁটের পরে গিঁট দিয়ে শব্দের পর শব্দ বসিয়ে সাজিয়ে তুলেছিল। টেনরকে বাদ দিলে, এই সুতোটা বাদ দিলে কাহিনীর জীবন্ত আমেজটা আনা সম্ভব নয়, আজ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হল পেলাগেয়া।

তুদোয়েভার শুকনো পাতলা ঠোঁট জোড়া উলের কাটিদুটোর মতোই নীরবে নড়ে যেতে লাগল, যেন বা প্রথমকে সাহায্য করছিল দ্বিতীয়টা…

২১

মিতিয়াগিন ডাঙ্গা, কাতিয়া আর তার ছোটো ভাইদের যেখানে নিয়ে গিয়েছিল দারিয়া স্তেপানোভনা, সেটা হল সংযুক্ত কলখোজের অধীনস্থ একটা সমৃদ্ধ বনভূমি।

শোনা যায় জায়গাটার নাম মিতিয়াগিন ডাঙ্গা হয়েছে আটামান মিতিয়াগির নাম থেকে; তার দস্যু বাহিনীকে সে লুকিয়ে রাখত এখানে।

এই বনটা নিয়ে আর বড়ো চিশ্চা নিয়ে নানা রহস্যময় কথা শোনা যায়। লোকে বলে এখানে নাকি ছিল অতি গুপ্ত সনাতনপন্থীদের একটি আখড়া, তাদের পাশেই ছিল অল্প বয়সী ডাইনিদের আড্ডা, হাজার হাজার ভূত আর জলার পিশাচের সঙ্গে তাদের দহরম মহরম ছিল।

উরাল কারখানা থেকে পলাতক দাসেরা এসে আশ্রয় নিত এখানে, পরে কলচাকের সৈন্যদলের হাত থেকে পালানো চাষীদের গুপ্ত স্থলের কাজ করেছিল এটা।

তরুণ পিওতর বাখরুশিন আর কিরিল তুদোয়েভও আশ্রয় নিয়েছিল এখানেই।

প্রথম দেখে মিতিয়াগিন জঙ্গলকে আজো একটা থমথমে অকরুণ অন্ধকার বন বলে মনে হবে। কিন্তু দারিয়া স্তেপানোভনার কাছে এটা আপন ঘরের মতো। ত্রফিমের সঙ্গে গোপন অভিসারে সে আসত এখানে। এখন এখানেই বাস করে তার পুরনো সখী, মিতিয়াগিন ডাঙ্গার প্রধান বনরক্ষক আগাফিয়া মিকুলিচনা ইয়াগদ্‌কিনা।

বনের ঠিক মাঝখানে আগাফিয়া ইয়াগদ্‌কিনার জন্যে একটা চমৎকার বড়ো বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে কলখোজ। আর বছরখানেকের মধ্যেই এই পুরনো

বনটা বড়ো চিশ্চার মতো সজীব হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই বন কাটা কল ও একটা মস্ত কার্পেণ্টি কারখানার জন্যে ধূসর পাথরের ভিত পাতা হয়েছে।

বাখরুশির নতুন বসতির ঘরের জন্যে কড়িবর্গা তৈরি হবে এখানেই। আগাফিয়া খুশি হয়ে উঠেছে একেবারে ছেলেমানুষের মতো। তার নিঝুম জীবনে এই শরতেই যে হৈচৈ শুরু হবে তাই নিয়ে অবিরাম বকবক করে চলেছে সে।

আর দারিয়া ভাবে তার নিজের কথা...

হঠাৎ ওর মনে হয়েছে ত্রফিমের কাছ থেকে পালিয়ে আসাটা কাপুরুষতা হয়েছে, ভয় পেয়েছে বলে মনে হবে... ওর গ্রামবাসীরা তার এই চলে আসাটা ঠিক মতো বুঝবে তো, বলবে না তো স্বামীর প্রতারণার জবাবে কড়া কথা শোনাবার মতো জোর ছিল না দারিয়ার?

কিন্তু কড়া কথা কেন? ও তার যোগ্যও নয়। দারিয়ার কাছে ও মৃত। এটা অন্য লোক। এ লোকটা ওর কেউ নয়। ঘৃণা করাটাও ওকে সম্মান দেখানো।

শুধু এই পথই তার খোলা। ও নিয়ে না ভাবা। যেমন এসেছে তেমনি চলে যাবে। ওর সঙ্গে দেখা যদি না হয় তার মানে দাঁড়াবে যেন ও আসেইনি। আর নাতিনাতনিদের কথা ধরলে, ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ চলতেই পারে না। বকবক শুরু করবে, চোখের জল ফেলবে... নাতিনাতনিদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে চাইবে... তখন কী হবে ওদের সেটা ভেবে দেখতে হয় তো। নয় সেরিওজার কথা ছেড়ে দিলাম, চার বছর বয়স... কিন্তু বরিস? চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছে...

না, না... ঠিকই করেছে দারিয়া। ও যা করেছে শুধু তাই করাই সম্ভব। বাছুরগুলোকে ছেড়ে আসতে হল সেটা অবিশ্যি দুঃখের কথা। কতকগুলি অমূল্য বাছুর তো, তবু বাছুরের জন্যে তো আর নাতিদের কথা ভোলা যায় না।

কাতিয়া দিদিমার মনোভাবটা বুঝত, কিন্তু সায় দেয় নি। তার বুদ্ধি বোঝে, মন মানে না। দিদিমা ওর কাছে দ্বিতীয় মায়ের মতো। কাতিয়া বড়ো হয়ে উঠেছে দিদিমার কাছে। দারিয়া স্তেপানোভনার কাজটা চালিয়ে যাবে সে। চালিয়ে যাবে দিদিমার মতো অশিক্ষিতপটুত্ব দিয়ে নয়, পাশ করা পশু বিশেষজ্ঞ হিসাবে। বাছুরগুলো কাতিয়ার কাছে শুধু বাছুর নয়, তার

"মেহনতের ফসল"। কাতিয়ার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলতে গিয়ে দিদিমা ঠিক এই আখ্যাই দিয়েছিল ...

আর সে জীবনটা কাতিয়ার কাছে মনে হয়েছিল বৃহৎ, সুখী, পরিপূর্ণ ... বনের ফাঁকায় আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে তার সেই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারটার পর থেকে কথাটা তার বেশি করে মনে হচ্ছে।

চুলোয় যাক ঐ পুনর্জীবন পাওয়া দাদুটা। এমন মন কেমন করছে বাখরুশির জন্যে, অথচ দিন আর কাটে না। আকাশে সূর্য যেন চলতে চায় না।

বাখরুশিতে এখন ঘাস কাটার ফূর্তি। সবাই জুটেছে বনে। ফুটফুটে রাত। হেডলাইট না জ্বালিয়েই বাইক চালানো যায়। উষ্ণ বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাবে চুল। ও বলবে:

'আন্দ্রেই, একটু থামান ... আমার চুল যে সব গেল। অমন পাগলের মতো জোরে কেউ চালায় নাকি!'

আর ও ভারি অপরাধীর মতো মোটরবাইক থামিয়ে বলবে:

'আমার হ্যান্ডেলের ওপর আয়না লাগানো। বেশ তো, চুল ঠিক করে নিন।'

কাতিয়া জানত আন্দ্রেই ওকে ভালোবাসে, সে কথা যে ও মুখ ফুটে বলত না তাতে ও কৃতজ্ঞ, ভারি বিবেচনা দেখিয়েছে সে। কারণ ও যদি সে কথা বলে বসত, তাহলে তো উত্তর দিতে হত একটা। আর কী উত্তর সে দিতে পারে? সত্যি কথা বলবে, বলবে কি, "আন্দ্রেই আমিও তোমায় ভালোবাসি" — এ যে অসম্ভব। মাকে, দিদিমাকে সে কথা দিয়েছে, তাড়াহুড়া করবে না ... একথা সে মেনে চলবে। কিন্তু একথা তো ওকে বলা যায় না, ওর মধ্যে কোনো রকম কিছু জাগে না এই ধরনের একটা মিথ্যে বাজে জবাব বানিয়ে বলাও যে অসম্ভব।

সেটা হবে ন্যাকামি। মিথ্যের চেয়েও খারাপ।

বরং আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে পরের বার দেখা হলে সে বলবে:

"দোহাই আপনার, আরো দুবছরের জন্যে যেন কোনো রকম প্রেম জানাবেন না, আমার একান্ত মিনতি ..."

ভেবে হাসি পেল কাতিয়ার, কেমন বোকা বোকা মনে হল নিজেকে।

ঠিক করল, "বেশ, যা হবার হোক।" তারপর ফের ভাবতে লাগল ওর নিজের বানানো ঐ নীল তাকিয়াটায় হেলান দিতে কী আরাম। একেবারে নীল, ওর চোখের মতো। হয়ত বা ও যখন নীল রঙের মোটরবাইকটা কিনেছিল তখন বুঝি ওর চোখের কথাই ভেবেছিল আন্দ্রেই।

আহ কী মধুর... দ্রুতগামী ফিটফাট ঐ মোটরবাইকটার সাইডকারটা তারই জন্যে সে আগেই ঠিক করে রেখেছিল, ভাবতে কী ভালোই না লাগে।

ভাবতে ভাবতেই কাতিয়া শুনতে পেল মোটরবাইকের পরিচিত শব্দ। প্রথমে মনে হল ওটা ওর মনের ভুল, ওর কথা ভাবছিল বলে। কিন্তু মনের ভুলই যদি হবে তাহলে ওর ভাইয়েরা কেন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে গেল রাস্তায়:

'আসছে, আসছে!'

সত্যি, ওই আসছে। ও ছাড়া আর কেই বা অমন বেয়াড়া বুনো পথ দাবড়িয়ে আসবে।

ওই বটে... দিদিমা মিথ্যে বললে না:

'মিনিট দশেক বনে ঘুরে জুড়িয়ে এলে পারতিস ছুঁড়ি, মুখ যে একেবারে রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে।'

'আমি এখুনি ঝোরার জলে মুখ ধুয়ে নেব দিদিমা... কারো নজরে পড়বে না,' এই বলে কাতিয়া ছুটল নদীর দিকে।

মোটরসাইক্লিস্ট ততক্ষণে একেবারে কাছে এসে গেছে, তার ইঞ্জিন থেকে সজোরে শব্দ হচ্ছে: "কা-তিয়া! কা-তিয়া! .কা-তিয়া!"

কী করে সে এখন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে যখন ঝোরার সমস্ত জলেও ওর গালের লাল ঘুচবে না, শান্ত হবে না বুকের স্পন্দন? আন্দ্রেই লগিনভের মোটরসাইকেলের গুরুর-গুরুর তালে সে বুক যে এখন স্পন্দিত হয়ে চলেছে, "প্রিয়-তম! প্রিয়-তম! প্রিয়-তম!"

২২

বাখরুশির জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ত্রফিম দেখল কৃষি কাজের যৌথ প্রথাটা আমেরিকায় থাকতে যা মনে হয়েছিল মোটেই তেমন নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়। ব্যক্তিগত ফার্ম পদ্ধতির তুলনায় তার কয়েকটা সুবিধাও সেও মনে

মনে মানল। সে সুবিধাটা তার মনে হল প্রধানত জমির বৃহদায়তন এলাকা ও বৈচিত্র্যে। বন, মাঠ, ডাঙ্গা, সরোবর, নদী… ইচ্ছে হলে জলচর পাখির চাষও চলতে পারে। জলে মাছ। পশুর দল বাড়ানো যায়। হর্টিকালচার চালানো যায়। পশুখাদ্যের চাষ চলে। মৌমাছি পালন। যা খুশি বানাও — কাঠ পাথরের অভাব নেই। সবেতেই টাকা…

দারিয়ার যে বাছুরগুলো বাড়ছে তা টাকা। কাচ ঘরের ভেতরে টন টন শসার মধ্যে টাকা, শাদা শাদা পিকিং হাঁসগুলোর মধ্যে টাকা; টাকা জমছে যবের শীষে, আঁট বাঁধছে আগ-ফলনী বাঁধাকপিতে… যেদিকে তাকাও, যেখানে হাত লাগাও — মুনাফা … কিন্তু …

কিন্তু যৌথ কৃষির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কথাটাই বাদ। সবচেয়ে বড়ো কথাটা হল সে, ত্রফিম। চল্লিশ বছর সে বাস করেছে এমন দেশে যেখানে সবকিছু থেকেই ফয়দা তুলতে জানে লোকে। নিজের একটা ভালো ছাপ রেখে যাবার জন্যে ত্রফিম শুভেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যৌথখামার পরিচালনার ব্যাপারে উপদেষ্টার ভূমিকা নেবে ঠিক করল। কিন্তু ত্রফিমের এই শিক্ষাদান ব্রতে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের দুর্দিন উপস্থিত হল।

তুদোয়েভের কাছে মিনতি করল বাখরুশিন, 'কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ, করুণা করো বাপু আমায়, ত্রফিমের হাত থেকে আমায় রেহাই দাও। ভূষি মালের এ বস্তাটা আমায় কাণ্ডজ্ঞান শেখাবে ঠিক করেছে। এদিকে আজ আমার সময় নেই। বিচালি বিক্রির একটা চুক্তি ঝুলছে। রেলপথের শেষ কথাটা পাকা করার জন্যে লোক আসবে। আর ও এখানে কেবলি ঘুরঘুর করছে, আজেবাজে হিতোপদেশ দিচ্ছে। আপিসঘর থেকে নড়ছে না।'

'আমি তো এমনিতেই ওকে তোর কাছ ছাড়া করার জন্যে সবকিছু করছি,' কৈফিয়ত দিল তুদোয়েভ, 'দুবার ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম কবরখানায়, মা-বাপের কবরে। বুড়ো দিয়াগিলেভদের বাড়িটায় ঝাড়া এক ঘণ্টা বসেছিলাম। ভুট্টা দেখালাম। কাঁকড়া ধরতেও ডেকেছিলাম। আর কী করার আছে?'

'কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ, যা হোক কিছু একটা ভেবে বার কর। না হয় একটা পুরুত টুরুতই দেখো। শ্রাদ্ধ-শান্তিই না হয় করুক! ফের ঘণ্টা তিনেক তাতে লেগে যাবে, বুঝেছ?'

'পুরুত পাবো কোথায়… শহরে ছুটতে হবে নাকি?'

'তাই যাও। যে কোনো একটা গাড়ি নিয়ে নাও। শহর দেখাও। মিউজিয়মে নিয়ে যেও... চাই কি... রেস্টুরাণ্টে। কড়া ক্লান্তি মিটিয়ে দেব। আমার যখন অতিথি, কী আর করা... আসতে যেতে দিন কাবার। তারপর কিছুটা ফাঁকা পাবো। যতদূর করবার করব। আগে ভাগেই চলে যাবে হয়ত।'

'হুকুম তামিল করা যাবে, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। তোর কাছ থেকে ওকে ভাগাবার জন্যে তেলে জলে এক করতে হলেও করব।'

কিরিল আন্দ্রেয়েভিচকে বিদায় দিয়ে বাখরুশিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, ভেবেছিল বুড়ো সত্যি সত্যিই তেলে জলে এক করবে। কিন্তু এ ঘণ্টা না যেতেই দেখা দিল ত্রফিম।

'ফের এলাম পিওতর। তুদোয়েভ বলছিল তুই আজকে রেলওয়ের কাছে বাখরুশি বিক্রি করবি। তুই এমন গোবেচারা, ভয় হল তোকে না ঠকায়।'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ একেবারে মুখ খারাপ করে বসে আর কি!

'না ত্রফিম, তুই বরং মাথা না গলালি। মানে এটা তো ঠিক আমেরিকান স্টক একসচেঞ্জ নয়, কলখোজের দপ্তর।'

'না হল ত কী হল? সব শালাই সমান। রেলওয়েতে ঠকজোচ্চোর সবখানেই আছে। যেমন এখানে তেমনি ওখানে। আসল কথা হল কর্মকর্তাটি যাতে বেশি বাট্টা না মারতে পারে।'

'ত্রফিম!' চটে উঠতে হল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে। 'আমাদের এখানে অন্য ব্যাপার।'

'তা হতে পারে,' ত্রফিম ক্ষান্ত হল না, 'হতে পারে অন্য রকম ব্যাপার, কিন্তু টাকা সেটা টাকাই, তার নাম যাই দাও। ডলার না থাকলে ওখানে মরণ, রুবল না থাকলে এখানেও অবস্থা সুবিধার দাঁড়ায় না। বিজনেস হল বিজনেস। মুরগীর বাচ্চাও পানাহার চায়...'

বাখরুশিন ত্রফিমকে বার করে যে দিল না, সেটা অনেক কষ্টে। অতিথি-বৎসলতার জন্যেই শুধু নয়। স্বাগত করেছে, খাইয়েছে দাইয়েছে, বাস্। সবেরই একটা সীমা আছে। কিন্তু টেনর... ত্রফিমের সঙ্গে আছে টেনর। কে জানে, বাখরুশিনের এই কাণ্ডটা নিয়ে টেনর কী প্যাঁচ করবে।

নিজেকে দমন করার দরকার ছিল। তাই পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে বলল:

'কিন্তু তোদের ওখানে ফার্মের সব ব্যাপারে যদি আমি উপদেশ দিতাম, তাহলে কী দাঁড়াত ত্রফিম?'

'আমি তো তাহলে মাথা নোয়াতাম তোর পায়ে। আমাদের মার্কিন নিয়মে বলে, সবারই কথা শুনবে, সবচেয়ে নির্বোধ উপদেশও শুনে যাবে। লাভ না থাকলে সে উপদেশ নিয়ো না। আমার ইচ্ছে বাখরুশিতে নিজের খানিকটা স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাই। বেচা কেনার ব্যাপার হলে ওটায় আমি ওস্তাদ... লোকে যেখানে এক ডলার পায়, আমি পাই দেড় ডলার। কড়া ক্রান্তিও ছাড় যায় না আমার কাছে।'

ভাইকে বুঝিয়ে যাওয়া আর তার শক্তিতে কুলাচ্ছিল না। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ঠিক করল মিনিটখানেকের জন্যে ওকে একলা রেখে পার্টি সেক্রেটারি দুদোরভের কাছে যাবে, তাকে বলবে রেলওয়ের লোকেদের যেন গ্রাম সোভিয়েতের আপিসে নিয়ে যায়, ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে বলবে ও সেখান থেকে বাখরুশিনকে ফোন করবে।

তাই করে ফিরে এসে আরো বহুক্ষণ ধরে ত্রফিমের হিতোপদেশ শুনতে হল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে।

ত্রফিম বলে চলল:

'সাধু হওয়া চলে কেবল স্বর্গে, সেখানে সাধু ছাড়া কেউ নেই। পৃথিবীতে কেবল হাঙর কুমিরের বাস। তুই না খেলে তোকে খাবে। যেমন ধর আমার প্রতিবেশী, লোকটা আমার চেয়ে ধনীই ছিল। তালে ছিল আমার ফার্মটা হাত করবে। করেও ফেলত, কিন্তু ও যায় ডালে ডালে, আমি পাতায় পাতায়। জানত না ওর ঋণপত্রগুলো আমার হাতে... ভেবেছিল কোম্পানি তাড়া দেবে না... আমার ফার্মটা আগে মারবে... কিন্তু আমি ওকে ল্যাঙ মারলাম। ফ্যালো টাকা। আমাদের ওখানে বিচার হয় খুব তাড়াতাড়ি, খাঁটি। বুড়ো চোখ মেলতে না মেলতেই ওর ফার্মটি চলে এল আমার হাতে। একেবারে সবকিছু। শুধু দয়া করে কিছু লোহালক্কড় ছেড়ে দিয়েছিলাম... এবার ঘর যাও বাপু বাছাধন!'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ঠিক করল আলাপ চালাবে না, প্রশ্ন করবে না, বিস্ময় প্রকাশ করবে না, তর্ক করবে না। নীরবে সে ভাইয়ের দিকে চেয়ে

চেয়ে ভাবল ত্রফিমের পাশে তার দাদু ন্যাতাওয়ালা দিয়াগিলেভ কোথায় লাগে — টাকার কুমীর হলেও সে তবু ছিল অনেক সহনীয়।

ত্রফিম কিন্তু আত্মতৃপ্তিতে বলে চলল:

'তোদের কলখোজটা কী? এও তো আমাদের মতোই একটা ফার্মই, কেবল এজমালি; মাথা নেই।'

'মাথা নেই কী রকম?' সংযম রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

'মনিব নেই। হাজার হলেও তুই কেবল একটা ম্যানেজারের মতো। নিজের বলতে তোর এখানে কিছুই নেই। তুই কেবল একটা পেনসিল, অন্যে লিখছে।'

'পেনসিল, অন্যে লিখছে?'

প্রশ্ন করে বাখরুশিন ভাইয়ের দিকে এমন ভাবে চাইল যে ত্রফিম বুঝল আলাপ বন্ধ করাই ভালো। তাই একটু নরম হয়ে বললে:

'সবাই আমরা ভগবানের হাতের কলম...'

'কথা ঘোরাচ্ছিস? তা ভালোই। কে কী দিয়ে কী করে লেখে, সে কথা বরং আমাদের আলাপ না করাই ভালো ত্রফিম। সব মাথায় তা ঢুকবে না। আফশোসেই কথাটা বলছি...'

'আমার জন্যে আফশোস!.. আমি তোর চেয়ে বরং শক্ত পায়েই দাঁড়িয়ে আছি। নিজের জমিতে। নিজের সম্পত্তিতে। আমায় কেউ ভাগাতে পারে না, ভোটে হারাতে পারবে না, তোকে যেমন পারে। আমি মনিব আর তুই?'

সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটাতেই ঘা পড়ল এতে। বাখরুশিনের সামনে এখন যে দাঁড়িয়ে সে আর একটা সাধারণ আপত্তিকারী নয়, রুষ্ট শত্রুভাবাপন্ন এক ব্যক্তি। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বলল:

'মারতে উঠিস না ত্রফিম। ভালো মনেই বিদায় নেওয়া ভালো। নিজেকে তুই ভাবছিস একেবারে ইস্কাপনের টেক্কা, কিন্তু আসলে তুই একটা ধুলো। ফুঁ দিলেই উড়ে যাবি। তুই কেউ নোস। পুঁজিবাদের ওকালতি করার মতো একটা বুদ্ধিমান কথাও তুই বলতে অক্ষম। তুই ছিলি একটা ক্ষুদে চশমখোর, তাই থেকে গেছিস। তোদের মতো লোকের পেছনেও কিছু নেই, সামনেও কিছু নেই। কেবল অন্ধকার। বহু আগেই তোর অস্তিত্ব গেছে। তুই আছিস এটা কেবল তোর মনের ভুল, পা-কাটা লোকের যেমন মাঝে মাঝে মনে হয়

বুঝি গোড়ালিটা চুলকাচ্ছে। তোর মনে হচ্ছে তুই আমার সঙ্গে তর্ক করছিস। কিন্তু আসলে তর্ক করছিস নিজের সঙ্গে। এখানে যা দেখছিস, তা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে তোর। অবিশ্বাস করতে চাস কারণ যা দেখলি তাতে তোর হাঙর কুমিরের দুনিয়াটা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। দেখতে পেয়েছিস পরস্পর খাওয়াখাওয়ি না করেও লোকে বাঁচতে পারে। এটা বিশ্বাস করতে তোর ভয় হচ্ছে। এটা মানতে পারিস না তুই। কারণ মানতে গেলে নিজেকেই মুছে দিতে হয়। বিশেষ করে তোর মতো বয়সে সেটা সহজ নয়। কিন্তু আমি তোকে কোনোই সাহায্য করতে পারব না। আমাদের বাচ্চা পাইওনিয়রদের কাছেও যেটা বোধগম্য, সেটাও তোর মাথায় ঢুকবে না।'

তুদোয়েভ এল।

'আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ মিঃ বাখরুশিন, এইখানেই শেষ করি।'

'তুই তাহলে এখানে!' খুশি হয়ে উঠল তুদোয়েভ, 'দিয়াগিলেভদের কয়েকটা পুরনো ফোটোগ্রাফ খুঁজে বার করেছি। পুরো পরিবারটার সে এক প্রদর্শনী। তোর দাদামশাই, তোর দিদিমা, আর তোর বাচ্চা কালের ছবি… অল্প বয়সের দারিয়া, তোর মায়ের রূপ আর ধরে না, শেয়ালের লোমের কোট … চল দেখবি!'

'চল দেখি গে,' অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে ত্রফিম। ভাইকে উদ্দেশ করে বললে, 'রাগ করিস না পিওতর, পরে একসময় খোলসা হয়ে নেওয়া যাবে… টেনর থাকলে ভালো হত… কুশল হোক তোর।'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সকালটা আজ নষ্টই হল। হাতের একটা ভঙ্গি করে সে থুতু ফেলল সেই দিকটায় যেখানে দরজা বন্ধ হচ্ছিল ত্রফিমের পেছনে।

২৩

সন্ধ্যায় অভ্যাগত ভবনে এসে হাজির হল ফিওদর পেত্রোভিচ স্তেকোলনিকভ। তুদোয়েভা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললে মিস্টার-না-টিস্টারটি চলে গেছে নদীতে স্নান করতে, আর ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ গেছে কিরিল আন্দ্রেয়েভিচের সঙ্গে মাছ ধরতে, জোয়ান কালের মতো বনেই রাত কাটাবে।

'চমৎকার,' খুশি হয়ে উঠল স্তেকোলনিকভ, 'যত মাছ ধরে ঝোল করবে, ততই পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে ঝামেলা সইতে হবে কম।'

'তা ঠিকই, ফিওদর পেত্রভিচ। একেবারে আরশুলা, প্রতিটি ফাটলে গিয়ে ঢোকা চাই, প্রতিটি সুপে গিয়ে পড়া চাই।' নালিশ করল পেলাগেয়া কুজমিনিচনা, 'আমাদের ব্যাপারে গো মুখ্যু অথচ সব কিছুতে কর্তাত্বি।'

'আর মিস্টারের কেমন চলছে?' জিজ্ঞাসা করল স্তেকোলনিকভ।

বুড়ি একটা ঝাপসা রকম জবাব দিল:

'ভারি গোলালো। পিছলে যায়। সবেতেই ছুটছে যেন বরফের ওপর বল, ধরতে গেলেই পিছলে যায়। কথায় মনে হয় মধু মাখা, কিন্তু কাজে কে জানে... আমি তো খুব একটা পার্টি ফার্টি বুঝি না... ফিওদর পেত্রভিচ।'

'কী যে বলেন পেলাগেয়া কুজমিনিচনা... ঐ মনে হচ্ছে উনি আসছেন।' চোখ আড়াল করে তুদোয়েভা তাকাল সূর্যাস্তের দিকে।

'ঐ বটে। আর তুই নাকি ওকে অনেক দিন থেকে জানিস?'

'কোথেকে শুনলেন?'

'আমার কান তো এখনো যায়নি ফিওদর পেত্রভিচ।'

'হ্যাঁ, আমি ওকে জানতাম,' স্তেকোলনিকভ বলল, তারপর নিজের দিকে নজর করে হালকা ক্যাম্বিসের হাই বুটটা ঠিক করে কোর্তার বোতাম এ'টে এগিয়ে গেল টেনরের দিকে।

'হ্যালো জন,' অভিনন্দন জানাল স্তেকোলনিকভ 'আমার কথা মনে না থাকলেও আমি তোকে ঠিক চিনেছিলাম...'

টেনর থামল, চাইল স্তেকোলনিকভের দিকে, কপালটা মুছল, হাত মুঠো করে স্মৃতি ঝালিয়ে নেবার জন্যে মাথা ঠুকল কয়েকবার। তারপর লাফিয়ে উঠে গেয়ে উঠল:

'"ফুল ফুটেছে আপেল গাছে, নাসপাতিতে..." তরোয়ালে বে'ধানো কাবাব... মদের জন্যে মগ... দয়া করে ক্যাপ্টেন এই ঢেলাটা দিয়ে আমার মাথায় কয়েকটা ঠোকন দে তো, নামটা মনে পড়ে যেতে পারে।'

'ফিওদর,' বলে দিল স্তেকোলনিকভ।

'ফিওদর!' চে'চিয়ে উঠে ফের লাফিয়ে উঠল টেনর।

কোলাকুলি করলে ওরা...

'"বিদায় ও গো নগর, কাল সাগরে যাবো মোরা..."' গেয়ে উঠল টেনর। 'আমার প্রথম রুশী গান তুই শিখিয়েছিলি... যুদ্ধের ট্রফি হিসাবে একটা বাজনা-দার মগ উপহার দিয়েছিলি তুই... এবং আপাতত আমায় মুখের ওপর ছাড় একটি রুশী কায়দার ঘুসি, কারণ তোর নামটা ভুলে গিয়েছিলাম। এমন ভুল হওয়া সম্ভব কেবল আমেরিকানদের... না, না, কিছু বলতে আসিস না... আমেরিকানরা ভারি ভুলো লোক। আমি জানি, আমি খুব ভালোরকম জানি।'

'খুব হয়েছে জন। আমিও তোর নাম ভুলে গিয়েছিলাম ... কিন্তু যখন তুদোয়েভের ছবি তুলছিলি তখন দেখেই চিনতে পারি। অতএব কাটকুট...'

'কাটকুট! ঠিক। চমৎকার ছোট্ট একটা কথা। আমরা সমানে সমানে। সুতরাং চল যাই আমাদের হোটেল দ্য বাখরুশিতে, উৎসব পালনের মতো কিছু জোগাড় করা যাবে।' টেনর স্তেকোলনিকভের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল অভ্যাগত ভবনে।

পরে নদীর দিকে চেয়ে বললে:

'যে কোনো নদীই এলবা হয়ে উঠতে পারে, যদি লোকে তা চায়... যদি চাওয়াটা সম্ভব হয়... কিন্তু সে কথা পরে। এখন আমায় বল ফিওদর। গোটা ভূগোলকটাকে আলিঙ্গন করব এটা তুই চাস?.. নাকি ভাবছিস, আমার এই ছোটো ছোটো হাতে তা কুলাবে না... তাহলে সূর্যটা অস্ত যাবার আগেই বরং ওটাকে আমার এই ঝোলাটায় পুরে নিই — ঝোলাটা আজ ভারি সুবিধামতো কিনে ফেলেছি গাঁয়ের দোকানে। সূর্যটা আলো দিয়ে যাক সেই এলবা পারের মতো, সেই এলবা পারের মতো!'

জনের অসংযত বাচালতায় খুশি লাগল স্তেকোলনিকভের। একটু মুটিয়ে যাওয়া ও একটু টাক পড়ে আসা এই আমুদে লোকটা ঠিক আগের মতোই প্রাণোচ্ছল থেকে গেছে। মনে হল যেন ওরা দুজনে ফের ফিরে গেছে সেই স্মরণীয় এলবা তীরে, যে দুটি দেশের হাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার চাবি, বহু জাতির ভাগ্যসূত্র, বহু পরিবারের জীবন নির্ভর করছে, তাদের মধ্যেকার অস্বস্তিকর উত্তেজিত "শান্তি" ও ঠান্ডা "বন্ধুত্বের" দীর্ঘ বছরগুলি যেন তাদের আলাদা করে দেয়নি।

দীর্ঘ হোক পুনর্মিলনের এই মুহূর্তগুলো! আজ কোনো কণ্টকিত প্রসঙ্গ তুলবে না স্তেকোলনিকভ। কথা কইবে ঘর সংসার ছেলে মেয়ে নিয়ে,

উরালের মাটির ঐশ্বর্য, ক্যামেরার নিখুঁতীকরণ, এমন কি আন্তর্গ্রহ ভ্রমণ নিয়ে… বোঝাপড়া যেখানে সবচেয়ে কঠিন সেই চক্রের মধ্যে পা না দিয়ে লোকে কি কথা কইতে পারে না। পারে না কি চন্দ্র ভ্রমণ বা মানুষের আয়ুবৃদ্ধি নিয়ে আলাপ চালাতে?

রাতের খাওয়া শুরু হল সেই ভাবেই। একটা মস্ত কালো লোহার প্যানে করে পেলাগেয়া কুজমিনিচনা নিয়ে এল ডিম ভাজা, সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ কলি। এক বোতল ফলের সুরা বার করল তুদোয়েভা, এটা সে মাঝে মাঝে খেত, নিয়ে এল অল্প নোনা শসা, তারপর নুন জলে সেদ্ধ করা নতুন ওঠা আলু, তাতে ভিনিগারের ছিটে।

নিজের কাহিনী শোনাল ফিওদর পেত্রভিচ, এলবা তীর থেকে শুরু করে গাঁয়ের এই গোরামিলকা নদীর তীর পর্যন্ত।

টেনরও শোনাল তার জীবনের এই টুকরোটার কথা — শোনাল লম্বা সময় নিয়ে কিন্তু বেশ ফুর্তি করে।

অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি ও অপ্রাসঙ্গিকতায় ভরা এই কাহিনীটা থেকে ফিওদর পেত্রভিচ বুঝল টেনরের বর্তমান পেশা হল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ, এবং রুশ বই ভাঙিয়ে প্রবন্ধ। বোঝা যায় এসব থেকে তার রোজগার হয় প্রচুর। নইলে ত্রফিমের সফরকে সে সাবসিডাইজ করতে পারত না, এতে টাকা তো কম লাগেনি।

টেনর একথা গোপন করল না যে সফর থেকে সে শুধু জনপ্রিয়তা অর্জন করবে না, ভালোরকম পারিতোষিকও মিলবে।

'সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ে সত্যের চেয়ে মিথ্যের বাজার এখনো চালাও হলেও সত্যের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সুবিধা পেয়ে গেলাম, চুক্তি সই করে এত টাকা মিলল যে ত্রফিমের সফরের জন্যে টাকা ঢালতে অসুবিধা হল না।'

ত্রফিমের সঙ্গে দেখা হল কেমন করে এ প্রশ্নের জবাবে বলল:

'দুই ভাইকে নিয়ে বই লিখব তেমন নায়কের সন্ধানে ছিলাম বহুদিন। অনেকের কথা উঠেছিল। কিন্তু ভরসা পাইনি। তারা হয়ত আমেরিকায় ফিরতে চাইত না, বই লেখাও আমার হত না।'

'কেন?'

'যে লোকটা আমেরিকার স্বর্গরাজ্য ছেড়ে কমিউনিস্ট নরক গ্রহণ করছে,

তেমন নায়ককে নিয়ে লেখা বই আমেরিকার কোন প্রকাশক ছাপবে? তেমন বই লিখবে শুধু আহাম্মকেরা। আর আমি বদ্যির বেটা, ডোজ জিনিসটা কী জানি। আমার মা বেহালা বাজাত। তার কাছ থেকে শিখেছি তালজ্ঞান কাকে বলে।'

স্তেকোলনিকভ বললে, 'আমি আপত্তি করতে পারতাম জন। আমার বাপ বদ্যি নয়, মাও বেহালা বাজাত না, কিন্তু মাত্রা, তালজ্ঞান এটা আমার কাছেও অজানা নয়। তাই বন্ধুসুলভ কয়েকটা উক্তি আমি পরের বারের জন্যে রেখে দিলাম। আপাতত শোনা যাক ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচকে পেলি কী করে?'

'ও নিজেই এসে উদয় হল। শিওর-উইন টিকিট থেকে ভাগ্য লক্ষ্মী ওকে টেনে আনে আমার জন্যে। "রাশিয়ার পথে" বইখানা থেকে ও আমার কথা জানত। বইটা মনে হয় রুশ ভাষায় অনূদিত হবে... ও আমায় খুঁজে বার করে নিজের জীবনের কথা বলে, জিজ্ঞেস করে রাশিয়ায় এলে ওর জীবন-বিপদ হতে পারে কি না... ও যখন খবরের কাগজটা দেখাল, যাতে ওর ভাই পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কথা লেখা, তখন আমার বিশ্বাস হল, আকাশে এখনো এমন ঊর্ধ্বতন শক্তি বর্তমান, জন টেনরের ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের মতো সময় যার হয়... পরের উদ্যোগটা আমার তরফ থেকে... ত্রফিমের আর কিছু ভাবনার ছিল না, শুধু বলা যে "যাবো"। আর পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে চিঠিটুকু লেখা, — সাবেকি রুশীয় "ইয়াৎ ফিয়াৎ", আর কড়িচিহ্নগুলো বাদ দিয়ে চিঠিটা ওর হয়ে আমিই লিখে দিই। নতুন রুশী বর্ণমালা ত্রফিম জানে না। সাবেকী বর্ণমালাটাও জানে কিনা, খুব নিশ্চিত নই।'

নিজের রুশ ভাষার জ্ঞানে খুশি হয়ে টেনর ত্রফিমের সঙ্গে তার পরিচয়ের কাহিনীটা পুরো শুনিয়ে গেল, স্তেকোলনিকভকে ধরে রাখল রাত দু পহর পর্যন্ত।

কলখোজের আপিসে ফোন করল ফিওদর পেত্রভিচ, গাড়িটা ছিল সেখানে। টেনরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করল, কথা দিল মার্কিন ধাঁচের নতুন সোভিয়েত "জীপ" গাড়ি তাকে একটা পাঠাবে।

২৪

ত্রফিম এমনই অপ্রীতিকর হয়ে উঠল যে তার সম্পর্কে লোকের আগ্রহ নিভে গেল, অনেকে এড়িয়েই চলত।

কলখোজ পার্টি কমিটির সেক্রেটারি গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ দুদোরভ মার্কিন অতিথিটির বিজাতীয় প্রভাব থেকে পার্টি-বহির্ভূত জনগণকে রক্ষা করার জন্যে কমিউনিস্টদের ওপর ভার দিয়েছিল প্রয়োজন হলে হস্তক্ষেপ করতে, "মুখের মতো জবাব দিতে", কিন্তু অচিরেই পার্টি সেক্রেটারি দেখল সে সতর্কতার প্রয়োজন নেই।

লোকটা ফুর্তিবাজ, রসিকতা ভালোবাসে। একদিন সে বললে পুঁজিবাদের মর্মকথা উদ্ঘাটন করার পক্ষে ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচের চেয়ে ভালো প্রচারক এ জেলায় তো দূরের কথা, গোটা অঞ্চলে মিলবে না।

তার অর্থগৃধ্নু লুঠেরা স্বভাবটা এতই অনাবৃত যে তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিতে যাওয়াটা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, যৌথখামারীদের কাছে এমন কি অপমানকরই।

ত্রফিমের বাক্যপ্রিয়তার মূল্যায়নে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ও দুদোরভের ভুল হয়নি। এটা শুধু তার বয়সের দোষ ও আত্মম্ভরিতার কারণে নয়, তার জীবনের আদর্শ ও ভিত্তিটাকেও যাচাই করে নেবার তাগিদে। তার দাদু দিয়াগিলেভের কাছ থেকে পাওয়া এবং আজো পর্যন্ত অনড় এই জীবনাদর্শটা তার পরীক্ষা করে দেখা ভালো।

যাদের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে তারা সবাই শুধু শুধু তার কথায় আপত্তি করছে, একাধিক দেশ যেসব সত্য আঁকড়ে আছে তাকে এরা শুধু শুধুই উপহাস করছে, তা তো হতে পারে না। তার মানে নিশ্চয় অন্য এমন কিছু একটা জোরালো শক্তি আছে যাতে নাকচ হয়ে যাচ্ছে সেই প্রধান কথাটা যা তার কাছে মানব জীবনের আবশ্যিক সর্ত হয়ে ছিল, আছে এবং থাকছে।

কী সেই শক্তি? কীসে ধরে রাখছে তাদের এই কলখোজটা? নেহাৎ রঙীন কথার জোরে চোখ বন্ধ করে তো আর ওরা এই অন্যরকম জীবনটা গড়ে তুলছে না, যার সঙ্গে তার ফার্মের জীবনের কোনো মিল নেই? এই

সর্বাকছ্বকে যে এরা ভালোবাসছে, যত্ন নিচ্ছে, রক্ষা করছে, সেটা কীসের তাগিদে?

নিজের জীবনবিশ্বাসটাকে 'ওদের' বিরূদ্ধে দাঁড় করাবার ইচ্ছেটা ওর দিনের পর দিন অদম্য হয়ে উঠতে লাগল। ওর দীর্ঘ জীবনের অর্জিত বোধটা যাতে ঘা খাচ্ছে সেটা কী তার খানিকটা আভাস তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব কেবল এই সংঘাতে, এই আপত্তিতে।

স্মেতানিন একজাতের "এস এস এস" মটরশ্বঁটি তুলেছিল। তাকে ওটের সঙ্গে একত্রে রোপন করা যায়। সে রকম মটরশ্বঁটি ত্রফিম এযাবৎ দেখেনি। প্রশংসা করে ত্রফিম একদিন প্রধান কৃষিবিদকে বললে:

'এমন মটর তুলেছেন আপনি, গ্বণ আপনার অম্বল্য সের্গেই সের্গেয়েভিচ। এক এক গোছায় অনেক গ্বটি এক একটা গ্বটিতে অনেক মটর। মটরও কেমন চমৎকার... কিন্তু মটর আপনারা ভেঙে বিক্রি করেন না কেন?'

'মটর ভাঙার দরকার কিসের?' কথাটা কোন দিকে চলেছে না ব্বঝে জিজ্ঞেস করল স্মেতানিন।

'গোটা মটর হল গে বীজ। আপনাদের প্রতিযোগীরা, আশেপাশের কলখোজরা আপনাদের এই মটর ব্বনতে থাকবে, বছর দ্বই যেতে না যেতেই আপনারা পিছনে পড়ে যাবেন।'

কোনো উত্তর জোগাল না স্মেতানিনের, যদিও নিজের ও মটরটা সে তুলেছিল ঠিক এই উদ্দেশ্যেই যাতে উঁচু-ফলনী শক্ত জাতের মটরের চাষ চারিদিকে ছড়ায়। সে কথা বললে ত্রফিমের মাথাতেও তা ঢুকত না। কলখোজগ্বলো তার কাছে মনে হয়েছিল চাষীদের একধরনের জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি, ব্যবসা চালাচ্ছে ঐ ধরনের অন্যান্য কোম্পানি অর্থাৎ আশেপাশের কলখোজগ্বলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

পশ্ববিশেষজ্ঞ ভলোদিয়া কজলোভকে সে তাই বলেছিল:

'যাই বলো, গর্বর ব্যাপারটা আমি ব্বঝি। বড়াই করছি না, খামারে আমার সত্যিই চমৎকার গর্ব আছে। কিন্তু আপনাদের কাছে তা লাগে না। তাই আরো আফশোসের কথা যে আপনারা শ্বধ্ব বকনা বাছ্বর নয় এঁড়ে বাছ্বরও বিক্রি করেন।'

ভলোদিয়া কজলোভ তার এমনিতেই বড়ো বড়ো ধূসর চোখদুটো আরো বড়ো করে ধৈর্য ধরে বোঝাতে লাগল:

'কী বলছেন ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, দশ এগারো মাসের প্রতিটি এঁড়ে বাছুরের জন্যে আমরা পাই সাত এমন কি আট হাজার রুবল… এঁড়ে বাছুরের জন্যে লোকে আগে থেকে নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করে আছে… আয়ের দিক থেকে ভারি লাভজনক।'

জবাবে মৃদুস্বরে একটা গোপন কথা বলার মতো করে তরুণটিকে বুদ্ধিদান করতে চাইল ত্রফিম:

'তর্ক করব না, কিন্তু লাভজনক সে কেবল যদি ভবিষ্যৎ না দেখি, বড়ো জোর চার বছর। যদি আর একটু দূরদৃষ্টি রাখি, তবে ঐ মটরের মতোই অবস্থা দাঁড়াবে।'

'কী দাঁড়াবে?' জ্ঞানতৃষ্ণু পশুবিশেষজ্ঞ আগ্রহী হয়ে উঠল।

'কী আবার,' ত্রফিম হতাশার ভঙ্গি করে ভলোদিয়াকে আরো জ্ঞানদান করতে শুরু করল। 'যদি শুধু বকনা বাছুরটা বিক্রি করো, আর এঁড়ে বাছুর নিজেরা কেটে কিছুটা লোকসান দিয়েও মাংস বানিয়ে ছাড়ো, তাহলে এই উঁচু জাতের গরুটার একচেটিয়া তোমাদেরই থেকে যাবে। এঁড়ে নইলে শুধু বকনা দিয়ে তো আর গোয়াল বাড়ে না। তার ফলে তোমাদের বকনা বাছুরের জন্যে চাহিদা থাকবে সব সময়।'

স্মেতানিনের মতো ভলোদিয়াও ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচকে একথা বোঝাতে গেল না যে কলখোজগুলোর তথা দেশের সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে সম্পর্কটা পারস্পরিক সাহায্যের, একের ঘাড় ভেঙে অন্যের মুনাফা তোলার মধ্যে নয়। কথাটা বোঝাতে যাওয়া হত শক্তির বৃথা অপচয়। প্রথমে বলতে হত লোকেদের মধ্যে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের কথা। বলতে হত জন-মেহনতী জন-মালিকের কথা। তারপরে আসতে হত সমাজতন্ত্র ও জনসম্পত্তির মূল কথায়। অল্প করে হলেও সাতসালা পরিকল্পনার ছকটা ছুঁয়ে যেতে হত… কিন্তু সেটা এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টার নয়, কয়েক মাসের কাজ, কারণ ত্রফিমের মাথা পরিষ্কার করার কাজটা বড়ো চিশ্চার জলা পরিষ্কার করার চেয়েও দুরূহ। ভলোদিয়া বলল:

ভলোদিয়া কজলোভ তার এমনিতেই বড়ো বড়ো ধূসর চোখদুটো আরো বড়ো করে ধৈর্য ধরে বোঝাতে লাগল:

'কী বলছেন ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, দশ এগারো মাসের প্রতিটি এঁড়ে বাছুরের জন্যে আমরা পাই সাত এমন কি আট হাজার রুবল... এঁড়ে বাছুরের জন্যে লোকে আগে থেকে নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করে আছে... আয়ের দিক থেকে ভারি লাভজনক।'

জবাবে মৃদুস্বরে একটা গোপন কথা বলার মতো করে তরুণটিকে বুদ্ধিদান করতে চাইল ত্রফিম:

'তর্ক করব না, কিন্তু লাভজনক সে কেবল যদি ভবিষ্যৎ না দেখি, বড়ো জোর চার বছর। যদি আর একটু দূরদৃষ্টি রাখি, তবে ঐ মটরের মতোই অবস্থা দাঁড়াবে।'

'কী দাঁড়াবে?' জ্ঞানতৃষ্ণ পশুবিশেষজ্ঞ আগ্রহী হয়ে উঠল।

'কী আবার,' ত্রফিম হতাশার ভঙ্গি করে ভলোদিয়াকে আরো জ্ঞানদান করতে শুরু করল। 'যদি শুধু বকনা বাছুরটা বিক্রি করো, আর এঁড়ে বাছুর নিজেরা কেটে কিছুটা লোকসান দিয়েও মাংস বানিয়ে ছাড়ো, তাহলে এই উঁচু জাতের গরুটার একচেটিয়া তোমাদেরই থেকে যাবে। এঁড়ে নইলে শুধু বকনা দিয়ে তো আর গোয়াল বাড়ে না। তার ফলে তোমাদের বকনা বাছুরের জন্যে চাহিদা থাকবে সব সময়।'

স্মেতানিনের মতো ভলোদিয়াও ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচকে একথা বোঝাতে গেল না যে কলখোজগুলোর তথা দেশের সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে সম্পর্কটা পারস্পরিক সাহায্যের, একের ঘাড় ভেঙে অন্যের মুনাফা তোলার মধ্যে নয়। কথাটা বোঝাতে যাওয়া হত শক্তির বৃথা অপচয়। প্রথমে বলতে হত লোকেদের মধ্যে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের কথা। বলতে হত জন-মেহনতী জন-মালিকের কথা। তারপরে আসতে হত সমাজতন্ত্র ও জনসম্পত্তির মূল কথায়। অল্প করে হলেও সাতসালা পরিকল্পনার ছকটা ছুঁয়ে যেতে হত... কিন্তু সেটা এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টার নয়, কয়েক মাসের কাজ, কারণ ত্রফিমের মাথা পরিষ্কার করার কাজটা বড়ো চিশ্চার জলা পরিষ্কার করার চেয়েও দুরূহ। ভলোদিয়া বলল:

'ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, এই সব পরামর্শ আপনি বরং আমাদের কলখোজ ব্যবস্থাপকমণ্ডলী কি পার্টি সেক্রেটারির কাছে দিন। আমি ছেলেমানুষ... ওঁরা এ সব ভালো বোঝেন।'

'পরামর্শ দেব, বৈকি, নিশ্চয় দেব,' কথা দিল ত্রফিম।

২৫

কথা রেখেছিল ত্রফিম। হাজির হল পার্টি কমিটিতে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ দুদোরভের কাছে।

পার্টি আপিসের দেয়ালগুলো সম্ভবত তাদের সারা জীবনে এই প্রথম এমন ধারা কথা শুনল।

ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ শুরু করল এই ভাবে:

'গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, আপনি তো হলেন গিয়ে তরুণ কমিউনিস্ট পাণ্ডা, কী করে ধনসম্পদ বাড়ানো যায়, সচ্ছলতা আনা যায় তা জানতে নিশ্চয় আপত্তি হবে না আপনার।'

'জানতে চাইব না আবার?' হাসি চেপে অভ্যাগতের সামনের কেদারাটায় এসে বসল দুদোরভ, শুধু শুনতে নয়, তার মূল্যবান মন্তব্যগুলো টুকে নেবার জন্যেও প্রস্তুত হল।

এঁড়ে আর মটরের কথা পেড়ে ত্রফিম চলে এল ধনবৃদ্ধির কর্মসূচিতে:

'এই মটর, এই গোধন, এই জমি, বন, পাখিভরা সরোবর, আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই লোকগুলো যদি আমার হত, তাহলে তিন চার বছরের মধ্যেই বাখরুশিতে এমন ধনদৌলৎ বাড়িয়ে তুলতাম যা আমেরিকানদের চেয়ে কম হত না।'

'অতি চিত্তাকর্ষক কথা,' আগুনে ঘি দিল দুদোরভ, মুখের ভাবে এমন মনোযোগ ফুটিয়ে তুলল যে মনে হল যেন শুধু তার ছোটো ছোট গোলাপী কানদুটো নয়, নীল চিন্তাচ্ছন্ন চোখদুটো, উঁচু কপালটা, পেছন দিকে আঁচড়ে আনা বাদামী কোঁকড়া চুল এবং গালের টোলটা পর্যন্ত সবকিছুই এক বিপুল উদ্ঘাটনের আশায় উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

খুশি হয়ে ত্রফিম বললে:

'আমার ভাইটি, পিওতর একটু সাদামাটা লোক। চট করে লোককে বিশ্বাস করে বসে। ওর কাছে সবাই আসে কায়দাকানুন জেনে নিতে আর ও কিছু রাখা ঢাকা না করে সব উজাড় করে দেয়। নিজের পেটেণ্ট সব খুলে জানায়। ব্রিগেড-নেতা, গ্রুপ-নেতারাও তাই।'

'এরাও নিজেদের গুহ্য পদ্ধতি সব ফাঁস করে দেয়?'

'একেবারে তাই, গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ।'

'কী করা যায় তাহলে?'

'কলখোজের জমিটা সব ঘিরে ফেলা উচিত। ঘিরে ফেলে প্রতিযোগী কারো আসা বন্ধ করতে হয়।'

'বটে, বটে, বটে...' ত্রফিমের ফুসো ফুসো মুখ, ফুলো ফুলো চোখের থলির দিকে চেয়ে দেখল দুদোরভ, এই প্রথম সে বোধ হয় একটা খাঁটি জীবন্ত পরজীবীকে দেখল।

'এই হল প্রথম কথা,' বলে চলল ত্রফিম, 'দ্বিতীয় কথা হল শহরে যৌথখামারী বাজারটা দখল করতে হবে। নিজের কলখোজের শক্তিতে না কুলায় তাহলে এমন কলখোজকে সহযোগী নিতে হবে, যে টাকা ঢালতে পারবে এবং দুধ, মাংস, শাকসবজি, হাঁসমুরগি ইত্যাদির দাম হাতে নিতে হবে।'

'কিন্তু সেটা করা যায় কী করে?'

যেন কারো গলা টিপছে এই ভঙ্গিতে হাত মুঠো করল ত্রফিম। বলল:

'দাম নামিয়ে দিয়ে। প্রথম প্রথম খানিকটা লোকসান হলেও ভয়ের কিছু নেই। প্রতিযোগিতা চালালে তা চালাতে হবে মৃত্যুপণ করে, অন্য যৌথখামাররা যাতে হাল ছেড়ে দেয়। ওরা যখন কান্না জুড়বে তখন খালি হাতে ওদের বশ করো। আপনাদের মারফত মাল বেচতে রাজী হবে তারা, ভালো কমিশন পাওয়া যাবে। পরে কলখোজ বাজারকে যেমন খুশি চালানো যাবে। ব্যাপারটা বুঝলেন গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ?

'বুঝেছি ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, কেবল একটা কথা মাথায় ঢুকছে না।'

'কী বুঝছেন না, বলে ফেলুন। লজ্জা কী। নিজের স্বজনদের কাছ থেকে কিছু লুকাব না। এ ব্যাপারে আমি ঝানু...'

'বুঝতে পারছি, মাথায় ঢুকছে,' কপট সম্মান দেখিয়ে বললে দুদোরভ,

ত্রফিম সেটা সত্যি বলেই ধরল। 'কেবল একটা অনুরোধ, অকপটে আমায় বুঝিয়ে বলুন তো: এই ভাবে বাজার দখল করলে কি অন্য কলখোজগুলোর মুশকিল হবে না?'

'হবেই তো। সেই জন্যেই তো বাজার। যার কাছে তুরুপের তাস, তার হাতেই টাকা। যার হাতে টাকা, তারই তো জীবন।'

'আর ভগবান?'

'কীসের ভগবান গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ?'

'আশেপাশের লোকেদের নিজের মতো করে যে ভালোবাসতে বলেছে… প্রতিটি লোককে নিজের ভাই, নিজের বোন বলে যে দেখতে শিখিয়েছে… আপনার কী মনে হয়, আমরা যদি অন্য কলখোজগুলোকে ঠেসে ধরি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে রুটি তারা রোজগার করেছে তা কেড়ে নিই তাহলে ভগবানের চোখে পড়বে সেটা?'

চোখ কুঁচকে ভুরুর তল থেকে তাকিয়ে ত্রফিম বলল:

'আপনি ভগবানের কথা তুলছেন কেন গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ? আপনি তো সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস করেন না।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। শেষ বিচারের দিনে আমাকে এবং পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে যদি সে রকম আদালতে সোপর্দ করা হয় তাহলে আমাদের বিশ্বাসের ওপর নয়, কী করেছি তার ওপরেই তো আমাদের বিচার হবে। আমাদের ব্যাপার তো সবারই চোখের সামনে খোলা। মটর আমরা ভাঙিনি। সের্গেই সের্গেয়েভিচ স্মেতানিনের "এস. এস. এস." মটর সবাই যার ইচ্ছে হয় বুনুক। চমৎকার চমৎকার এঁড়ে বাছুর দিচ্ছি আমরা। আমাদের গুণ আমরা মাটি চাপা দিয়ে রাখি না, আমাদের শক্তি ও সম্ভাবনা অনুযায়ী তা বিলোই… পরের মেহনতে বাঁচি না… কিন্তু শেষ বিচারে আপনাকে কিছু কড়া কথা শুনতে হতে পারে ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ?'

'কীসের জন্যে?'

'অন্তত এই জন্যে যে পার্টি কমিটির যে তরুণ সেক্রেটারির ওপর ন্যায় ব্যবস্থার ভার তাকে আপনি মুনাফাখোরি ও প্রতিবেশী পীড়নের পথ দেখাচ্ছেন… সিনাই পর্বতে মোজেসকে ঈশ্বর যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে পরিষ্কার করেই বলেছিলেন: "প্রতিবেশীর গৃহ, তার স্ত্রী, তার দাস, তার

বৃষের প্রতি কামনা রাখিয়ো না...” এমনি আরো সব কথা। স্মৃতি থেকে বলছি... কিন্তু শেষ বিচারের দিনে এ নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে আমায় হয়ত অভিযুক্ত করবে সোভিয়েত পন্থায় আর আপনাকে পুঁজিবাদী পন্থায়...’

‘কীসের অভিযোগ?’

‘সেটা আপনার নিজেকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। ভগবানের আইন অনুসারে নিজের অতীতটা বিচার করে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন... নিজের মাতা পিতাকে সম্মান করেছেন কি? আমি আপনার মৃত পিতা তেরেন্তি পেত্রভিচের কথা বলছি... নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রী... বুড়ো খামারী রবার্টের স্ত্রীর প্রতি কি কামনা পোষণ করেননি? নিজের ভাইদের হত্যা করেননি কি? অস্ত্র দিয়ে হত্যার কথা বলছি না, প্রতিযোগিতা মারফত ছোটো খামারীদের হত্যা... মোজেসের দুই ফলক অনুসারে এই সব বিচার করে তারপর একই মানদণ্ডে আপনার ভাই পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের জীবন ও কাজের বিচার করে দেখুন, আপনি যদি ঈশ্বর বিশ্বাসের ভান না করে সত্যিই ঈশ্বর বিশ্বাসী হন তাহলে খুবই পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রধান দেবদূতের কাছে শেষ বিচারের প্রাথমিক তদন্তে কার কী ভাগ্য ঝুলছে...’

রেগে উঠে ত্রফিম তার শার্টের গলা খুলে জিজ্ঞেস করল:

‘শাস্ত্র কথায় আপনার এত জ্ঞান হল কোথেকে?’

‘তার কারণ আমি কমিউনিস্ট, ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ... আর কিছু নাকচ, কিছু খণ্ডন করার আগে কমিউনিস্টরা সেটা ভালো করে বিচার করে দেখে... আর আপনি বা আপনাদের অন্য কেউ যিনি কমিউনিজম বিষয়ে লেনিনের মহৎ শিক্ষা খণ্ডন বা নাকচ করতে চান, তিনি যদি মোটামুটি ভাবেও সেটার সঙ্গে একটা পরিচয় করে নিতেন, তাহলে এখন যেভাবে সময় নষ্ট করছি, সেরকম সময় নষ্ট করতে হত না আমাদের।’

‘অভিবাদন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয় শ্রীমান কমিউনিস্ট।’

দুদোরভ উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে বললে:

‘আপনার সঙ্গে কপট হতে পারিনি বলে মাপ চাইছি। কিন্তু পরকে বশীভূত করার কথা বলে আপনি নিজেই এটা ডেকে এনেছেন। এরপর যদি

আপনি নিজের মনে আমার কথাগুলো আবার ভেবে দেখেন তবে বুঝবেন যে আপনি নিজেই যেটা খুব শক্ত করে বিশ্বাস করেন না সেটায় আমাদের বিশ্বাস করাতে যাওয়ায় লাভ নেই ... আচ্ছা ...’

ত্রফিম ফের মাথা নুইয়ে কার্পেটের কোনাটায় হোঁচট খেয়ে দুয়ারের দিকে গেল। দরজার ওপাশে ও কী যেন বলল কিন্তু মস্তো একটা এরোপ্লেন অবতরণের শব্দে তার কথা চাপা পড়ে গেল।

রাস্তায় নেমে কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে ত্রফিম এগুল দোকানের দিকে, দোকানের জানলায় এক বোতল চীনে ভোদকা “খাঞ্জা” অনেক দিন থেকেই তাকে টানছিল।

২৬

একত্রে শুরু হয়ে ঘাস কাটার কাজ শেষ হল বিনা বৃষ্টিপাতে। এখানে ওখানে ছোটখাট ডাঙ্গায় আর দূরের ফাঁকায় তরুণ পাইওনিয়র আর কমসোমলরা তাদের পরিকল্পনা-বহির্ভূত গাদা বানাচ্ছিল। এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার বছর আগে কলখোজে যখন টাকার টানাটানি চলছিল, কমসোমল ও পাইওনিয়রদের কাজের জন্যে তহবিল জোটানো সম্ভব হচ্ছিল না, তখন পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ পরামর্শ দেয় “ছোকরারা নিজেরাই নিজেদের টাকা তুলুক।” অ্যাকাউন্ট আপিসে কমসোমল ও পাইওনিয়রদের জন্যে বিশেষ অ্যাকাউন্ট খোলা হল। এইভাবেই শেষ মুড়ানির অধিকার পায় তারা। এতে দুপক্ষেরই সুবিধা। ফসল তোলার ঢালাও কাজের সময় প্রতিটি কণা প্রতিটি শীষ তোলা সম্ভব নয়। যন্ত্রের কাজে প্রায়ই ‘ফাঁক’ আর ছাড় পড়ে হয়ত। সে সব খুঁটিয়ে তোলার জন্যে যৌথ-খামারীদের লাগালে পড়তায় পোষাত না, আবার ছেড়ে দেওয়াটাও অপচয় হত। সেই জন্যেই ছেলেছোকরাদের হাত আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাহায্যে এই মুড়ানির পথটা কাজে লাগে।

‘চমৎকার আইডিয়া! এটা একটা মস্ত যৌথ কারবার। “কমসোমলস্কায়া প্রাভদা”য় আমি অবশ্যই এ নিয়ে লিখব। ক্ষেতের ফেলানি থেকে কী করে স্টেডিয়ম বা পাইওনিয়র প্রাসাদ কুড়িয়ে তোলা যায়। এ হল আমেরিকান কায়দা কিন্তু কমিউনিস্ট আয়োজন। একটা সুবোৎনিক বা একটা চড়াও রবিবারেই কমসোমলরা তাদের ভবিষ্যৎ স্টেডিয়মের দুই গ্যালারির মতো

ঘাস কেটে তুলেছে। পাইওনিয়ররা তাদের স্কুল খামারের পায়রা আর মুরগীকে নতুন বছর পর্যন্ত খাওয়াবার মতো গ্যারান্টি পেয়ে গেছে। চমৎকার ফিওদর, বেড়ে জিনিস!'

স্তেকোলনিকভের নতুন ফ্ল্যাটের অনতিবৃহৎ খাবারঘরে চায়ের সঙ্গে এই কথাগুলো বলছিল জন টেনর।

'ভারি খুশি হলাম জন। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের উদ্যোগ সম্বন্ধে তোর প্রবন্ধ "কমসোমলস্কায়া প্রাভদা" অবশ্যই ছাপবে। "কমিউনিস্ট আয়োজনে আমেরিকান কায়দাটা" যে তোর নজরে পড়েছে এতে ভারি আনন্দ পেলাম জন। খুবই সঠিক মন্তব্য করেছিস। আমাদের সাংবাদিকদের জন কয়েক যদি এই কমিউনিস্ট আয়োজনে আমেরিকান কায়দায় মন দেয় তাহলে লাখ লাখ রুবল যে ক্ষেতে পড়ে থাকছে এই নিয়ে ভারি চমৎকার একটা বই হয়... তেমন একটা বই হয়ত তোরই লেখা উচিত। আপন দেশের চেয়ে পরদেশের সাফল্য আর অসাফল্যটা সহজে চোখে পড়ে... কিন্তু বল তো জন, তোর আমেরিকান পাঠকদের জন্যে আমাদের বিষয়ে কী লিখবি?'

'সত্যি কথা লিখব।'

'তা জানি, কিন্তু কেমন সত্যি? যন্ত্রায়নের উন্নতি, উঁচু ফলন — এটা সত্যি। কলখোজ আপিসের সামনে ঐ ডোবাটা যেখান থেকে শুয়োরগুলো নড়তে চায় না সেটাও তো সত্যি।'

এই সময় স্তেকোলনিকভের স্ত্রী রান্নাঘরের কাজের কথা বলে মাফ চেয়ে উঠে গেল। বুদ্ধিমান টেনর বুঝল, আসল কথা এইবার শুরু হচ্ছে। নিজেই সে এগিয়ে গিয়ে বললে:

'অবশ্যই বিজাতীয় আমেজের জন্যে আমি ডোবাটার ছবিও নিয়েছি। খড়ে ছাওয়া পুরনো ভাঙা গোয়ালটার ফোটোও তুলেছি, যার ওপর বড়ো বড়ো অক্ষরের একটা মজার কথা লেখা আছে "মাংসে ও দুধে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাব"। এটা কি সত্যি নয়?'

'এটা সত্যি বটে, তবে তলে কিছু লিখে না দিলেও ছবিটা দেখাবে বিদ্রূপের মতো, ডোবার ছবিটাও, যেটা এমন ভাবে তুলেছিস যাতে "২১শ পার্টি কংগ্রেস যৌথখামার" এই সাইনবোর্ড সমেত কলখোজ আপিসের সামনেটা ছবিতে আসে। নিশ্চয় মানবি যে এটা খুব শুভেচ্ছাপ্রণোদিত

ফটোগ্রাফ নয়... বিশেষ করে সাইনবোর্ডটা, শুয়োরগুলো, সব কিছুকে লেন্সের আওতায় নিতে গিয়ে তুই যখন নিজেই প্রায় ডোবায় পড়ছিলি।'

'আমার ওপর তুই নজর রেখেছিস মন্দ নয়, ফিওদর।'

'না জন, তুই আর ত্রফিম যা খুশি করতে পারিস, কোনো বাধা নেই। কিন্তু এটা যদি এমন কি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, অ্যামেচার ফোটোগ্রাফারদের চোখে পড়ে, আবার সে কথা যদি তারা তাদের অল্পবয়সী দলপতির কাছে লাগায়, তবে তাদের প্রতিবাদে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না।'

'তোদের ছেলেমেয়েরা ভারি তুখোড় দেখছি, ফিওদর।'

'তা ঠিক জন। আরো অনেক দিক থেকে ওদের এখনো এগুতে হবে বটে, তবে মাথাটা ওদের ঠিক দিকেই খেলে... ডোবাটা সত্যি ব্যাপার। গন্ডা কয়েক খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া গোয়ালঘরটাও সত্যি। সাতসালা পরিকল্পনার প্রথম বছরে বুড়ো তুদোয়েভ খালি পায়ে কাস্তে হাতে ঘাস কাটছে, এটাও সত্যি, যদিও ব্যাপারটা তোর মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে গোয়ালটার আয়ু আর মাসখানেক সেটাকে মেরামত করা বেকুবি, কেননা ওর ওপর দিয়ে যাবে রেল লাইন আর এই শরতেই গরুগুলো লেনিনি চড়াইয়ের নতুন গোয়ালে উঠে যাবে... এটাও তো সত্যি... আর ডোবাটা এখন তার সম্পত্তি নয়, রেলওয়ের সম্পত্তি এই ভেবে যদি হিসেবী বাখরুশিন ওটাকে না ভরায়, তবে সেটাও সত্যি যদিও আমি এটা অনুমোদন করি না। পাহাড়ের ওপর কলের জল, ড্রেন, আধা-অটোমেটিক ক্লিনার আর স্নানের ঘর সমেত নতুন শুয়োর খাটালটাও সত্যি। এই সব সত্যির দিকে তোর ক্যামেরার লেন্স ফেরাস না কেন? কেন বল তো?'

জন চোখ নামিয়ে ছোটো ছোটো আঙুলে টেবল বাজিয়ে বললে:

'কী জানিস ফিওদর, আমি হলাম এক বখাটে, সেয়ানা। এই কনট্রাস্টগুলো আমার কাছে খুব মজার লেগেছে। ভয় ছিল পাছে ডোবাটা শুকিয়ে যায়, গোয়ালটা ভেঙে পড়ে। তাহলে এমন কতকগুলো ছবি আমি হারাতাম যাতে পাঠকের নজর টানত আমার বইটা... হ্যাঁ রে ভাই, হ্যাঁ... তুই জানিস না আমেরিকান পাঠকের জন্যে বই তৈরি করতে হয় কেমন করে... প্রথমে যদি আমি ভেঙে পড়ো পড়ো গোয়ালঘর দেখাই, তারপর দেখাই গরু যারা আমেরিকার শুধু নয়, দিনেমার গরুগুলোকেও হার মানিয়েছে, তারপর

নতুন গোয়ালঘরের বৈপরীত্য, তবে সেটা হবে একটা মার্কিনী ধাঁচের আকর্ষণ। ডোবাটার ব্যাপারেও তাই। বলব এই ডোবাটায় ১৯৫৯ সালে স্নান করত পুরনো বাখরুশির শুয়োর। আর ১৯৬৩ সালে এখান দিয়ে যাবে রেলপথ, সাতসালা পরিকল্পনার নানা বিদ্যুৎ-রেলপথের একটা ... তারপর অন্য পাতায় ... হ্যাঁ, হ্যাঁ ফিওদর, আমার বইয়ের পাতাগুলো আমি ছাপা দেখছি। পরের পাতায় মস্ত এক শুয়োর-শালার ছবি ... আমি মার্কিন সাংবাদিক ফিওদর ... নিজের কাজটা আমি ভালোই জানি। যে বই কখনো ছাপাখানায় মুখ দেখবে না সে বই আমি লিখতে পারি না। মার্কিনী পাঠক চমক ভালোবাসে। আর আমি যদি প্রথমটায় এমন সসেজ বিক্রি করতে শুরু করি যাতে মাংসের বদলে জ্যাম কি আইসক্রীমের পুর দেওয়া, তাহলে তুই আশ্বস্ত থাক, সে রকম সসেজ লোকে গোগ্রাসে গিলবে এবং তারপর বুঝবে যে ভেড়ার নাড়ীর খোলে আইসক্রীমের পুর দেওয়াটা বোকামি ... কিন্তু ইতিমধ্যে আমার উদ্ভাবন থেকে আমার পুঁজি হয়ে যাবে ... রাগ করিস না ফিওদর, আমি যে আমেরিকান, অন্য কিছু যে হতে পারি না ... আর যদি আমি ... না, না, সে আমি করব না ... কিন্তু যদি আমার বইয়ের প্রচ্ছদে "আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাব" এই ধ্বনি সমেত ভেঙে পড়া গোয়ালঘরটার ছবি ছাপিয়ে দিই, তবে দুই মিলিয়ন ডলার তোলার জন্যে আমার বইটায় এক মিলিয়ন ডলার লগ্নি করতে কোম্পানি একটুও ভয় পাবে না। বিক্রির পক্ষে তেমন প্রচ্ছদ একটা চমৎকার খোল, হ্যাঁ রে হ্যাঁ ফিওদর ... ভেতরে কী পুর দিলাম তাতে কোম্পানির এতটুকু আগ্রহ নেই, তার কাছে জরুরী হল কত বেশি বিক্রি হচ্ছে।'

স্তেকোলনিকভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের গেলাসটা নিঃশেষ করল। বললে:

'হয়ত হবে জন, কিন্তু যাই বল্, কেমন-কেমন যেন শোনাচ্ছে।'

জন কৈফিয়ত দিল:

'আমেরিকার ইতিহাস তো আমি গড়িনি ফিওদর, আমার বিশ্বাস আব্রাহাম লিংকনও তা গড়েনি, যদিও শুরু করেছিল ... রক্-ন্-রোল বা হুলা-হুপের দোলটা আমি বার করিনি। খুনটাকে সিনেমার মূলমন্ত্র — সেও আমি করে তুলিনি। যে সোনার চাবিটা ছাড়া সবচেয়ে শস্তার বরবটীর টিনটাও খোলা যায় না, সেটাও আমার তৈরি নয়। কিন্তু ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচের শ্বাপদ

সত্যিটাকে আমায় ফের পুনরাবৃত্তি করতে হবে: "বাঁচতে তো হবে"। তাই বাঁচছি, নিজের বিবেকের সঙ্গে আপোস করে বেঁচে চলছি।'

মনে হল জন সত্যি কথাই বলছে। ওর ফুর্তিবাজ সবুজ চোখ সহসা বিষণ্ণ হয়ে উঠল, নিতান্ত সাদাসিধে ভাবেই সে বললে:

'আমার মস্ত সংসার, আর সাজ পোষাকের লোভ বেটসির এখনো যায়নি। ও বোঝে না যে হাডসন নদীর পারে আমাদের সুন্দর বাড়িটার পুরো দাম এখনো চুকানো হয়নি। টেনররা তাদের মোজা রিপু করে কী ভাবে সেটা তোর জেনে লাভ কি। একটা কমিউনিস্ট বই লিখব, এ প্রতিশ্রুতি আমি তোকে অবশ্যই দেব না ফিওদর। না, না। সে প্রতিশ্রুতি দেব না, সে রকম বই লিখবও না। কিন্তু ভেতরে ভালো পুর দেওয়া সসেজ অবিশ্যি আমি করব।'

২৭

পরের দিন বাখরুশিনের সঙ্গে ক্ষেতে টহল দেবার সময় টেনরকে নিয়ে আলাপ তুলল ফিওদর পেত্রভিচ স্তেকোলনিকভ।

বাখরুশিন জিজ্ঞাসা করল, 'ওর সঙ্গে তো অনেকবার দেখা হল তোর, কী মনে হয় ওকে?'

'ওর পাগলামি টাগলামি সব সমেত ওকে ভালোই মনে হয়,' উত্তর দিল স্তেকোলনিকভ। 'অবিশ্যি কিছু বলা যায় না, কিন্তু চরম খারাপ কিছু ও করবে না। ও আমার কাছে প্রমাণ করতে চায় যে আমেরিকান প্রেস অন্য সবরকম প্রেস থেকে একেবারে আলাদা। প্রেস মালিকেরা যেন তাদের ছাপা জিনিসটা শুধু একটা মাল হিসাবে মনে করে, যা থেকে লাভ উঠবে, তার বিষয়বস্তুর বক্তব্য কী, তা নিয়ে যেন ওদের ভাবনা নেই। তাই জন টেনর যেন তার খুসি মতো যা ইচ্ছে লিখতে পারে।'

'তুই তাতে কী বললি?'

'বোঝা যায় যে একথা বিশ্বাস করা টেনরের পক্ষে কঠিন যে সে ডলারের এবং সেই কারণে তার মেহনতের দাম দেয় যারা তাদের ক্রীতদাস না হলেও সেবক... সিধে কথা বলতে কেমন অস্বস্তি লাগে...'

অবাক হয়ে স্তেকোলনিকভের দিকে চাইল বাখরুশিন।

'যা সত্যি তা বলতে তোর অস্বস্তি লাগবে কেন? এলবা তীরে তোরা তো দোস্তি পাতিয়েছিলি!'

'লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করছি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, মায়া হয় ওর জন্যে। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত টেনর নিজেই টের পাবে, নিজের যুক্তির অসারতা বুঝবে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সহাবস্থানের মানে যে মিলন নয়, কিংবা ওর কথায়, "এই দুই প্রেরণার পরিব্যাপন" নয় এটা বোঝা ওর পক্ষে কঠিন। ও চায় পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের মিশেল দিয়ে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়া। ও জানে না যে এই সাবেকী আইডিয়াগুলো মোটেই ওর নিজের আবিষ্কার কিছু নয়, যে তাত্ত্বিকদের আবিষ্কার তারা তাদের পার্টি সমেত বহুকাল দেউলিয়া হয়ে গেছে। কিন্তু কী করে বলি যে বিশ শতকের শেষার্ধে ও সাইকেল আবিষ্কার করছে?'

বাখরুশিন মানল না:

'ওদের রুশ ভাষায় ছাপা "আমেরিকা" পত্রিকাটা যদি আমাদের এখানে অবাধে পুঁজিবাদী মার্কিনী ধাঁচের জীবনের প্রচার করতে পারে, সে জীবন যদি তারা সকোলনিকি পার্কের প্রদর্শনী আকারে এখানে আমদানি করতেও পারে, তাহলে সমানভাবে আমরাই বা কেন আমাদের ধাঁচের জীবনের কথা বলতে পারব না? টেনরকে সোজাসুজি বলা দরকার...'

কথা শেষ না করে থেমে গেল বাখরুশিন।

চোখে পড়ল পালকের মুকুট পরা দুটি ছেলের সঙ্গে টেনর ওট ক্ষেত থেকে বেরুচ্ছে। একটা দৃশ্য তোলা হচ্ছিল, উদ্দেশ্য এইটে দেখানো যে ছেলেরা সর্বত্রই ছেলে, মার্কিন ছেলেদের মতো সোভিয়েত ছেলেরাও রেড ইণ্ডিয়ান খেলা করে।

'টেনরকে কী বলা দরকার সোজাসুজি? আমি কান পেতে আছি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ,' বললে টেনর।

বাখরুশিন উত্তর দিল:

'গাড়িটায় চেপে বসুন মিঃ টেনর, আপনার রেড ইণ্ডিয়ান ছবিটা যদি তোলা হয়ে থাকে তবে চলুন যাই আগফলনী বাঁধাকপিগুলো দেখে আসি। ফিওদর পেত্রভিচকে কী বলার পরামর্শ দিচ্ছিলাম, সেটাও বলা যাবে।'

টেনর ছেলেদুটোর কাছ থেকে বিদায় নিল। আসল রেড ইন্ডিয়ানদের যে দেখেছে এমন একজন খাঁটি আমেরিকান মিঃ টেনরের তৈরি করা পালকের রেড ইন্ডিয়ানী মুকুটগুলো তারা খসালে না, স্যালুট জানিয়ে তারা কী একটা শব্দ করলে যেটা সম্ভবত খাঁটি রেড ইন্ডিয়ান শব্দই হবে এবং হামা দিয়ে ফের ঢুকল ওট ক্ষেতে।

'ফের অনুচিত কিছু একটা করেছি কি?' জিজ্ঞেস করল টেনর, 'কোন কথাটা সোজাসুজি বলা দরকার আমায়?'

'বিশেষ কিছু নয় জন,' উত্তর দিল স্তেকোলনিকভ, 'আমরা তোর পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পরিব্যাপন তত্ত্ব আলোচনা করছিলাম।'

'এই দিয়ে আমি সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করব। সত্যি বলছি, দেখতেই পাচ্ছেন আমি এটায় সিরিয়স। দেখতে পাচ্ছেন, মুখে কোনো হাসি নেই আমার। আমিও সিরিয়স লোক হতে পারি। তার কারণ আমি চাই, যে লোকদের আমি ভালোবাসি তারা সুখী হোক। আমাদের দেশের লোক, আপনাদের দেশের লোক। পরিব্যাপন তত্ত্বে দুনিয়া পাবে সুখের সোনার চাবি। আমাদের পরিব্যাপ্ত হতেই হবে। এটা অবধার্য।'

টেনরের কথা শেষ হলে ফিওদর পেত্রভিচ বাখরুশিনকে বললে:

'এবার পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, সোজাসুজি যেটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা বলে ফেলা হোক।'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ গাড়ির ভেতর থেকে এগিয়ে গিয়ে কোচ বক্সে বসল, লাগাম তুলে ধরল। কদমে ছুটল জিমোলস্ত, পেছনে পেছনে তার যে বাচ্চাটা ছুটে আসছিল তাকে ডাকল হ্রেষা তুলে। ছেদ পড়ল কথাবার্তায়।

সত্যি কী করে চালানো যায় কথা? না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, না — এতো নিতান্ত ফাঁকা, প্রমাণহীন বাচালতা। প্রমাণ নইলে হ্যাঁ, না, দুই-ই সমান। আর আলোচ্য প্রসঙ্গের তুলনায় টেনরের রাজনৈতিক জ্ঞান যদি ভয়ানক কম হয়, তবে কী প্রমাণ দেবে বাখরুশিন? সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক পাঁচটা লেনিনীয় বিভাগের কথা ও জানে না। "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" এঙ্গেলসের এ বইটার কথাও ও শোনেনি।

টেনরের সঙ্গে ত্রফিমের কোনো তুলনাই চলতে পারে না, তবু দুজনের

মধ্যে কেমন একটা দূরাগত মিল আছে। বুর্জোয়া অর্থে টেনর শিক্ষিত, কিন্তু সমাজ বিকাশের নিয়মগুলো সম্পর্কে ঝাপসা একটা ধারণাও তার নেই।

আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নেই, তেমন লোকের সঙ্গে রকেট টেকনিক নিয়ে আলোচনা করা যায় কী করে?

আগফলনী এ বাঁধাকপির শহরে চালানের ব্যাপারটা এত খারাপ হয়েছিল যে জেলা কমিটির আপিসে টেলিফোন পর্যন্ত গিয়েছিল স্তেকোলনিকভের কাছে। ক্ষেতে পৌঁছে বাখরুশিন টেনরের দিকে চেয়ে বলল:

'বাঁধাকপির এই গুটিগুলো চোখে দেখায় বড়ো, চলনসই বলে মনে হয়, কিন্তু হাতে নিলে দেখা যায় হালকা, ফাঁপা, অপরিণত। কেবলই দেখনসই। ধরুন এইটে। মস্ত বড়ো মাথা, কিন্তু ভেতরটা মোটেই ঠাসা নয় ...'

ইঙ্গিতটা বুঝে টেনর নিজের মাথায় হাত বুলোতে লাগল ঠিক যেভাবে বাখরুশিন হাত বুলোচ্ছিল বাঁধাকপিতে।

টেনর বললে, 'আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, যে টুপিটা আমি পরি তার আয়তন ধরলে মাথাটা আমার বড়োই, কিন্তু ভেতরটা ঠাসা নয়। দুনিয়ায় নানা ধরনের কপি হয়। সব ধরনেরই নিজস্ব এক একটা উপযোগিতা আছে। যেমন এইটে, অন্য কপির চেয়ে মা আমার এইটেই পছন্দ করত বেশি। ওর ভেতরের ফাঁপাটায় অনায়াসে মাংসের কিমা পুরে সেদ্ধ করা যায়। চমৎকার ডিশ হয় তাতে... মোটের ওপর ভরাট করার পক্ষে ফাঁকা বাঁধাকপি অতি উপাদেয়। সুতরাং সানন্দে আপনার কথা শুনতে রাজী মিঃ বাখরুশিন।'

বাখরুশিন লাল হয়ে উঠল।

'রাগ করবেন না মিঃ টেনর, সত্যিই আপনাকে আমার ভারি ভালো লাগে, তাই দুঃখু এই যে যেমন করেই বসি না কেন, ঐকতান জমছে না... প্রত্যেকেরই যেন আলাদা আলাদা স্বরলিপি।'

'এই তো সব পরিষ্কার,' বাধা দিল স্তেকোলনিকভ, 'বাঁধাকপির মাথার সঙ্গে স্বরলিপি মেশালে তা থেকে ভালো সঙ্গীত মিলবে এমন আশা করার নেই... তার চেয়ে বলি কি জন, রুপোলী শেয়ালের খামার দেখতে যাবি?'

'ধন্যবাদ। ব্যঙ্গার্থে এবং বাচ্যার্থে কোনো অর্থেই শেয়াল আমার পছন্দ নয়।'

'জন! বলতে চাস কি আমি... ভারি অন্যায়।'

জন হো হো করে হেসে উঠল। স্তেকোলনিকভের হাত ধরে বললে:

'কিন্তু আমার মাথাটাও নেহাৎ বাঁধাকপির গন্টি হতে চায় না, বিশেষ করে এ মাথার যখন ধারণা যে সেটা মহা মহা আইডিয়ার একটা ফ্যাকটরি বিশেষ।'

ঝগড়া মিটে গেল। আলাপ চলল ব্যাঙের ছাতা তোলা নিয়ে, টেনরের সেই টেলিভিজন ফিল্ম নিয়ে, যেটার নাম সে দেবে, "ছেলেরা ছেলেই"। কিন্তু "ভালো সঙ্গীত" তব্ও জমল না।

'না, পরিব্যাপ্ত হচ্ছি না আমরা!' অভ্যাগত ভবনের কাছে বিদায় জানিয়ে বললে টেনর।

'ঝগড়াও তো করছি না,' উত্তর দিল স্তেকোলনিকভ।

'পেলাগেয়া কুজমিনিচনা যেন কপিটায় কিমার প্র দেয়। ওকে শিখিয়ে দেবেন। কপিটা ছিঁড়েছি, নষ্ট করে কী লাভ। আজ আপনার এখানে অতিথি হব, এবং এই প্রসঙ্গ নিয়ে পরিব্যাপ্ত হওয়া যাবে।' বাঁধাকপিটা টেনরকে দিয়ে হাত দোলালে বাখর্শিন তারপর স্তেকোলনিকভকে নিয়ে গাড়ি হাঁকাল খামার আপিসের দিকে।

২৮

পেলাগেয়া তুদোয়েভাকে বলছিল ত্রফিম, 'তোদের এখানকার লোকেরা যদি একবার অন্তত আধখানা চোখেও দেখত আমেরিকান ধনদৌলতটা কত পাকা, তাহলে আমায় আর এমন করে বাখানি গাইতে হত না। মস্কোয় আমেরিকান প্রদর্শনীটা লোকে একবার দেখ্ক, তখন ব্ঝবে কত ধানে কত চাল।'

ত্রফিম তার তিতিক্ষ্ শ্রোতাটিকে অনেকক্ষণ ধরে সবিস্তারে বোঝাল প্রতিযোগিতা জিনিসটা কী, যা নইলে দ্নিয়াই চলতে পারে না।

'বেশ, নয় জমিটা সমাজেরই হল, যন্ত্রপাতি গর্ ভেড়ার মালিক হল সর্বসাধারণ, কিন্তু কলখোজের সঙ্গে কলখোজের যদি প্রতিযোগিতা না থাকে, তাহলে ধনবৃদ্ধি হবে কী করে?

তুদোয়েভা শ্নতে শ্নতে মোজা ব্নে যাচ্ছিল আর খালি পায়ে গেঞ্জি

গায়ে ব্রফিম অভ্যাগত ভবনের অলিন্দে বসে তুদোয়েভার চেয়ে বরং নিজের কাছেই প্রমাণ করে যাচ্ছিল যে বাজারের লড়াই থেকেই ধনবৃদ্ধি। তার দাবি, একজন অন্যকে দামে মেরে বেরিয়ে যায় শুধু এই জন্যেই যাতে যার জিত হল তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে যার হার হল এবং গাজর থেকে মোটর গাড়ি পর্যন্ত সমস্ত মালেরই শস্তা উৎপাদনের উপায় মেলে।

এব্যাপারে ব্রফিম এতই নিশ্চিত যে তার ভাই, স্মেতানিন, এমনকি সবার চেয়ে যার দূরদৃষ্টি সেই পার্টি সেক্রেটারি দুদোরভ পর্যন্ত কেউই তার মত মানছে না দেখে সত্যিই দুঃখ হচ্ছিল তার।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা — সেটা ব্রফিমের কাছে মনে হল ধর্মের মতো; আত্মার জন্যে, নিজ অনুভূতির জন্যে ভালোই, কিন্তু কারবারের পক্ষে ভালো নয়। তার কাছে এটা একেবারেই দুর্বোধ্য মনে হল: কলখোজী অর্থনীতিটা টিকে থাকছে কী করে, কিসে তা চলছে? নিশ্চয় সচেতনতার জোরে নয়, যা নিয়ে কিরিল তুদোয়েভ আর পিওতর অত কথা বলে।

সচেতনতার জন্যে মানুষ বিবেক মেনে মেহনত করবে, সমৃদ্ধির চেষ্টা করবে তা কী করে হয়? হয়ত বা এরা মর্ত্যে নন্দন-কানন বানাবার মতো একটা নতুন ধর্মবিশ্বাস আবিষ্কার করেছে? সে স্বর্গের নাম হয়ত বা কমিউনিজম, এবং বীরোচিত সব কীর্তি এরা ঘটাচ্ছে তার ডাকেই?.. রীতিমতো অভিজ্ঞ বাইবেল পড়ুয়ার মতো দুদোরভ যে অত শাস্ত্রকথা জানে, সেটা হয়ত অকারণে নয়, হয়ত এরা নিজেদের মতো করে শাস্ত্রকথা সব ঝাড়াই বাছাই করে তার সেরা সত্যগুলো বার করে এনেছে।

তার নিজের কারবার চালানোর পদ্ধতিতে সন্দিহান হয়ে এবং সেই সঙ্গে নিজের সন্দেহে ভয় পেয়ে ব্রফিমের মাথার মধ্যে ভাবনা ফুটতে লাগল ফুটন্ত কেটলির মতো। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে, এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়েও সে বুঝি বা শুধু সোনার হরিণেরই আরাধনা করেছে, ভেবেছে সেইটাই বুঝি জীবনের সর্বশক্তিমান চালক, মনুষ্য জাতির প্রভু।

পাইপে তামাক ভরে ব্রফিম ভাবতে চেষ্টা করল, তাকে এবং তার ফার্মে যারা থাকে, কাজ করে, তাদের চালায় কিসে। প্রথমে সে তার উত্তর পেল: জীবন। "কিন্তু জীবন মানে কী" নিজেকে প্রশ্ন করল সে। কুকুর বেড়ালেও তো বাঁচে। জীবন তো হরেকরকম। ওর নিজের আছে ছয় কামরাওয়ালা মস্ত

বাড়ি। পুরোপুরি সচ্ছল সাজানো গুছানো বাড়ি। ওর বাঁধা মজুরদের জীবন ওর চেয়ে খারাপ। কয়েকজনের তো বেদম খারাপ। আর মরসুমী মজুরেরা তো চালায় শোয়, সম্পত্তি যা কিছু তা সব নিজেদের সঙ্গেই। এটাকে ন্যায্য বলেই তো ধরা হয়। স্বর্গ দেবের নিয়ম অনুসারে ন্যায্য, যে দেবের পুজো চলে তার দেশে। কিন্তু শাস্ত্র বাক্য দিয়ে বিচার করলে?

তার দেশের আইনের সঙ্গে শাস্ত্রকথার মিল নেই। আর এদের এখানে, কলখোজে?

এখানেও অমিল আছে তবে অনেক কম। আর এ অমিলটা তারা সর্বশক্তিতে নিশ্চিহ্ন করতে তৎপর। সত্যি কথা বলতে গেলে বাখরুশিতে আগে যা ছিল বলে ওর মনে আছে তেমন কোনো বৈষম্য নেই লোকেদের জীবনে।

তার মানে ওর চেয়ে, ঈশ্বর বিশ্বাসীর চেয়ে এই নিরীশ্বররা আসলে ঈশ্বরের অনেক সন্নিকট।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী সে, কিন্তু তাকে কি মেনে চলে?

পাইপ ঠুকে ত্রফিম তার ভাবনা চালিয়ে গেল।

আর সে ভাবনায় দাঁড়াল এই যে ফার্মার ত্রফিম বাখরুশিন আরাধানা করে অন্য ঈশ্বরের, মেনে চলে অন্য কী যেন উটকো নীতি... আর সে ঈশ্বরের আদেশ নিজের ভাইয়েদের পীড়ন করতে হবে। এমন কি ধর্মভাইদেরও। তারই মতো মলোকানদের। সে ঈশ্বর চায় মানুষ তার প্রতিবেশীদের সর্বনাশ করুক, তাদের অমঙ্গল কামনা করুক, নিরীশ্বর এই দুদোরভ, স্মৈতানিন, পিওতর, কিরিল তুদোয়েভ, তরুণ পশুবিশেষজ্ঞ ভলোদিয়া প্রভৃতি যত লোককে ত্রফিম চেনে, মোটেই তাদের মতো নয়।

'অমন চুপ করে আছিস কেন বোন পেলাগেয়া? ভাইটিকে তোর ধমক দিচ্ছিস না কেন, তার মনটা শান্ত করার মতো দুটো কথা অন্তত বল,' হঠাৎ মোহান্তের কাছে চেলার আর্জির মতো করে পেলাগেয়াকে বললে ত্রফিম।

পেলাগেয়ার কান খুব সজাগ, তার কথার সূক্ষ্মতম ছায়াপাতটাও ও টের পেত। ত্রফিমের এই দোদুল্যমানতার মধ্যেও আত্মম্ভরী ভাবটা তার নজর এড়ায়নি।

জবাবে সে বললে:

'তোকে আমি কী বলব বল ভাই। সত্যি কথা বলব? তোর মনে ঘা লাগবে। হাজার হোক, তুই তো অতিথি। মিথ্যে করে সান্ত্বনা দেব? তাতে আমার নিজের কাছেই লজ্জা হবে। একটি কথাই বলি: মিছেই তুই এলি এখানে।'

'মিছে কেমন?'

'কথাটা এই। নিজের মতোই থাকতিস সেখানে, নিজের মলোকান ধর্মবিশ্বাস নিয়ে পরপারে যাত্রা করতিস... দুনিয়ার ভাবনা ফুরুত... তোরও মঙ্গল হত, আমাদেরও দুর্ভাবনা থাকত না। কিন্তু এখন হলটা কী?'

'কী হল?'

'হল এই যে তুই আমাদের মাঝখানে চলছিস যেন উট এসেছে থিয়েটারে... এটা ওটা বুঝতে চাস, কিন্তু বোঝার সাধ্যি থাকলে তো?'

'সাধ্যি নেই?'

'নেই ত্রফিম। দেরি হয়ে গেছে তোর। মাথার ঘিলু তোর শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে... আমাদের কাছে তুই পর, আমরাও তোর কাছে স্বজন নই। দারিয়ার সঙ্গে তোর যে এখনো দেখা হয়নি, সেই তোর মঙ্গল...'

'দেখা হলে কী হত?'

'যা বলার দরকার সেই তোকে বলত...'

'আমি ওর কাছে আমার সারা জীবন, সারাটা অন্তঃকরণ মেলে ধরতাম, কী অনলে আমি পুড়ছি তা বুঝত সে... বুঝত, ক্ষমা করত আমায়, এর জন্যেই তো আমার এখানে আসা।'

হাতে ভর দিয়ে মাথা নোয়ালে ত্রফিম। চুপ করে রইল। তারপর সিঁড়ির কাছে নাক ঝেড়ে জুতো পরতে লাগল। জুতো পরে তুদোয়েভার কাছে এসে বলল:

'যদি চাস তো বাজনাদার ঘড়িটা তোর কিরিলের জন্যে দিয়ে দিই। বাইশ জুয়েলের ঘড়ি। একবারও মেরামত করতে হয়নি। এটা নে, আর বল, নাতিপুতি নিয়ে কোথায় লুকিয়েছে দারিয়া?'

পেলাগেয়া কুজর্মিনিচনা ইতিমধ্যে ত্রফিমের জন্যে তার হাতে বোনা দ্বিতীয় মোজাটিও প্রায় শেষ করে এনেছিল;তার একটা ঘর এবার পড়ে গেল। এটা তার কখনো হয়নি। এমন কথা তাকে শুনতে হবে এটা বুড়ি কখনো

আশা করেনি। জিভ আড়ষ্ট হয়ে এল তার। বহু কষ্টে ত্রফিমের উত্তর দেবার জন্যে তৈরি হতে পারল সে। কিন্তু যখন তৈরি হল তখন আর উত্তর দেবার ইচ্ছে হল না তার। নীরবে অসমাপ্ত মোজাটা থেকে কাঁটা খসিয়ে সবটা খুলে ফেলে গুলি পাকাতে লাগল সে।

যা বোঝবার বুঝুক।

২৯

যত বেশি লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল ত্রফিমের, ততই তার নিঃসঙ্গ-বোধ ও নিজের কাছেই পরাজয়ের ভাবটা বেড়ে উঠল। লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে ঘুরে কালক্ষেপ করত সে। চেনা মাঠগুলোয় ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন দেখা পেল শুয়োরপালক পান্তেলেই দরোখভের।

ছেলেবেলা থেকেই এ লোকটিকে সে চিনত। পান্তেলেইয়ের বাপ কাজ করত দিয়াগিলেভের বাড়িতে। পান্তেলেইও ত্রফিমকে চিনত। কিন্তু ওদের কেউই এমন ভাব দেখাল না যে পরস্পরকে ওরা চিনতে পেরেছে।

ছোটো থেকেই শুয়োরপালনের কাজ নিয়েছিল পান্তেলেই, এখন প্রবীণ বয়সে সে নিজেকে মনে করে শূকর প্রজনন ও পরিপুষ্টির ব্যাপারে সে একজন অভিজ্ঞ এবং মস্ত নবোদ্ভাবক।

শুয়োরপালনের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের আটকে রাখার প্রথায় তার বিশ্বাস ছিল না। একটা মস্তো ঘাস-জমিতে সে বেড়া দিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে বাচ্চা শুয়োরদের তাতে ছেড়ে রেখে দিত পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় এবং যার যা বয়স সেই অনুসারে।

বিরাট এই সবুজ মাঠটায় চরে বেড়াত প্রায় হাজার খানেক শুয়োর। এই প্রকাণ্ড পশুপালটার দেখাশোনা করত শুধু সে আর তার ছেলে। এ ছেলেটি দারিয়ার নাতনি কাতিয়ার সঙ্গে একত্রে পশুবিদ হবার তালিম নিচ্ছে।

দুটি লোকের জিম্মায় হাজারটা শুয়োর — নিজের ফার্মে মজুরদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় নিংড়ে নেবার ব্যাপারে অভ্যস্ত ত্রফিমের কাছেও এটা অচিন্তনীয় ঠেকেছিল। তাই সে নিজেই দেখবে ঠিক করে।

পান্তেলেই ত্রফিমকে গ্রহণ করল খুব বন্ধুচিত ভাবে নয়। সাগরপারের এই অতিথিটির আগমনকে সে দেখেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগমন

হিসাবে, যারা ত্রফিমের মারফত সবচেয়ে শস্তায় শুয়োর পালনের পদ্ধতি জেনে নিয়ে পান্তেলেইয়ের উদ্ভাবনশক্তির ঘাড় ভেঙে নিজ সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্যে উৎসুক। কিন্তু ত্রফিম ওকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'শুয়োরগুলোকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে তাদের মাংস হ্রাসের এ চমৎকার বুদ্ধিটি কার মাথায় খেলল?'

পান্তেলেই দাবি করল:

'মাংস হ্রাস মানে কী বলতে চাও?'

ত্রফিম ধীরেসুস্থে সবিস্তারে বোঝালে, যে-শুয়োর ছোটাছুটি করে সে হল তলাভাঙা বালতির মতো: যতই খাক না কেন শরীরে কিছু থাকে না।

সবচেয়ে জ্বালার জায়গাটায় ঘা খেয়ে পান্তেলেই তার তারপুলিন কোর্তা খুলে ফেলে আস্তিন গুটাল যেন মারতে যায় আর কি; তারপর প্রতিপক্ষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মুখ খারাপ করে বললে:

'রাখালকে নেকড়ে উপদেশ দিয়েছিল কী করে ভেড়া পালতে হয়, রাখাল কিন্তু নেকড়ের ছালটাই ছাড়িয়ে নেয়।' তারপর ত্রফিমের একেবারে মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'শুয়োর জিনিসটা কী?' এবং নিজেই উত্তর দিলে, 'শুয়োর হল স্তন্যপায়ী জীব, যারা খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে চায়, রোদ ভালোবাসে। খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস আর অতিবেগুনি কিরণ শুয়োরের প্রয়োজন কেন? স্তন্যপায়ী জীবের তা প্রয়োজন জীবসত্তার সঠিক বাড় ও রোগ নিবারণের জন্যে। বাচ্চা শুয়োরের অবাধ ছুটোছুটি দরকার যাতে তার সমস্ত অঙ্গ ও কঙ্কাল সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে।'

'বাপু হে, তা হয়ত খুবই ঠিক, কিন্তু শুয়োরের কাছ থেকে আমরা কঙ্কাল চাই না, চাই মাংস।'

এতে ফের আর একবার মুখ খারাপ করে পান্তেলেই শুয়োরের অস্থি সংস্থান ও পেশীর স্বাভাবিক গঠন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করল:

'যেমন তুই হলি একটা মাংসল ভোজনপুষ্ট টাইপ। আমাদের জাত শুয়োরটার চেয়ে ওজন তোর কম হবে বলে মনে হয় না। সেটা হল কেমন করে? কারণ তোর হাড় শক্ত, তাতে মাংস ধরতে পারে অনেক। শুয়োরের বেলাতেও তাই। শুয়োরের যতদিন না বয়স হচ্ছে, ততদিন ওদের হাড় আর পেশীর ব্যবস্থা করতে হবে। চারার যেমন চাই ডাঁটি আর পাতা। সেটা যখন

হয়ে যাবে, তখন মাস দুয়েকের জন্যে ঘর বন্দী করে রাখ, এমন মাংস দেখিয়ে দেবে যে তোর বিদেশী শুয়োর সব তার কাছে মনে হবে পালক, আর ওগুলো এক একটা যেন পাহাড়। চল দেখিয়ে দিই...'

পান্তেলেই ত্রফিমকে নিয়ে গেল শুয়োর গোয়ালে, যেখানে কমবয়সী শুয়োরদের রাখা হয়েছে তত্ত্বাবধানের সমস্ত নিয়ম মেনে।

'এগুলো হল পরখ করার জন্যে, তার মানে, বৈজ্ঞানিক যাচাই। একই মায়ের বাচ্চাগুলোর কিছুটা আমি ছেড়ে রেখে কয়েকটাকে আটকে রেখে পালন করছি। আটক শুয়োরগুলোকে আমি যত পারে খেতে দিই। ছাড়া শুয়োরগুলোকে প্রধানত খাওয়াই ঘাস আর শস্তা জাতের খাবার। এবার ওগুলোর সঙ্গে এগুলোকে মিলিয়ে দেখ। এগুলো মুটকী, কিন্তু ছোটোখাটো, পাদ্রীর মেয়ের মতো। বাড় বেশি নেই। কিন্তু ওই দোহারা দৌড়বাজগুলো ...' মাঠের মধ্যে শক্তসমর্থ ছুটন্ত বাচ্চাগুলোর দিকে দেখিয়ে বললে পান্তেলেই, 'ওজনের দিক দিয়ে ওই দোহারাগুলো এখনই এদের এই জ্ঞাতিদের চেয়ে বেশি।'

পান্তেলেইয়ের কথায় সায় না দেওয়া কঠিন। কিছু একটা সত্যি ছিল ওর বক্তব্যে। ত্রফিমের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগল এইটে যে মাঠে ছাড়া শুয়োরগুলোর জন্য যত্ন আত্তি প্রায় কিছুই লাগে না। আর মাঠের মধ্যে দিয়ে যদি একটা কনভেয়র বেল্ট চালিয়ে দেওয়া যায় যার এক মুখে থাকবে খাদ্য ব্যবস্থা, অন্য মুখে ধোয়া পাকলার বন্দোবস্ত, তাহলে হাজারটা শুয়োর বাচ্চার দেখাশোনা একজনেই করতে পারে। কিন্তু চারণ ক্ষেত্রটার জন্যে কী প্রকাণ্ড জমিই না দরকার। যে জমিতে কয়েক হাজার শুয়োরের খাদ্য উৎপন্ন করা যায় তাকে এভাবে ব্যবহার করায় লাভ হয় কি?

পান্তেলেই যেন ত্রফিমের ভাবনাটা আঁচ করেই তার অভিপ্রেত প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দিলে:

'হিসেব করতে হবে না মিঃ ফার্মার, আঁক কষতে হবে না। সবই হিসেব করা। শরতে তার সংখ্যা তথ্য, নতুন বছরে যোগফল। যে সন্ধানে থাকে, সে পাবেই পাবে।'

'আলাপটার জন্যে ধন্যবাদ,' ত্রফিম তার হালকা, পাতলা মার্কিন স্ট্রয়ের টুপিটা তুলে চলে গেল।

৩০

শুয়োর চরাবার মাঠটার ধার ঘেঁসা বার্চবনের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে যেতে যেতে ত্রফিম ভাবছিল পান্তেলেই দরোখভের কথা, বাপ যার মজুরি করত তার দাদু ত্রফিম দিয়াগিলেভের বাড়িতে। মনে পড়ল বাইশ বছরের গালিয়ার কথা, এক নম্বর প্লটে হটহাউসগুলোর দেখাশোনা করে সে। এদের দুজনের মধ্যেই কেমন একটা মিল আছে। গালিয়া তাকে দেখিয়েছিল দীর্ঘ অনুচ্চ হটহাউসগুলোর সারি, আসলে মানুষের মাথা পর্যন্ত উঁচু এক ধরনের কাচঘর, পচন্ত সারের গরমে তপ্ত। সেণ্ট্রাল হিটিংয়ের শীতকালীন হটহাউসে তৈরি চারাগুলো এখানে রোপণ করা হবে। খুব একটা মস্তো আবিষ্কার নয়, কিন্তু আয় হবে লাখ টাকা।

পান্তেলেইয়ের মতো গালিয়াও তন্ময় হয়ে বুঝিয়েছিল এধরনের তাপঘরে কিরকম লাভ, হিসেবপত্তরও শুনিয়েছিল। দেখা গেল, এই ধরনের তাপঘর তৈরির খরচ উঠে যাবে প্রথম বছরের আধা ফসলেই। সেটা অবিশ্বাসের কারণ ছিল না, কারণ ছুতোররা গোটা দশেক এই ধরনের তাপঘর তুলছে, লম্বায় যা মাইল খানেক, এতো ত্রফিম নিজেই দেখেছে।

বছর দুয়েকের মধ্যে যে আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য পিওতর অত উৎসাহী, সে রকম একটা উপার্জন যে এরা করছে না, তা এদের পোষাক আষাক দেখেই বেশ বোঝা যায়। কাজের সাফল্যের জন্যে ওরা কোনো বিশেষ লভ্যাংশও পাচ্ছে না। তাহলে নিজের নিজের কাজটার প্রতি ওদের অমন টান কেন, ভাবটা যেন ওগুলো তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ?

এ সবই কি চেতনার ফল ?

তুদোয়েভ যা বলে শ্রম হয়ে দাঁড়ায় আনন্দ, এ কি তাই ? আর তাই যদি হয়ে থাকে তবে দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে এমন এক অনুভূতি যা ত্রফিমের অজানা, যা সবচেয়ে প্রবল ঐ শক্তি — ব্যক্তি মালিকানার জায়গা নিতে চলেছে।

ফার্মের জন্যে টান থাকে শুধু তার যে সে ফার্মটার মালিক, যারা বারোমেসে অথবা মরশুমী মজুর হিসাবে সে ফার্মে কাজ করে তাদের নয়। তারা বরং পারলে কম করে খারাপ করে কাজ করতেই চায়। ত্রফিম কত শুয়োরকে পুষ্ট

করে তুলছে, কত শস্তায় তা সারছে সেটা নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তা নিয়ে ভাবনা শুধু একজনের। আর এখানে সে ভাবনা সবার। প্রতিটি কর্মীর। শুয়োরপালকটা পর্যন্ত এখানে হিসেব রাখে, কত লগ্নি করা হচ্ছে শুয়োরে, কত উঠে আসবে তা থেকে।

চাকুরে লোকেরাও ভাবে বৈকি। তবে তাদের ভাবনাটা শ্রমানন্দ নয়। চাকরি। ডিউটি। কেউ কাজ করে হাত দিয়ে, কেউ মাথা দিয়ে। যে যেভাবে পারে সেইভাবেই করছে।

ধরা যাক গালিয়া। কলখোজ দপ্তরে না গিয়েও সে জানে যে প্রতি বর্গমিটার জমি থেকে তাকে পেতে হবে পরিকল্পনা অনুসারে ষোলো কিলোগ্রাম শসা, কিন্তু তুলতে চাইছে সে আঠারো কিলোগ্রাম। আর ত্রফিমের মজুরদের চাড় শুধু নিজেদের পাওনাটা নিয়ে, সোমবার থেকেই তারা ভাবতে শুরু করে শনিবারের কথা, যখন টাকা মেটাবে ত্রফিম।

এই সব ভাবতে ভাবতে সে এসে পেঁছিল বড়ো চিশ্চাতে, বহুকাল আগে এখানে সে তার দাদুর দেওয়া বন্দুকটা নিয়ে শিকার করত। এখানেও চলছে এখানকার গালিয়া পান্তেলেইদের, ভবিষ্যৎ দুদোরভ স্মেতানিনদের কাজ।

এই বড়ো জলাটার জলনিকাশের কথা সে শুনেছিল, কিন্তু ভাবেনি যে তা থেকে আবাদী জমি বেরতে পারে। এখন দেখা গেল কালচে বাদামী আবাদী জমি সেখানে। দেখে সে ভাবতে লাগল কত পশুখাদ্য, কতগুলি গরু পুষতে পারে এই বড়ো চিশ্চা।

বিশ্বাস হচ্ছিল না। ত্রফিমের অভিজ্ঞ দৃষ্টি কি তাকে ছলনা করছে? না, ত্রফিমের ভুল হয়নি। এ তো সত্যিই এক অশ্রুতপূর্ব সম্পদ, আগামী বছরগুলিতে তা থেকে উঠবে প্রচুর মুনাফা।

নিজের হিসাবে ব্যস্ত থাকায় ত্রফিম খেয়াল করেনি যে গোটা জলাটায় গর্জন তুলে যে ট্র্যাক্টরটা অভাঙা জমি চষছে, সেটাতে ড্রাইভার নেই। চোখ রগড়াল সে, তারপর ঝকঝকে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে ফের তাকিয়ে দেখল, সত্যিই ড্রাইভার নেই।

তার মাথা খারাপ হতে শুরু করল নাকি?.. তার আসার দিন থেকে যত রকম নাড়া সে খেয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া নাকি মস্তিষ্কে? চোখ বন্ধ করল সে। দাঁড়িয়ে রইল। রুমাল নেড়ে হাওয়া খেল খানিকটা। 'প্রভু মম' প্রার্থনাটা

করল তারপর ফের তাকাল ট্র্যাক্টরের দিকে। ট্র্যাক্টরটা ইতিমধ্যে ঘুরে ফিরতি পথে চলেছিল। ড্রাইভার নেই। ত্রফিমের অস্বস্তি লাগল এই জনহীন প্রান্তরটায় — সেকালে এ জায়গাটা সম্পর্কে কত কথাই তো লোকে বলত। হঠাৎ সে শুনল:

'কাজ হচ্ছে না... লটপট করছে... এই-ই-ই ... লাগাও আমার দিকে!'

তেলমাখা পায়জামা আর গেঞ্জি পরা একটা ছোকরার গলা, একটা ঝোপের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল সে। কণ্ট্রোলচ্যুত ট্র্যাক্টরটার দিকে সে ছুটল একটা চিৎকার দিয়ে। চষা ক্ষেতটার অন্য দিক থেকেও ছুটে এল আরেকটা ছেলে। চ্যাঁচাল:

'আমি ধরছি, আমি ধরছি!'

অচিরেই ট্র্যাক্টরটাকে ধরে থামানো হল। ঝোপের মধ্যে রেডিও যন্ত্রের মতো একটা জিনিস নজরে পড়ল ত্রফিমের। ছোকরা ছুটে ফিরে এলে ও জিজ্ঞেস করলে:

'মাপ করবেন, ব্যাপারটা কী বলুন দেখি।'

বোঝা গেল উত্তর দেবার মেজাজ তাদের তখন নেই। গেঞ্জি পরা লম্বা ঠ্যাঙ ছোকরাটা বাঁকা ভাবেই বললে:

'দেখতেই তো পাচ্ছেন, রেডিও দিয়ে ট্র্যাক্টর চালাচ্ছি।'

ত্রফিম আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না ঠিক করে ভাবতে লাগল গালিয়া, পান্তেলেইয়ের কথা, ফের সে তুলনা করতে লাগল এই অপরিচিত তরুণদুটির সঙ্গে নিজের মজুরদের। এরাও অন্য লোক, একেবারেই অন্যবিধ লোক।

ওদের যন্ত্রটা সচল করা পর্যন্ত ত্রফিম অপেক্ষা করল না। দূর শুতিওমির রাস্তা ধরে চলতে লাগল।

৩১

এ পথে ত্রফিম হেঁটেছে দারিয়ার সঙ্গে গোপন অভিসারের দিনগুলোয়। তখন এ জায়গাটা ছিল ভারি নির্জন। আর এখন মোটর সাইকেল ছুটছে...

পেছনে আওয়াজ শুনে ত্রফিম সরে দাঁড়াল। পথ ছেড়ে দিলে। প্রধান

মেকানিক আন্দ্রেই লগিনভ তাড়াহুড়া করে কোথায় যেন যাচ্ছিল, ব্রেক কষে অভিবাদন বিনিময় করলে ওর সঙ্গে।

'অনেক দূরে যাওয়া হচ্ছে বুঝি,' জিজ্ঞেস করল ত্রফিম।

'তা দূরেই বটে,' অপ্রস্তুতভাবে জবাব দিল আন্দ্রেই, 'কাজ আছে।'

কাতিয়াকে নিয়ে পিওতরের ও আন্দ্রেইয়ের সেই কথাবার্তাটা, কাতিয়ার জন্যে আন্দ্রেই যে অ্যালবামটা কিনেছিল সে কথা মনে পড়ল ত্রফিমের।

"কাতিয়াকে দেখতেই যাচ্ছে হয়ত," ভাবতে ভাবতে ঘড়ি দেখল ত্রফিম।

আজ শনিবার, ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে চারটে, সবার ছুটি, কেবল ঐ যে দুটি ছিটগ্রস্ত ছোকরা রেডিও মেনে চলার শিক্ষা দিচ্ছে ট্র্যাক্টরকে, তারা বাদে। এসব কথা মনে রাখলে বোঝা যায় সত্যিকারের কোনো কাজ এখন আন্দ্রেইয়ের থাকার কথা নয়।

এটাও ভারি দুর্বোধ্য যে লগিনভ বড়ো চিশচার ড্রাইভারদের কাছে গেল না: প্রধান মেকানিক ছাড়াই জমি চাষের নতুন পদ্ধতি যাচাই করা অসম্ভব, আর এই মেকানিকটির মতো কর্তব্যপরায়ণ লোক পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও অন্তত তাদের কাছেই যেত।

তার মানে, নিশ্চয় আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা জিনিস এই তরুণটিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নিজের অথবা মোটরসাইকেলটার কিছুরই পরোয়া করছে না। দূর শুতিওমি দারিয়ার জন্মস্থান — হয়ত বা ওখানেই দারিয়া চলে গেছে তার নাতিনাতনি নিয়ে।

চেষ্টায় ক্ষতি কি, সাত কিলোমিটার পথ এমন আর কী দূর। দূর শুতিওমির পথ ধরে এগিয়ে চলল ও।

কিলোমিটার দুয়েক পথ গিয়েই ওর ইচ্ছে হয়েছিল ফিরে আসে। কিন্তু দেখা হয়ে গেল বছর চল্লিশ বয়সের একটি মেয়ের সঙ্গে, মাথায় তার গোলাপী রঙের একটা রেশমী শাল।

'শিঙ নেই এমন একটা ছাগল কি দৈবাৎ চোখে পড়েছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

ত্রফিম বললে, 'না তো।'

'পশমী ছাগল পালব বলে কিনেছিলাম ওটাকে, বুঝেছেন, কিন্তু খরগোসের মতো পালিয়ে বেড়ায়,' আলাপ চালিয়ে গেল মেয়েটা।

মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিল ত্রফিম, 'ভাবনা নেই, ছাগল যেখানেই যাক ঠিক তার ঘরে ফিরবে। ঘুরে ঘুরে ঠিক ফিরে আসবে ...'

'তা বটে। ও সপ্তাহে দিন তিনেক কোথায় যেন উধাও হয়েছিল ... নিজের মর্দাটার সঙ্গে ভাব নেই বোধ হয় ... কত হয় এমন ...' শাদা দাঁত অবারিত করে মেয়েটা হাসল, 'পরে ফিরে এল।'

'এবারেও ফিরবে। ওদের ধরন আমার জানা।'

'তা বটে। খুব বেশি দূর ছাগীটা যেতে পারেনি। মেকানিকের সঙ্গে চলে গেলেই হত, পায়ে হেঁটে যেতে অনেকটা পথ। ও আমায় মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিত, সেখান থেকে আমার ঘর খুব কাছে।'

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। ত্রফিম জিজ্ঞেস করল:

'আপনি তাহলে দূর শুতিওমি থেকে আসছেন?'

'ধরেছেন তো ঠিক। আপনারা বিশ্রাম সদনের লোকেরা তো ঐ নদীর গরু হাঁটা জায়গাটা ছাড়িয়ে বেশি যান না। আমাদের শুতিওমি জায়গাটা চেনেন নাকি?'

'জোয়ান কালে চিনতাম।'

'আপনি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের ভাই নন তো, যে আমেরিকা থেকে এসেছে?'

'কে এই পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, আমেরিকায় তার ভাইটা আবার কে?' ধূর্তামি করল ত্রফিম।

'শোনেননি সে কথা? কাগজে পর্যন্ত উঠেছে। চল্লিশ বছর হল ধেড়ে নেকড়ে আমাদের এখানে ছিল না, তারপর আমেরিকা থেকে খবর পাঠিয়ে ফিরে এসেছে।'

'এল কেন?'

'কে জানে কেন। নিজের বৌয়ের কাছে কী সব লিখেছিল। অবিশ্যি, এখন আর ওর বৌ নয়, ওকে তো সে ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় কোন একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে ... লিখেছিল, ওর সামনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে ... বৌ কিন্তু ওকে দেখতে চায় না, ঘোড়া জুতে চলে গেছে মিতিয়াগিন ডাঙ্গায়। নাতিনাতনিদেরও সঙ্গে নিয়ে গেছে, ওর সুন্দর সুন্দর সব নাতিনাতনিগুলোকে নেকড়ে যেন নাকে শুঁকতে না পায়।'

'ওর নাতিনাতনিরা তাহলে দেখতে খুব ভালো।'

'অমন রূপ দেখা যায় শুধু সিনেমায়। আর বড়ো মেয়েটি, মেকানিক যার জন্যে এটা ওটা খাবার দাবার আর চিঠিপত্র বয়ে দিয়ে যায় তার মা'র কাছ থেকে, সেটি তো একেবারে রাজকন্যে তারাকানোভার মতো, এতটুকু কম নয়, শুধু মাথার চুলটা সোনালী, বয়সেও খানিকটা ছোটো, গতর এখনো পুরো ভরে ওঠেনি। "আগ্নেয়ক" পত্রিকার ছবির মতো। লোকে বলে, ওর দিদিমা দারিয়ারও জোয়ান বয়সে এমন রূপ ছিল, যে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। লোকে বলে ভারী সতী ছিল দারিয়া। আর্তিওম ইভোলগিন — মারা গেছে লোকটি, দারিয়া যখন ন মাসের পোয়াতী তখন থেকে সে তাকে বিয়ে করার জন্য কত অনুনয় বিনয় করেছে। কিন্তু তার নাদিয়া, মানে ত্রফিমের মেয়েটা তিনবছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত দারিয়া তা কানে তোলেনি। অপেক্ষা করেছিল, তার মুখপোড়াটা ফিরবে। বিশ্বেস করেনি যে ওমস্কের কাছে সে মারা গেছে। আর সে অপেক্ষা ফলল ... জলজ্যান্ত ফিরে এল হঠাৎ, ন্যাকড়াওয়ালা দিয়াগিলেভের অপোগণ্ডটা! কিন্তু লাভ হবে না। যেমন এসেছে, তেমনি ফিরে যাবে ...'

অপরিচিত মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে ত্রফিমের পরিচিত ইতিহাসটা শোনাল, সেই সঙ্গে এমন কিছুও যোগ করল, যা ত্রফিমের অজানা।

'লোকে বলে দারিয়াকে এই নির্বাচনে প্রতিনিধি মনোনীত করা হবে ... বাখরুশিতে এখন নিজের দুর্নাম কেউ কি করতে চায়, ঐ যে লোকটা — আপনিই বলুন কী বলা যায় ওকে, ওর সঙ্গে দহরম মহরম করলে কথা তো রটবে ...' এই বলে থুতু ফেলল মেয়েটি।

মোড় পর্যন্ত পেঁছিল ওরা।

'এই দ্যাখো, মেয়েমানুষের গল্প তো ... কতদূর টেনে নিয়ে এলাম আপনাকে। ওই হল মিতিয়াগিন ডাঙ্গার রাস্তা। লোকে বলে, আগে ওখানে একটা ছোটো মঠ ছিল। তা ভালো করেই ছুটি কাটান, আমি এদিকে চলি ...'

ত্রফিম মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধন্যবাদ জানাল আলাপটার জন্যে। রাস্তার পাশের একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পাইপ বার করল। ভাব দেখাল যেন তার ফিরতি পথে যাবার আগে একটু জিরিয়ে নিয়ে ধূমপান করে নিচ্ছে।

৩২

গুঁড়িটায় ত্রফিম বসে রইল ঘণ্টাখানেক কি তারো বেশি। মিতিয়াগিন ডাঙ্গার দিকে চলে যাওয়া মোটরসাইকেলের দাগটা তাকে হাতছানি দিচ্ছিল। কিন্তু মন ঠিক করে উঠতে পারল না সে। দারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এখন ভয় হচ্ছিল তার। অপরিচিতা মেয়েটি তাকে যা বলেছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ওর প্রতি দারিয়ার মনোভাব। হয়ত বা দারিয়ার মুখের কথাগুলোই ও পুনরাবৃত্তি করে গেছে।

কিন্তু দেখা করার ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। ও যদি তার সামনে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠুকে বলে, "আমার গুরু পাপের মার্জনা আমি তোর মুখ থেকে শুনব বলে কতদিন অপেক্ষা করে আছি," তাহলে হয়ত বা সে ওকে তাড়িয়ে দেবে না?

না। অন্য ধরনের কথা বলতে হবে তাকে। সত্যিই করেই ওকে বলতে হবে কী সৌভাগ্যে ওর পথ হঠাৎ ভুল করে এসে পড়েছিল দারিয়ার কাছে, কোনো রকম কুয়াসা রচনার চেষ্টা চলবে না। ভগবানের প্রসঙ্গে ওর মন গলবে না। কিন্তু ত্রফিম তো আর আসলে কোনো কুমতলবে যাচ্ছে না তার কাছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে তাকে, বলতে হবে যে সে কেবল তাকেই ভালোবাসে, একদিন যদি বা তার মনে হয়েছিল যে এলজাকে ভালোবাসে, তবে সে শুধু এলজার নির্লজ্জ পাতকী দেহটা তাকে ভুলিয়েছিল। দারিয়াকে সে কথা বলা দরকার, জানুক সে কী ভাবে এই বনগুলোতে শুরু ও শেষ হয়েছে তার সুখ, এখানেই রয়ে গেছে তার বংশধরেরা, নিজেদের পিতা, পিতামহ বলে যারা তাকে স্বীকার করতে চায় না, হয়ত বা করা উচিতও নয়।

সন্ধ্যা হয়ে এল। নিঝুম হয়ে উঠল বন। একটু হাওয়া নেই, পাখির ডাক নেই। সূর্য তখনো পাটে বসেনি, ফার গাছগুলোর মাথায় হলুদ মোচাগুলো রঙীন হয়ে উঠল তার কিরণে।

প্রতিটি জীবই নিজের বংশধর রেখে যায়। রেখে যায় ফারগাছ, ফার্ণগাছ, এমন কি ফারের নিচে ত্রফিম যে মস্ত ব্যাঙের ছাতাটা দেখছে সেটাও।

বৈধব্যে পীড়িত মার্ফার আবেদনে কেন যে সে তখন সাড়া দেয়নি, কেন

যায়নি তার কুটিরে, পুরুষের জন্য যে কুটির ছিল আতুর? তাহলে হয়ত আজ তার এমন একাকী লাগত না।

কোথায় যেন দূরে অনেক দূরে শোনা গেল মোটরসাইকেলের শব্দ। সন্দেহ নেই আন্দ্রেই লগিনভ ফিরছে। মিতিয়াগিন ডাঙ্গার দুই তিন কিলোমিটার দূরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াই ত্রফিমের উচিত। সে কথা কালই যে দারিয়ার কানে উঠবে।

ফিরে যাবে বাখরুশির পথে?.. কিন্তু কতদূর যাবে। প্রধান মেকানিক অচিরেই ওর নাগাল ধরবে, জিজ্ঞেস করবে, কেমন করে কেন সে এসে পড়েছে এত দূরে।

ওদিকে মোটরসাইক্লিস্ট ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। সবচেয়ে ভালো হয় তরুণ ফারগাছগুলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়া, তারপর লগিনভ চলে গেলে পায়ে হাঁটা ছোট পথটা ধরে এগুনো, যদি সেটা এতদিনে গাছগাছড়ায় ঢাকা পড়ে গিয়ে না থাকে। তাই সে করল।

এই ঘন ফার ঝাড়ের মধ্যে লোকের চোখের আড়ালে সে দারিয়ার সঙ্গে কতবার লুকিয়ে থেকেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে, পাখিরা পর্যন্ত টের পায়নি।

গরম জুলাই দিনের নরম, ঝরঝরে বনতল। ঢালাও ফরাসের মতো তাতে গা এলাল ত্রফিম। ব্যাঙের ছাতার ঘ্রাণ এখানে আরো ঘন, আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে অতীত।

মোটরসাইকেলের শব্দ থেমে গেল। একটা শিঙহীন ছাগী চলে গেল রাস্তা দিয়ে। গোলাপী শাল মাথায় মেয়েটা হয়ত এরই খোঁজে বেরিয়েছিল।

ফের নিজের জানান দিল মোটরসাইক্লিস্ট, তারপর দেখা গেল তাকে। মাথা নুইয়ে ত্রফিম রাস্তাটা দেখলে।

ওই বটে। মোটরসাইকেলের সাইড কারে বসেছিল নীল সারাফান পরা একটি মেয়ে। মেয়েটি বললে:

'দিদিমা বলে দিয়েছে এর বেশি যেন না যাই...'

'জানি,' জবাব দিলে আন্দ্রেই।

মেয়েটা সাইড কার থেকে হালকা লাফে নেমে হাত বাড়িয়ে দিল।

'কাল এসো সকাল সকাল।'

'সকালে আসি কেমন করে... রবিবারে নাদেজদা ত্রফিমোভনা যে সকাল সকাল ওঠেন না।'

'তুমি উঠিয়ে দিও মাকে।'

'একই ব্যাপার দাঁড়াবে... কারখানা পর্যন্ত যাওয়া, ফের ফেরা... উনি বেশি স্পীডে ভয় পান... এতেই তোমার তিন ঘণ্টা। এগারোটার আগে আর নয়... আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও কাতিয়া চলে যেয়ো না, সাইড কারে বসো না একটু।'

আন্দ্রেই যদি কাতিয়ার নাম নাও করত, তার ঐ মধুর সুরেলা গলার যে ঝঙ্কারটা ত্রফিমের কান থেকে যাচ্ছে না সেই গলায় কাতিয়া যদি একটি শব্দও উচ্চারণ না করত, কাতিয়ার সঙ্গে ত্রফিমের যদি দেখা হত ব্রডওয়েতে কি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কোনো জায়গায়, তাহলেও ত্রফিম থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠত, "দারিয়া, এখানে এলি কী করে?"

চল্লিশ বছর আগে লোকে যে সাজ করত, সে সাজ নয়, একটা বেণীর বদলে তার ঐ দুটো বেণী, সে ভাষা নয় যা দারিয়া বলত — তবু কিছুতেই তাকে চিনতে ভুল হত না ত্রফিমের।

বড়ো বড়ো ফোটায় ঠাণ্ডা ঘাম মুখ বেয়ে গড়িয়ে এসে প্রায় চোখ বুজিয়ে দিল তার। পকেট থেকে রুমাল বার করার জন্যে একটু নড়ে উঠল ত্রফিম, কাতিয়া তার দিক থেকে মাথা ফিরিয়ে বললে:

'সত্যি আন্দ্রেই এ কী না যযো না — তস্থো... তার চেয়ে আমায় এগিয়ে দাও... তোমার কারে কেমন যেন বসতে ইচ্ছে করছে না।'

কাতিয়া ফের সাইড কার থেকে লাফিয়ে নামল আর লগিনভ মোটরসাইকেলটা সরিয়ে রাখল ফার ঝোপের দিকে, সামনের চাকাটা আর একটু হলেই ত্রফিমকে ছুঁয়ে যেত। মিতিয়াগিন ডাঙ্গার পথে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগল কাতিয়া আর আন্দ্রেই। ত্রফিম চোখ মেলে রইল ওদের দিকে, তারপর ওদের গলা যখন আর শোনা গেল না, তখন উঠে দাঁড়াল। ঘাম তখনোও ওর থামেনি, দপদপ করছিল রগদুটো।

ফারগাছের কাছে দাঁড়িয়ে ও দ্রুত পাইপ ভরল আর বনের পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল এই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে যে পরের দিনও সে আসবে এখানে, নিজের মেয়ে নাদেজদাকে অন্তত একবার চোখের দেখাও দেখে যাবে।

৩৩

শনিবার সন্ধ্যায় পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ সান্ধ্য চা খাচ্ছিল একটা নীল শার্ট পরে। ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা চুল আঁচড়ে দিয়েছিল নরম হাতে, মেজাজটা তার আজ খুবই ভালো। রেলওয়ের সঙ্গে কথাবার্তার কী চমৎকার ফয়সালা হয়েছে সেটা সে বৌকে শোনাতে যাবে এমন সময় বেড়ার ফটকে শব্দ হল, আঙিনায় এসে দাঁড়াল টেনর।

'কমরেড পি টি, বাখরুশিন যদি ঘরে না থাকেন তবে তাকে বলে দেবেন যে একেবারে নিঃসঙ্গ এক "পরিত্যক্ত" পরদেশী স্থানীয় অধিবাসীদের করুণাপ্রার্থী।'

'আরে আসুন, আসুন, অনাথ পুত্র, আমেরিকান সহাবস্থানী... টেবলে সামোভার, পানপাত্রে ভিটামিন। পান করলে যদি গলা খোলে তবে কলমও ভালো চলবে আশা করি...'

'না, না, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, মার্কিন প্রেসকে বেচাও যায় না, কেনাও যায় না। কিন্তু... বলতে চাই "কিন্তু", কিন্তু গৃহস্বামী যদি কার্পণ্য না করেন তবে সাম্রাজ্যবাদী টেনর হয়ত সহৃদয় হয়ে উঠবে,' অভিবাদন করে ঘরে ঢুকল টেনর।

'অতি আনন্দের কথা মিঃ টেনর আসুন আসুন,' টেনরকে অভিবাদন জানাল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা। টেনরের গায়ে বানর, হুইল, তালগাছ আঁকা হাওয়াই চেক শার্টটা লক্ষ্য করে সে বলল, 'আজ এ কী সাজ করেছেন মিঃ টেনর, আমাদের মেয়েরা একবার দেখলেই...'

'রহস্য নয় কিন্তু... ইতিমধ্যে ব্যাঙের ছাতা যোগাড়ের জন্য তুদোয়েভার নেমন্তন্ন পেয়ে গেছি।'

আগফসলী বাঁধাকপির ক্ষেতটায় সেই স্মরণীয় কথা কাটাকাটির পর বাখরুশিনের সঙ্গে টেনরের ফের মিল হয়ে গিয়েছিল।

টেনরকে চেয়ারে বসিয়ে বাখরুশিন জিজ্ঞেস করল:

'মিঃ গ্রন্থকার, তাহলে আজ আমাদের কী দিচ্ছেন?'

'শেষহীন শুরুটা।'

'আর শেষটা?'

'সেটা দারিয়া স্তেপানোভনার কাছে।'

'হুম... আমি যতটা বুঝি, দারিয়া স্তেপানোভনা তো এর সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আপনার বইয়ের প্রধান লক্ষ্য তো কলখোজ, ত্রফিম এবং আপনার চোখ দিয়ে দেখা কলখোজ...'

'এটা লক্ষ্য! কিন্তু সেটা চোখে পড়া চলবে না... আমাদের পাঠকদের আপনি জানেন না... তারা চায় সব কিছুই তাদের জন্যে খুলে দেওয়া হোক। ত্রফিমের সঙ্গে দারিয়া স্তেপানোভনার সাক্ষাৎটা যাতে হয় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

'আমি তার কী করব?.. কোথায় সে আছে তাই তো আমি জানি না।'

টেনর পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল:

'এই যদি আপনার অসুবিধা তবে আমি আপনাকে বলে দিতে পারি কোথায় সে আছে।'

এবার টেনরের চোখের দিকে বাখরুশিনের চাওয়ার পালা।

'কিন্তু কী করে জানলেন কোথায় আছে?'

'ওহ্, সে কথা জিজ্ঞেস করবেন না... আমি একেবারে ভুল করেই সাংবাদিক হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার হওয়া উচিত ছিল ডিটেকটিভ। গোয়েন্দা। তবে শুনুন... কয়েকদিন আগে বাছুর ঘরের ডিউটি-মেয়েটিকে ফোন করার বাসনা হয়। জিজ্ঞেস করলাম সংবাদপত্রের জন্যে দারিয়া স্তেপানোভনার বিষয়ে একটা ছোট্ট লেখার ব্যবস্থা করা যায় কী করে... মেয়েটি বললে দারিয়া স্তেপানোভনা বর্তমানে নাতিনাতনি সহ মিতিয়াগিন ডাঙ্গায় অবকাশ যাপন করছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রিসিভার রেখে দিলাম...'

'আর আপনি তা বিশ্বাস করলেন মিঃ টেনর?'

'উঁহু। আমি যাচাই করে নেব ভেবে মিতিয়াগিন ডাঙ্গায় ফোন করি, দারিয়া স্তেপানোভনাকে চাই। চমৎকার কথাবার্তা হয় আমাদের, সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি।'

চেয়ারের ওপর উশখুশ করে উঠল বাখরুশিন, চোখ তার কখনো টেনরের ওপর, কখনো বৌয়ের ওপর, যেন বলতে চায়, "ইস, আচ্ছা তুখোর তো!"

টেনর বলে চলল:

'অচিরেই আমি যাই তার কাছে। ত্রফিমের সঙ্গে যদি ওর সাক্ষাৎ না ঘটে সে ক্ষেত্রে আমার যা দরকার সে সবই আমি লিখে নিয়েছি, কিন্তু সাক্ষাৎ না হলে আমার বইয়ের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক একটা পরিচ্ছেদই ভেস্তে যাবে।'

'কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে ত্রফিমকে সেখানে নিয়ে যান না কেন, কে বাধা দিচ্ছে?'

টেনর জবাব দিল:

'আমার এক প্র-প্র-পিতামহী ছিলেন ইংরেজ, শ্নুনেছি তার কয়েক ফোঁটা রক্ত আমিও পেয়েছি। সেই থেকে নিজেকে আমি একদিক থেকে ভাবি জেণ্টলম্যান, অন্যদিক থেকে একজন প্ররোচক। সেই জন্যে আপনারা ত্রফিমের কাছে যেটা গোপন রেখেছেন সেটা আপনাদেরই ন্নুন খেয়ে ত্রফিমকে জানিয়ে দিতে বাধছে।'

'আপনি যদি সত্যি কথা বলে থাকেন তবে ধন্যবাদ।'

টেনর মাথা ন্নুইয়ে জবাব দিল:

'সর্বদাই সত্যি কথা বলতেই আমি চেষ্টিত... সেটা আমার কাছে প্রীতিকর বলে হয়ত মোটেই নয়... এটা লাভজনক।'

'লাভজনক?' জিজ্ঞেস করল বাখর্নুশিন, 'সেটা কেমন করে?'

'অত্যন্ত সোজা। একটা মিথ্যে থেকে শ্নুর্নু হয় দ্বিতীয় মিথ্যে, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ... এবং এইভাবে চলে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মিথ্যার মধ্যে গোলমাল হয়ে গিয়ে লোকে সত্যি বলে ফেলে... সেটা আমার কাছে লাভজনক বলে মনে হয় না, তাই যেটা সত্যি সেইটে প্রথমেই বলে ফেলার চেষ্টা করি। সেটা সহজ নয়, কিন্তু কী করা যাবে! বল্নুন!'

বাখর্নুশিন ও ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা সমর্থনের হাসি হেসে উঠল হো হো করে। টেনর তাদের ছবি দেখাতে শ্নুর্নু করল মিতিয়াগিন ডাঙ্গার।

'এত বয়সেও র্নুপসী বটে,' টেনর টেবলের ওপর একটা রঙিন ফোটোগ্রাফ রাখল, তাতে ছোটো নাতিটির সঙ্গে দারিয়া স্তেপানোভনার ছবি, দাঁড়িয়ে আছে আগাফিয়ার বাড়ির জানলায়। 'ছেলেটাকে কী মনে হয় পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, ঠিক ওর দাদ্নুর বাচ্চা বয়সের মতো না?'

'তাই বটে,' সমর্থন করল বাখর্নুশিন, 'ত্রফিম যখন বাচ্চা ছিল, তখনকার চেহারার সঙ্গে সের্গেইয়ের ভয়ানক মিল। সেই জন্যে ত্রফিম ওকে বরং না

দেখল।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাখরুশিন টেনরের কাঁধে হাত রাখল; অনুচ্চ স্বরে বলল, 'আপনি ভালো লোক জন টেনর। আপনার কোনো উপকারে লাগতে আমার খুবই ইচ্ছে। খুবই চাই যে আপনার বইটাও আপনার মতোই হোক। বই সবসময় তার রচয়িতাদেরই মতো... শুধু মাফ করবেন, কাল থেকে দারিয়া আর মিতিয়াগিন ডাঙ্গায় থাকবে না।'

'খুবই খেদের কথা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।'

'কিন্তু কী করব বলুন, দারিয়ার এখন বয়স হয়েছে, আপনার বইয়ের জন্য তাকে বিচলিত করে তোলা, কী, কেন, কবে এসব কথা তার নাতি-নাতনিদের কাছে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করা — এ আমি পারি না... আপনি বিচক্ষণ লোক টেনর, আপনার নিশ্চয় বোঝার কথা যে এ রকম সাক্ষাৎকার প্রীতিকর হয় না।'

টেনর পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কথায় সায় দিল বটে কিন্তু নিজের মতটার ফের পুনরাবৃত্তি করল:

'ভারি দুঃখের কথা... এমন একটা কাহিনী মাঠে মারা যাবে...'

৩৪

এবার দারিয়া স্তেপানোভনা আর কাতিয়ার কথা।

১৯৫৯ সালের হেমন্তের মধ্যেই এ বইয়ের পাতাগুলো শেষ হবে, তার মধ্যে তাই কাতিয়ার প্রেমকাহিনী সবটা ধরা পড়বে না, তাহলেও আগে থেকেই আমরা জানি যে আন্দ্রেই লগিনভের সঙ্গে কাতিয়ার সুখ পূর্ণ হয়ে উঠবে। এত সুখীই হবে কাতিয়া যে তুদোয়েভার কথায় বলতে হয়, "সূর্যের আগে আগে ছোটার" ইচ্ছে হয়, এ দুই যুগলের বিয়ের দিনটা কল্পনা করতে সাধ জাগে।

বিয়ে অবশ্যই হবে লেনিন্ভি চড়াইয়ে, ততদিনে বাখরুশি গ্রাম নতুন করে গড়ে উঠবে সেখানে, আর হবেও নিশ্চয় দারিয়া স্তেপানোভনার বাড়িতে। সে বাড়িখানা তার হবে ভারি সুন্দর, বড়ো বড়ো জানলা, "শান্তি" নামে রাস্তার ওপর, জায়গাটা ইতিমধ্যেই প্লটে ভাগ হয়ে গেছে।

আর কনে কর্তা অবশ্যই হবে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। বিয়ে উপলক্ষে তুদোয়েভা নিশ্চয় একটা নতুন কাহিনী বানিয়ে রাখবে: শান্ত সরোবরে কেমন করে এক শ্বেত মরাল উড়ে এল তার মরালীর সন্ধানে ... কিংবা হয়ত বা সেটা হবে দারিয়ার তৃতীয় ও শেষ যৌবনের কাহিনী, প্রথমে ফুটল সে নিজে, পরে ফুটল তার মেয়ের মধ্যে আর এখন ফুটছে তার নাতনির মধ্যে। এ কাহিনীটা কিন্তু এখন থেকেই মাথায় খেলছে তুদোয়েভার, তার খানিকটা খানিকটা সে পরিচিতদের শুনিয়েও রেখেছে ...

বিয়ে রেজিস্ট্রির জন্যে ওরা সম্ভবত যাবে তাদের "মস্ক্‌ভিচ" গাড়িতে। সেভিংস ব্যাঙ্কে আন্দ্রেই লগিনভ যে টাকা জমাচ্ছে সে তো অকারণে নয়।

বিয়ে অবশ্যই হবে বসন্তে, যখন ফুল ধরে চেরিগাছে। চেরির গোছায় কনের শাদা পোষাক কী সুন্দরই যে মানাবে। সে পোষাক হবে শাদা, লম্বা, বিয়ের সাজ বলে কথা, এতো আর নাচের ফ্রক নয়। তার কাপড় এখনই কিনে রেখেছে দারিয়া স্তেপানোভনা। হয়ত একটু বেশি ব্যস্ততাই দেখিয়েছে কিন্তু বলা তো যায় না, বছর দুয়েকের মধ্যে অমন সিল্ক ফের বানাবে কিনা। যদি বা বানায় তো হয়ত তা অন্য শহরে চালান যাবে। খুঁজে মরতে হবে তখন।

কাতিয়া আন্দ্রেই অবশ্যই দারিয়া স্তেপানোভনার সঙ্গেই থাকবে। ওকে তো আর একা রেখে চলে যাওয়া যায় না। এ তো স্থির হয়েই আছে, যদিও এখনো পর্যন্ত কেউ তা নিয়ে একটা কথাও তোলেনি। কথা কি সবক্ষেত্রেই কইতে হয় নাকি? কাতিয়ার যে মেয়ে হবে সেও তো কেউ বলাবলি করে না, কিন্তু মেয়ে হলে যে তার নাম দারিয়া ছাড়া অন্য কিছু রাখা হবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে কেউ?

কাতিয়ার বয়স আরো বছর দুই বাড়িয়ে শেষ পরিচ্ছেদে যে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, সেটা সত্যিই ভারি খেদের কথা, সে রকম পরিচ্ছেদ লিখেও সুখ, পড়েও আনন্দ। কিন্তু যা আছে তাই নিয়েই তুষ্ট থাকা যাক। মিষ্টি মেয়ে কাতিয়াকে এই টুকুর জন্যেই ধন্যবাদ যে সে এ কাহিনীতে মূল নায়িকা হিসাবে না হলেও মাঝে মাঝে দেখা দেয় ... যা ঘটবে তা কি ঘটতে পারত কাতিয়া ছাড়া? কারণ কাতিয়ার ওপর দিদিমার প্রভাব আছে শুধু তাই নয়, দিদিমার ওপরেও যে প্রভাব আছে কাতিয়ার, এমন কি সে নিয়ে কোনো কথা তাদের কেউ না বললেও।

কাতিয়ার কথা ভাবতে গেলে দারিয়া স্তেপানোভনার নিজের অতীতের কথা মনে পড়ে। দারিয়া জানে, কাতিয়া আর আন্দ্রেই তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা কখনো হারাবে না। ওরা তাড়াহুড়া করবে না তার মতো। হাজার হোক, দারিয়া ত্রফিমকে খুঁটিয়ে দেখতে পারেনি। সে অবিশ্যি যুগের দোহাই, জীবনযাত্রার দোহাই, এমন কি রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার দোহাই দিতে পারে, কিন্তু তাতে মন তার তো হালকা হয় না।

ওর প্রথম প্রেম, কাতিয়া আর আন্দ্রেইয়ের মতো পবিত্র উজ্জ্বল সে প্রেম এখন মলিন হয়ে তার জীবনে একটা কালো দাগ রেখে গেছে। এর জন্যে তাকে কেউ নিন্দা করেনি, কিন্তু নিন্দাটাই কি সব? দারিয়া জানত না তার সবচেয়ে আপন জন. কাতিয়া সেটা কীভাবে দেখে। সবচেয়ে মন-খোলা লোকেরাও তো কিছু না কিছু না বলা রেখে দেয়। তা করে ভালোবাসা, করুণা থেকে, ক্ষত স্থানে হাত না দেবার বাসনা থেকে, এমন কি নেহাৎ ভদ্রতা থেকেও।

ত্রফিমের বিষয়ে কাতিয়া কখনো দিদিমার সঙ্গে আলাপ করেনি। এটা তার পক্ষে যেমন ভালো, তেমনি মন্দ। কাতিয়া তো এখন বড়োই হয়ে উঠেছে, দারিয়ার ইচ্ছে হত তার সঙ্গে নিজের অতীতটা নিয়ে কথা বলে।

কিন্তু কেমন করে? নাতনির কাছে নিজের কৈফিয়ৎ দেবে। কিন্তু কেন? নিজের দোষ তো তার কিছুই নেই। তবুও কেমন একটা অপরাধবোধ ছিল তার। এটা সেই স্মেতানিনের অপরাধবোধের মতো। স্মেতানিন পার্টিতে ঢোকার সময় এই একটা দোষবোধে পীড়িত হত যে বাপ তার ছিল গির্জার স্তবপাঠক। কিন্তু নিজের বাপ-মা তো আর স্মেতানিন নিজে বাছাই করে নেয়নি। স্বামী বা স্ত্রী বাছাই করা যে অন্য ব্যাপার...

শেষ পর্যন্ত নিজের মনে মনে এই আলাপে হাঁপিয়ে উঠল দারিয়া, ঠিক করল কাতিয়ার সঙ্গে কথা কইবে। ওরা তখন নতুন তোলা বাদামী ব্যাঙের ছাতাগুলো বয়ামে ভরছিল আচারের জন্যে আর শুনছিল নতুন পাইন কাঠের ছাতের কাছে একদল মাছির একঘেয়ে গুঞ্জন — ভারি একটা ফুর্তির হৈহৈ খেলা জমিয়েছিল তারা।

'বাখরুশি থেকে কবে যে লোকটা যাবে,' শুরু করল দারিয়া।

আন্দ্রেইকে ছেড়ে থাকতে হচ্ছে বলে কাতিয়া রেগে ছিল, তাই মনের কথাটা সে এই প্রথম বলে দিল দিদিমাকে:

'আমেরিকায় যবেই ফিরুক না কেন, তুমি যদি ওর সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে বেড়াও তবে কখনই তোমায় ও শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

'দেখা করব কেন? লোকে পাঁচকথা বলে বেড়াবে সেই জন্যে?'

'না দিদিমা... কথা থামাবার জন্যে। যাতে সবাই, সে আর তুমি নিজেও যাতে জানো যে আমাদের কারো কাছ থেকে কিছুই লুকোবার নেই... সত্যিই কিছুই লুকোবার নেই। আন্দ্রেই ঠিকই বলে, সম্পর্কটা বোঝা যায় না যদি বুঝে না নাও।'

'ওর সঙ্গে আমার ভারি তো সম্পর্ক।'

'না দিদিমা, সম্পর্ক আছে। শত্রুতা। ক্ষোভ। ঈর্ষা। এমন কি তোমার এই পালিয়ে আসাটা — এটাও তো সম্পর্ক।'

'দিদিমাকে শেখাচ্ছিস।'

'কী যে বলো। কথার জবাব দিচ্ছি। তুমি তো অনেকদিন থেকেই জানতে চাইছিলে আমি কী ভাবি? সত্যি, অনেকদিন থেকে, তাই না?'

দারিয়া কাতিয়াকে টেনে এনে নিজের বুকে ওর মাথাটা রেখে বললে:

'হ্যাঁ, অনেকদিন থেকে... তুই বলিস ভালো, তবে এমন কিছু সম্পর্ক আছে যা বুঝে নেবার দরকার নেই। কারণ বোঝাবুঝি করে নিতে গেলেই শুরু হয় নতুন সম্পর্ক... হাজার হোক, আমি যে ওকে ভালোবেসেছিলাম। নিজেকে আমার জায়গায় আর আন্দ্রেইকে ওর জায়গায় বসিয়ে ভেবে দ্যাখ।'

'ও রকম ভাবা যায় না দিদিমা। কিন্তু যদি ধরো... এমন কি এখনই, আমরা এখনো চুমুও খাইনি, কিন্তু ও যদি কথা দিয়ে কোনোদিন না আসত, তাহলে আমি কিন্তু চুপ করে থাকতাম না। চুপচাপ থাকাটা — এটা দিদিমা হল সাবেকী মেয়েলী কুসংস্কার।'

'বেশ, দিদিমার সঙ্গে নাতনির সম্পর্কটাও বোঝাবুঝি হয়ে গেল। বোঝাবুঝি হয়ে গেল আর এই কথা রইল যে ওর বিষয়ে আর কখনো কথা হবে না।'

আলাপ এখানেই শেষ হল, ফের শোনা গেল ছাতের নিচে উড়ন্ত মাছিগুলোর বিরক্তিকর গুঞ্জন।

কথা শেষ হল, দারিয়া স্তেপানোভনার আচরণে কিছু ভাবান্তর হয়েছে বলে মনে হল না। কিন্তু সেটা শুধুই মনে হওয়া।

'মাছির ভনভনানিটা বাপু ভালো নয়।' কথাটা সে অকারণে বললে এমন নয়।

'ঠিক বলেছ দিদিমা, সামোভারের গোঙানির মতো — অশুভ লক্ষণ,' আবছা একটু হেসে জবাব দিল কাতিয়া।

'লক্ষণের কথা বলছি না কাতিয়া, বিচ্ছিরি লাগছে তাই বলছি। হৈ ফুঃ!' মাছিগুলোর উদ্দেশে চেঁচাল দারিয়া তারপর বাসন মোছা তোয়ালে দিয়ে তাড়াতে লাগল তাদের।

মাছিরা কিন্তু পালাল না।

৩৫

রবিবারের সকাল শুরু হল দেরি করে, বিনা ব্যস্ততায়। লোকে তখন ঘুমিয়ে। মোরগের ডাকও যেন সেদিন শোনা গেল দেরিতে। মাঠে একটি জনপ্রাণী নেই, কেবল বড়ো চিশ্চাতে ঘড়ঘড় করছিল ট্র্যাক্টর। ক্ষেপা ছোঁড়াদুটোর ঘুম নেই এ সকালে, বোধ করি রাতে বাড়িতেও যায়নি, ঝোপে ঝাড়ে শুয়েই খানিকটা গড়িয়ে নিয়েছে।

গতকালের গোপন জায়গাটার দিকে যাত্রা করল ত্রফিম, বনপ্রান্তের গ্রামগুলোকে এড়িয়ে গেল। চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে সে পৌঁছল দূর শুতিওমির রাস্তায়।

আসার আগে পেলাগেয়া কুজমিনিচনার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া ব্যাঙের ছাতার ঝুড়ি, আর তুদোয়েভের দেওয়া ক্যানভাসী হাইবুট জোড়া থেকে তার অত দূরে বিজন বনে যাওয়ার একটা কৈফিয়ৎ মিলবে।

হাতে অনেক সময় নিয়ে বেরিয়েছিল সে। ভাগ্যমন্ত মেকানিকটি বোধ হয় এখনো নাদেজদার কাছে পৌঁছয়নি। কিছু ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহের সময় ছিল ত্রফিমের। ফেরার সময় খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরতে হবে না।

গত কাল থেকে তার চোখের সামনে কাতিয়ার মূর্তি ভাসছে। বনপথের প্রতিটি বাঁকেই এবার যেন সে দেখা দিতে থাকল। বনের ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠলেও প্রতি পদক্ষেপে যে ছায়ামূর্তিটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে তাকে তাড়াবার জন্যে কপালে ক্রুশ আঁকলে না ত্রফিম, মন্ত্রোচ্চারণ করল না।

বরং কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিল সে। আর সত্যি সত্যিই প্রতিমূর্তি যেন দেহ পেয়ে গেল। মোড়ের অদূরে গান গেয়ে উঠল প্রতিমূর্তি:

আহ নাতালিয়া, নাতালিয়া যেতেছ কোথায়?..

বোঝা যায় "প্রতিমূর্তিও" আজ সকালে ঘুমোয়নি। অচেনা লোক দেখে কাতিয়া চুপ করে গেল। অচেনা লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করল:

'কিছু যদি না মনে করেন, দিদিমণি, আপনাদের এদিকটায় ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যায় কেমন?'

'তা ব্যাঙের ছাতা উঠতে শুরু করেছে,' কাতিয়া বলল। 'দিদিমা প্রায় এক ঝুড়ি জোগাড় করেছিল।'

'ব্যাঙের ছাতায় তাহলে আপনার কোনো উৎসাহ নেই দেখছি,' বিষণ্ণ স্বরে সে জিজ্ঞেস করল কাতিয়াকে।

কাতিয়ার মনে হল লোকটা অসুখী, পীড়িত। হাত আর ঠোঁট ওর ভয়ানক কাঁপছে। চোখে ভয়। কাতিয়া জিজ্ঞেস করল:

'বনে কেউ আপনাকে কিছু গালমন্দ করেছে?'

'এখনো পর্যন্ত তো করেনি,' উত্তর দিল ত্রফিম।

খুব কাছেই দারিয়ার গলা শোনা গেল:

'কার সঙ্গে তুই কথা কইছিস রে কাতেরিনা?'

কাতিয়া জবাব দেবার আগেই ত্রফিম হাঁটু গেড়ে বসল তারপর মাটিতে মাথা লুটিয়ে বললে:

'তোর মুখ আমি এখনো দেখিনি দারিয়া... কিন্তু তোর গলা শুনেই চিনেছি... আমায় যদি দেখা দিতে না চাস তাহলে তুই না চলে যাওয়া পর্যন্ত মাথা তুলব না...' প্রার্থনা পড়ার মতো করে ও বিড়বিড় করল। কাঁধদুটো কেঁপে উঠল ওর।

দারিয়া স্তেপানোভনা ভেবেছিল বনের দিকে ফিরে যাবে, কিন্তু কাতিয়া চেঁচিয়ে উঠল:

'দিদিমা, কোথায় চললে?'

একথাগুলোর মধ্যে দারিয়া যেন শুনল, "দেখাই যখন হয়ে গেল তখন চলে যাচ্ছ কেন? কী দরকার?"

ফিরল দারিয়া স্তেপানোভনা।

ত্রফিমকে বললে, 'মাথা তোল। এ বনে এসে হাজির হলে কেন বল তো?'

ত্রফিম উঠে দাঁড়াল। দারিয়ার মুখোমুখি তাকাতে ভয় পেয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল।

'এখন মাথা নোয়াও আর না নোয়াও, সময় তো ফিরবে না... অমন করে কেঁপো না বাপু, বেত পাতার মতো অমন কেঁপো না... বুড়ি হয়েছি, কিন্তু এখনো ডাইনি হয়ে উঠিনি... তোমার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব না, ভয় নেই।'

চোখাচোখি হল ওদের। ত্রফিম ভেবেছিল দারিয়াকে আরো অনেক বুড়ি দেখাবে। সোজা সিঁথিতে পাট করা তার চুল, দুপাশে শাদার আঁচড়, এতে তার এখনো বলিহীন রোগা মুখটাকে বুড়ো করে তোলার বদলে শোভিত করেই তুলেছে। চোখ আগের মতোই নীল আর সুন্দর। বয়সে তার জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়নি, মরেনি।

'তুমি বাপু ভারি কাহিল হয়ে গেছ কিন্তু। হার্টের দম ফুরিয়েছে দেখছি... অত ঘামছ কেন... বসো... তোমার অসুখ বিসুখ হলে আমেরিকার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে তো আমাদের।'

'আমেরিকায় কে বা আমার পথ চেয়ে আছে, দারিয়া স্তেপানোভনা।'

'হয়েছে, হয়েছে। মিথ্যে কথাগুলো বোলো পরে। বসে একটু জিরোও দেখি। হাজার হোক, এমন দেখা তো আর রোজ ঘটে না।'

একটা কাটা গাছের ওপর বসল ত্রফিম। সত্যি সত্যিই অসুস্থ বোধ করছিল সে। জামাটা পর্যন্ত ভিজে উঠেছিল।

কাতিয়া ভয়ে ভয়ে তাকাল দিদিমার দিকে। চোখের পাতা কাঁপছিল দারিয়ার। এ সাক্ষাৎকারের উত্তেজনাটা খানিকটা লঘু করার জন্যে কাতিয়া বলল:

'কী আর এমন হয়েছে। আমেরিকাতেও এভাবে দেখা হয়ে যেতে পারত। তোমাকেও তো আমেরিকা পাঠাতে চেয়েছিল, নিউমোনিয়া না হলে পিওতর দাদুর সঙ্গে চলেও যেতে।'

'তা ঠিক কাতিয়া। মাছি যদি উড়ে যেতে না চায় তবে তার হাত থেকে

রেহাই কই ... হয়ত এটা ভালোই হল ... আন্দ্রেই তোর মাকে নিয়ে আসছে নাকি?'

কাতিয়া কান পেতে শুনল তারপর ছুটে গেল রাস্তায়।

'আসছে, আসছে! সাবধান করে দেওয়া দরকার।'

ত্রফিম ধাতস্থ হল কিন্তু মাথা তুলল না। চুপ করে থাকার চেয়ে দারিয়া স্তেপানোভনা জিজ্ঞেস করলে:

'কেউ বলে দিয়েছিল, নাকি নিজেই গন্ধ শুঁকে এসেছ?'

'কাল একটা মেয়ে ছাগল খুঁজছিল। দূর শুতিওমিতে বাড়ি। বনের কিনারায় দেখা। আমার গল্পগুলো সব শোনালে ... কী গালমন্দই না করলে আমায়! কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম আজ ফের একবার আমার নাতনিটিকে দেখে যাব...'

'তার মানে ওকে আগেই দেখেছ?'

'কাল ফার বনটায় শুয়ে ছিলাম, ওরা যাচ্ছিল ওদিক দিয়ে ... লাগিনভ ছোকরাটি বেশ। নিন্দে করার নেই কিছু ...'

'নিন্দে করলেও কেউ শুনবে না।'

মোটরসাইকেল এগিয়ে এল, কাতিয়া বসেছিল আন্দ্রেইয়ের পেছনে, সাইড কারে নাদেজদা ত্রফিমোভনা।

'ভালো আছো মা,' দারিয়া স্তেপানোভনার সঙ্গে কুশল বিনিময় করল সে। 'শেষ পর্যন্ত আর পালিয়ে থাকতে পারলে না।'

ত্রফিম ঘাড় ফেরাল তারপর উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তারই মেয়ে। এ যেন তারই মুখটাকে একটা মেয়ের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে। নাদেজদা ত্রফিমোভনাই এগিয়ে এসে বলল:

'নমস্কার ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ ...'

ত্রফিম বলল:

'নমস্কার ... জানি না কী বলে ডাকব।'

'ডাকবেন নাদেজদা ত্রফিমোভনা বলে। আমার পক্ষেও সেটা ভালো, আপনার কাছেও সেটা বোধগম্য।'

'তা ঠিক। তর্ক করার অবস্থায় আমি নেই। খুব খুশি হলাম, নাদেজদা ত্রফিমোভনা, মুখে কথা পর্যন্ত আসছে না ...'

'ভারি খুশির কথাই বটে,' দারিয়া স্তেপানোভনা প্রায় অশ্রুত একটা মৃদু মন্তব্য করল। তারপর নাতনির দিকে ফিরে বললে, 'সাগর পারের অতিথিকে চায়ে নেমন্তন্ন কর ছুঁড়ি... মোড়ের মাথায় দাঁড় করিয়ে রাখবি নাকি?'

'আসুন, ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, আপনাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে বলছেন দিদিমা।'

ধন্যবাদ জানিয়ে অভিবাদন করল ত্রফিম।

'আমি বরং আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে মোটরবাইকে এগিয়ে যাই। তোরা মিঃ বাখরুশিনকে নিয়ে আসবি হেঁটে,' বলল দারিয়া স্তেপানোভনা।

'ঠিক আছে মা,' সায় দিল নাদেজদা ত্রফিমোভনা।

তারপর দারিয়া স্তেপানোভনা সাইডকারে বসে যাত্রা করার পর ত্রফিমকে বললে:

'আসুন, আমাদের সঙ্গ দান করুন...'

'সানন্দে,' উত্তর দিল ত্রফিম। তারপর সরু পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে এগিয়ে গেল মেয়ে আর নাতনির পিছু পিছু।

৩৬

ফ্রাইং প্যানে টক ক্রীম সহযোগে ভাজা হচ্ছিল ব্যাঙের ছাতা। একটা চালার নিচে গ্রীষ্মকালীন উনুনে লোহার ডেকচিতে সেদ্ধ হচ্ছিল টাটকা ভেড়ার মাংস। ভাজা মাছের সঙ্গে সেদ্ধ আলুর আস্তর দেওয়া একটা ব্যাপার নিয়ে আগাফিয়া ব্যস্ত। একটা মস্ত পাইনগাছের নিচে নিয়ে আসা হয়েছিল বড়ো টেবলটা। তাতে টেবল ক্লথ পাতছিল কাতিয়া আর আন্দ্রেই। নাদেজদা ত্রফিমোভনা তার দশবছরের ছেলে বরিসকে নিয়ে চান করতে গেছে বনের মধ্যেকার সরোবরটায়, আর নাদেজদার ছোটো ছেলের সঙ্গে ত্রফিম আধভাঙা ইঁট নিয়ে ব্লাস্ট ফার্নেস গড়ছিল।

আগাফিয়া এতক্ষণ চুপ করে ছিল, ত্রফিম ও দারিয়ার এই সাক্ষাৎকারটা সম্বন্ধে ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত টেনে সে বললে:

'বাদামের মতো কঠিন হলেও ভেতরটা কিন্তু নরম।'

'কী বলছিস তুই,' জিজ্ঞেস করল দারিয়া।

'বলছি তোর মনটার কথা।'

'নারে আগাশা, মোটেই তা নয়...' আপত্তি জানাল দারিয়া, 'শুধু সে কথায় এখন আর লাভ কী, খোলস যখন ভেঙে গেছে, ভেতরের শাঁসটা খেয়ে গিয়েছে বছরের পর বছরে।'

'তা বটে,' সায় দিল আগাফিয়া, তারপর দারিয়ার মতোই ফের ডুবে গেল চিন্তায়।

ছোটো নাতিটির খুশির হাসি শোনা গেল। পাইনগাছের শুকনো মোচাগুলো দিয়ে ব্লাস্ট ফার্নেস জ্বালিয়ে তুলেছে ত্রফিম।

এমনটা সত্যিই হতে পারত, ভাবল দারিয়া। শান্ত আনন্দে, নাতিনাতনিদের নিয়ে বার্ধক্য কাটাতে পারত ও। দারিয়ার মতোই বুড়ো বয়সটা সে ভরে তুলতে পারত হাসিখুশি ছেলেমেয়েদের নিয়ে, ওদের সুখে সুখী হয়ে উঠতে পারত।

"দিদিমার বনে" এই অচেনা লোকটার অভ্যুদয়ের জটিলতা কিছুই জানার কথা নয় চারবছরের সের্গেইয়ের। অমন ধোঁয়া ওঠা খাঁটি ব্লাস্ট ফার্নেস যে লোকটা বানাতে পারে তার প্রতি সে বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এ ছেলেটা তার মায়ের মতো দেখতে, শুধু এটা সে জানত না পাইপ থেকো মোটা যে দাদুটা তার সঙ্গে তক্ষুণি ফার্নেস-ফার্নেস খেলায় মেতেছে, তার সঙ্গে তার নিজের চেহারার মিল কতখানি।

দশবছরের বরিসের সঙ্গে তার মায়ের চেহারার মিল ছিল না, ত্রফিমের মনে হল ও ছেলেটার ঝাড় আলাদা — ত্রফিমের দিকে সে গোমড়া মুখে তাকাল। বোঝা যায় সবই জানে সে। ছোটোটা কিন্তু কিছু না ভেবেচিন্তেই ত্রফিমের সঙ্গে জুটে গেল, জানত না তার বকবকানি দিয়ে, তার গাঢ় উৎসুক চোখে তার দিকে চেয়ে, তার বড়ো বড়ো হাতে নিজের হাতের ছোঁয়া দিয়ে কী অজানা অনুভূতি সে জাগিয়ে তুলছিল লোকটার মধ্যে।

হ্যাঁ, এ তার নাতি, তার সাঁচ্চা, আসল নাতি। তার জন্যে অন্য সবকিছু ভোলা যায় ...

ত্রফিমের যে হৃদয় কোনো দিন পিতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য বোধ করেনি তা যেন অবারিত হয়ে উঠল আর কাদামাখা ভোঁতা বুট পরে সেরিওজা এসে ঢুকল সেখানে... এল, যেন চিরকালের মতো।

দুনিয়ায় তার যা কিছু আছে, যা কিছু বাকি, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠল বাচ্চা সেরিওজা। দুনিয়ার যেখানেই থাক ত্রফিম, একথা তার জানা থাকবে যে তার একটি নাতি আছে। অন্য দুটিকে সে ধরে না। ওকে দেখার আগেই ওর সম্বন্ধে খারাপ কথা জানা হয়ে গেছে ওদের।

"আসল" ব্লাস্ট ফার্নেসটা ধোঁয়া ছাড়ছিল পুরা দমে। অনবরত জ্বালানির জোগান দিয়ে চলতে হবে। কিন্তু পাইনগাছের তলা কুড়িয়ে সে জ্বালানির জোগান একা সের্গেই দিয়ে উঠতে পারছিল না। আরো জ্বালানির দরকার। ত্রফিমকে সাহায্যে নামাতে চাইল সের্গেই। কিন্তু কী বলে ডাকবে না জানা থাকায় জিজ্ঞেস করল:

'কী বলে তোমায় ডাকে?'

এ প্রশ্নে ভয় পেল ত্রফিম। সের্গেইও ওকে ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ বলে ডাকবে এটা সে চাইল না। কিন্তু ওকে দাদু বলে ডাকুক একথাও বলা চলে না, ভয় হল এতে ছেলেটার সঙ্গে হয়ত ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে ওর। তাই বলল:

'আমায় গ্র্যান্ড-পা বলে ডাকিস, সেরিওজা।'

'গ্র্যান্ড-পা — এ আবার কী নাম?' ফের জিজ্ঞেস করলে সেরিওজা।

'হ্যাঁ, গ্র্যান্ড-পা — চেনা ছেলেছোকরারা সবাই আমায় ঐ নামে ডাকে।'

দাদুর ইংরেজি "গ্র্যান্ড-পা" কী সে সম্বন্ধে সেরিওজা আর কিছু জিগ্যেস না করে ত্রফিমের কানে সুমধুর এই ডাকেই ডাকতে লাগল তাকে। আর দারিয়া যখন জিজ্ঞেস করল:

'"গ্র্যান্ড-পা" আবার কী?'

ত্রফিম মৃদু হেসে বললে, 'ফার্নেস মিস্ত্রি।'

'তাই নাকি?' সন্দেহভরে জিজ্ঞেস করল দারিয়া।

'হ্যাঁ, দিদিমা হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমর্থন করল কাতিয়া। তার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে শেখা পরিচিত শব্দটা মনে পড়েছিল তার।

'নয় তাই হল,' বিশ্বাস করল না দারিয়া। কাতিয়াকে পাঠাল মাকে ডেকে আনতে: খাওয়ার সময় হয়েছে।

অচিরেই মস্ত পরিবারটা বসল টেবল ঘিরে।

এবার ত্রফিম ভাবল এমনটাই হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু কার দোষ? দাদু দিয়াগিলেভের দোষ, যে ত্রফিমকে ছিনিয়ে এনেছিল তার পিতৃগৃহ থেকে, দুনিয়া টাকার বশ এই ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিল তার মনে? কারখানা-মালিকের ছেলেটার দোষ, যে তাকে বুঝিয়েছিল বলশেভিকরা রাশিয়া ধ্বংস করতে চায়? নাকি অপরাধ তার নিজের, লালেরা লোকের সুখ এনে দেবে বাপের একথা, ছোটো ভাই পিওতরের একথা যে বিশ্বাস করেনি? এতে তো সন্দেহই নেই যে সে নিজেই নিজের ভাগ্যকর্তা, কলচাক সৈন্যদলে নাম না লিখিয়ে তার আদরের দারিয়ার সুপরামর্শ শুনে উত্তরে যদি সে পালাত, যেখানে তখনো পর্যন্ত কোনো রকম সরকারই ছিল না, তাহলে, বাধা দেবার তো কেউ ছিল না। শাদাদের ফাঁসে নিজেকে না জড়িয়ে সেখানে সে তো মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে পারত।

ত্রফিম তা করেনি। বিশ্বাস করেনি "কমিউনে"। এখনই কি ও বিশ্বাস করে তাতে, যখন এমন চমৎকার চালাচ্ছে "এরা"?

'নাও, খেতে বসো বাপু ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, কী ভাবছ অত,' প্লেটে কোদালের মতো চওড়া একটা মাছ দিয়ে বললে দারিয়া। 'যতই ভাবো নতুন আর কী দাঁড়াবে, এদিকে মাছটা যাবে ঠাণ্ডা হয়ে...'

দারিয়া তার ভাবনাটা আঁচ করেছে এতে অবাক হল না ত্রফিম। সেও সেটা লুকাল না। কী হবে লুকিয়ে। ও তো এখন পরপারের এক লোক। জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে শুধু, আসলে দারিয়ার কাছে, নাদেজদার কাছে, সকলের কাছে সে মৃত... হয়ত বা কেবল সেরিওজার কাছেই সে বাঁচা। বাকিদের কাছে সে গতায়ু। তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই কারো।

এই সিদ্ধান্তে এসে ত্রফিম বলল:

'মরা লোকেদের বেঁচে থাকাটা খারাপই বটে।'

'হ্যাঁ, বাঁচা লোক যদি নিজেকে মরা ভাবে তবে সেটা আরো খারাপ,' কথার পিঠে কথা চালিয়ে গেল দারিয়া স্তেপানোভনা।

ত্রফিম চাইল দারিয়ার দিকে, বুঝল তার "জ্ঞানগর্ভ" কথায় চিড়ে ভিজবে না, তাই চুপ করে চওড়া মাছটায় কাঁটা বসাল।

৩৭

আশেপাশে কোথাও একটা ঝড়বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বাতাস তাজা হয়ে উঠল খানিকটা। নীরব প্রাতরাশের পর সবাই এদিক ওদিক চলে গেল, রইল কেবল দারিয়া আর ত্রফিম। দারিয়ার তাতে আপত্তি দেখা গেল না।

দেখা যখন হয়ে গেছে তখন আজ হোক কাল হোক কথা কয়ে তো নিতেই হবে। তবে আর পিছিয়ে লাভ কী?

পাইনগাছের নিচের ওই বড়ো টেবলটাতেই বসে রইল ওরা। এ ধারে ত্রফিম, ওধারে দারিয়া।

'বলে ফ্যালো তাহলে, কীভাবে শপথ পায়ে মাড়ালে, পালিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে জ্যান্তে মরা বনলে?'

'ভগবানের কাছেও আমার লুকোবার কিছু নেই, তোর কাছেও নেই। ভগবান যেন বা আমায় মাতৃগর্ভেই অভিশাপ দিয়ে রেখেছিলেন, আমার শুরুটা যে টাকায় কেনা, লোভ জবরদস্তির মধ্যে জন্ম...'

'আদম ইভের কাহিনী থেকে শুরু কোরো না বাপু ত্রফিম... মহা পাপ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই দুপুরের খাওয়ার আয়োজন করতে হবে। তোমার ঐ ধর্মবুলিগুলো ছাড়ো... শুরু করো বরং তোমার দ্বিতীয় বিয়ে এলজা থেকে... বাকিটা সবারই জানা, আমার কানে পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে।'

'সেইখান থেকেই শুরু করছি। বাকিটা তো লিখেই জানিয়েছি। কিন্তু সর্বাধীশ্বরের অভিশাপের কথা না বলে এলজার কথা তুলি কী করে। ওর সঙ্গে আমারও যে শেকলে বাঁধা কুকুরের সম্পর্ক, টাকার বাঁধনে বাঁধা। আগে শোনো সবটা। আমার যেমন আসে তেমনি করেই বলছি, যেটা অপ্রয়োজনীয় মনে হবে, শুনো না।'

'আমাদের ঝাঁটাটা অত বড়ো নয়। ভয় আছে তোমার অত জঞ্জালের জন্যে চলবে না। লোকে বলে, তুমি নাকি কথার তোড়ে ডুবে মরতেও রাজী। নাও, তাহলে শুরু করো তোমার ঐ আমেরিকার কেরজাক গাঁ থেকে, যেখানে একটি বাড়ি সমেত সুন্দরী বিধবা তোমার জুটেছিল...'

'সে কথাও জানো দেখছি...'

'কী করি, কান বন্ধ করে রাখব? পেলাগেয়া তুদোয়েভা দ্বার আমার এখানে চায়ে এসেছিল, "তোমার আত্মার কান্না" সব শ্বনিয়ে গেছে।'

'কান্নাই বটে। আর এখন তা থেকে চোখ ফেটে রক্ত বেরচ্ছে।'

'থাক, চোখের জল আর ফেলো না... ভালোবেসেই তো প্রায় চল্লিশ বছর তার সঙ্গে কাটিয়েছ। তোমায় শেকলে বাঁধলে কী দিয়ে?'

'তা ঠিকই। টোপটা চোখে ধাঁধা লাগাবার মতোই। তাছাড়া, তখনো তিরিশে পড়তে আমার অনেক বাকি। শোনো বলি। যা দাঁড়াল, কেরজাক গাঁয়ে গিয়ে পড়ি, ভাবলাম, এই সবচেয়ে ভালো। যাই হোক, দেশে তো আর ফেরা হচ্ছে না। এও ভাবলাম, তুমিও বেশি দিন বিধবা থাকবে না... আর্তিওম ইভোলগিন তো অনেকদিন থেকেই তোমার ওপর চোখ রেখেছিল...'

'আর্তিওমের কথা উঠছে না,' বাধা দিল দারিয়া। 'ওর কথা পরে শোনাব যদি তুমি শোনার যোগ্য হও।'

'আমি শ্বধ্ব ওটা কথার কথা হিসেবে... তোমায় আঘাত দেবার জন্যে বলিনি,' কৈফিয়ৎ দিল ত্রফিম। 'আর মার্ফা — যাকে কেরজাকেরা আমার জন্যে পছন্দ করে রেখেছিল, সেটি একেবারে পটের স্বন্দরী, জ্বলে কিন্তু পোড়ায় না, কিন্তু হলে কী হবে, আমার জন্যে সে নয়। লেখাপড়া জানত না। সাজের ছিরি ছিল না। ম্বখে কথা নেই। মনেই হত না যে আমেরিকায় জন্মেছে। জন্মেছে কোন ভূতের ডেরায়... কিন্তু আগ্বন কী, যেমন দেহে, তেমনি চোখে...'

'ভালোই জহ্বরী দেখছি,' টিপ্পনি কাটল দারিয়া।

'কিন্তু শাংহাই, সে একটা ফুর্তির শহর। এখন কেমন জানি না, তখন সেখানে দ্বনিয়ার হরেক লোক গিয়ে জ্বটত। অনেক দেখেছি। মার্ফা আমায় ভালোইবাসত। নিজ ম্বখেই সে কথা বলেছিল, ঘরের কর্তা হতে ডাকে... আমি ক্ষেত মজ্বর — সে অবস্থায় এ ডাক ফিরিয়ে দেওয়া হাস্যকর। তব্ব ভেবে চিন্তে তবে তো কথা খসাতে হয়। একবারের আদর অমনি শতবছরের বাঁধন। কেরজাকরা তোমায় সাগরের তল থেকে তুলে এনে ওর ঘরে পোঁছে দেবে। মন ঠিক করছিলাম... কখনো অজ্বহাত দিই লেণ্ট পরব, কখনো বলি তোর স্বামী সংসারের স্বখ ভোগ না করেই বিয়ের তিন দিনের দিন এক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল। এখনো তার বছর পের্বল না। মার্ফা যে না বিধবা, না কুমারী, না বিয়ে করা স্ত্রী। মার্ফা কিন্তু কিছ্বই কানে তোলে না... যখনই

আমায় দেখে … বুকে মাথা রেখে বলে, "দোহাই তোর ত্রফিমুশকা … বিয়ে না করিস, আমায় এমনি রাখ, আগুনে পোড়ালেও কারো কাছে স্বীকার করব না … আমায় বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরব না।" '

'দ্যাখো তোমায় কী ভালোবেসেছিল মার্ফা,' দরদের সঙ্গে বলল দারিয়া, 'বেচারা মেয়েটার ওপর তোমার কোনো করুণাও হল না …'

'করুণা হত, কিন্তু এলজা এল। দুই ঘোড়ার জুড়ি গাড়ি চেপে … তখন ফোর্ড গাড়ির চল সবে শুরু হচ্ছে। এল, এসে আমায় নিয়ে গেল …'

'নিয়ে গেল কী? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?'

'কী ভাবো দারিয়া … যাকে খুসি তাকেই নিয়ে যেতে পারে সে। শয়তান মাগী। স্পেনিশ রক্তের সঙ্গে আধা জার্মান রক্ত। নাকের ফুটো কাগজের মতো পাতলা। দিয়াগিলেভের ঘোড়ার মতো ঘাড়। বড়ো বড়ো পাকের নীলচে বাদামী চুল, মুখ ভর্তি দাঁত, বরফের মতো শাদা শাদা। চোখ যেন টর্চের মতো। টান টান চাপা ঠোঁট। ছোটো মুখ। সরু, লম্বা লম্বা ছটফটে পা … ওকে দেখা মাত্রই আমি … একেবারে ঘায়েল। চোখ বন্ধ করে ফেললাম, যেন সূর্যের দিকে তাকিয়েছি …'

একটু থামল ত্রফিম, বোঝা গেল দূর অতীতটায় সে চলে গেছে। দারিয়া স্মরণ করিয়ে দিল:

'আর ও কী করল?'

'ও আর কী করবে, ওর বরার্ট তো তখন পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে আর আমি একেবারে তাজা জোয়ান … মাঠে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, ওর ওই জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললে, "সর্ত টর্তের কথা থাক, যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে আমি জানি …" '

'তাই বললে।'

'তাই বললে … বলে আমায় ঠেলে নিয়ে গেল গাড়িতে, যেন আমি একটা ঘোড়া। মরশুমের জন্যে বাকি যে সব মজুরদের ও ভাড়া করেছিল, তারা গেল পায়ে হেঁটে। আমরা দুজনে রাতও কাটালাম … না, এটা প্রেম নয় দারিয়া, এ হল নেশা। সংসার এখন আমার কাছে ফাঁকা। নিজের দিকে চেয়ে দেখি, যেন একটা অন্য লোক। তোমায় মিছে করে বলবার কিছু নেই। ওটা প্রেম ছিল না। হয়ত প্রেম হতে পারত, কিন্তু তার সময় হল না। দুপুরে এলজা

এসেছিল কেরজাক গ্রামটাতে, আর রাত দুপুর হতে না হতেই গাছের ঝাড়ে শুধু মোজা পরে নাচতে শুরু করল আমার সামনে... সত্যিই বলি, তেমন নাচ আমি কখনো দেখিনি, আর দেখবও না। সত্যিই বলছি, আমার দারিয়া ছাড়া আর কাউকে আমি ভালোবাসিনি... এটা নেহাৎ অমায়িকতার কথা নয়। তাকে আমি ভালোবেসেছি আমার প্রেমের প্রথম প্রহর থেকে আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ভালোবেসেও যাব। তুমি এ কথায় কান দিয়ো না দারিয়া... তোমাকে আমাকে নিয়ে একথা নয়... বলছি যে দুটি মানুষের কথা, তারা এখন আর নেই...'

ত্রফিম ফের চুপ করল। বাড়াবাড়ি থাকলেও দারিয়ার কাছে কাহিনীটা মনে হয়েছিল সত্যি, আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সে — গল্প চালিয়ে যাবার কথা সে আর ত্রফিমকে স্মরণ করিয়ে দিল না। এমন সময় লোকের গলা শোনা গেল।

মায়ের সঙ্গে তার নাতিরা ফিরছে।

দুপুরের খাওয়ায় আপত্তি করল ত্রফিম, অনুমতি চাইল মিতিয়াগিন ডাঙ্গায় ফের আর একবার আসবে।

দারিয়া বলল:

'এত দূর হেঁটে পা ব্যথা করে কী হবে? কাল বাখরুশিতে ফিরে যাব ঠিক করেছি। সেখানেই দেখা হবে। পাঁচ জনের সামনে।'

ভালোমানুষ আন্দ্রেই লগিনভ ত্রফিমকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইল। আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে মোটর বাইকে যাবার জন্যে মা ও দিদিমার অনুমতি চাইল কাতিয়া।

'আমিও যাব, আমিও যাব,' জেদ ধরল সের্গেই। 'গ্র্যান্ড-পা আমায় কোলে নিয়ে বসবে... ঘড়ির শব্দ শুনব গ্র্যান্ড-পার। গ্র্যান্ড-পা, নিয়ে চল আমায়...'

'তুই এখন দিদিমার হাতে, দিদিমাকে জিজ্ঞেস কর সেরিওজা,' হুকুমের স্বরে বলল নাদেজদা ত্রফিমোভনা।

'যেতে চাচ্ছে যাক,' মত দিল দারিয়া স্তেপানোভনা।

সঙ্গে সঙ্গে সাইড কারে ত্রফিমের কোলে গিয়ে উঠল সেরিওজা।

মোটরসাইকেল স্টার্ট নিলে দারিয়া একান্ত আপন জনের মতো আন্দ্রেইকে বললে:

'খানাখন্দ দেখে সামলে চলিস। আমার ছোটো নাতিটিকে তোর জিম্মায় দিলাম। তোর কাছ থেকেই ফেরত নেব।'

আন্দ্রেইও তেমনি সাদামাটা আন্তরিকতার সুরে জবাব দিল:

'সে ভরসা রাখতে পারেন দারিয়া স্তেপানোভনা।'

মোটরসাইকেল ছেড়ে দিল। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সেরিওজা। হাততালি দিল। ত্রফিম ওকে ধরে রাখল নিজের কাছে...

কী ক্ষুব্ধই না হবে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। আপন দাদু না হলেও সে সের্গেইকে ভালোবাসে নিজের নাতির মতো। ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল দারিয়া।

৩৮

'কী আফশোস, কী আফশোস! সময়, টাকা ও এমন একটা সুযোগ — সব নষ্ট!.. মস্কোয় আমেরিকাকে দেখাবার এমন সুযোগ!' বনের মধ্যের একটা ফাঁকায় ক্যাম্প ফায়ার জ্বালাতে জ্বালাতে মার্কিন প্রদর্শনীর ব্যাপারে বিলাপ করল টেনর।

মার্কিন অতিথিটির কথা ফিওদর পেত্রভিচ স্তেকোলনিকভ ভোলেনি। আজ রবিবারে তাকে নেমন্তন্ন করেছে দূর শুতিওমির বনে ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহের জন্যে।

ব্যাঙের ছাতার সংগ্রহটা বেশ মোটা রকম হয়েছে এমন নয়, কিন্তু ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা বাখরুশিনা এবং নাদেজদা নিকোলায়েভনা স্তেকোলনিকভা আমেরিকান অতিথিকে ব্যাঙের ছাতার উরালী সুপ খাওয়াবার কথা দিয়েছে।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বাড়ি থেকে নানা ধরনের প্রচুর খাদ্য নিয়ে এসেছিল, ঘাসের ওপর টেবল ক্লথ পেতে তা সাজান হল। সাজালে এইটে মনে রেখে যে মার্কিন টেলিভিজনের জন্যে টেনর হয়ত তার ছবি তুলে নেবে।

এত খাদ্য যে বেশ বড়ো তিনটে পরিবারের এক সপ্তাহ চলে যাবে তাতে।

এ দেখে মজা লাগল টেনরের, মার্কিন প্রদর্শনীর কথা চালাতে চালাতে সে বলল:

'ফিওদর, দ্যাখ, দ্যাখ ফিওদর, দ্যাখ কেমন ক্ষুদ্রাকারে মার্কিন প্রদর্শনীর ভুলটা করে বসেছে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ... এই ক্যাভেয়ারের আধখানা শেষ করতে হলে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যকে বড়ো বড়ো চামচ দিয়ে সুসজ্জিত করতে হবে... না ফিওদর, আমি চিরকাল বলে যাব, পরস্পরকে বোঝার সেরা উপায় হল সত্যি।'

বাখরুশিন রসিকতা করে উত্তর দিল:

'এসব আমি সাজিয়েছি সত্যির জন্যে নয়, ত্রফিমের জন্যে। ও যদি এসে পড়ে তাহলে এতে চলবে না'...

এতে একটা হাসি উঠল। সবাই জানত ত্রফিম কী পরিমাণ খেতে পারে, কীরকম ভালোবাসে খেতে।

'তোমাদের কাগজগুলো না হয় খানিকটা প্রচারধর্মীই, — হ্যাঁ, প্রচারধর্মী না হয়ে পারে না,' বলে চলল টেনর। 'কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কাগজগুলো ঠিকই লিখেছে। আমেরিকান প্রদর্শনীতে আমেরিকা নেই। আমেরিকা — সে হল নিপুণ লেদমেসিন, কনভেয়র, ইস্পাৎ... দুনিয়ায় এবং আমেরিকায় যেটা সবচেয়ে প্রধান কথা সেই শ্রম জিনিসটা কোথায়? শ্রম যা সবেরই স্রষ্টা... পেপসি কোলা, চুইং গাম থেকে ওয়াল স্ট্রিটের বিলিয়ন — সব। নাচ? ফ্যাশন? ক্রিস্ট্‌মাস ঘর? এ যেন সেই খাওয়ার টেবলে কালো ক্যাভেয়ার আনা হচ্ছে বালতিতে করে। আমাদের সত্যি কথা বলা উচিত ফিওদর। সত্য হল সবচেয়ে ভালো অস্ত্র।'

'আমারও তাই মত, জন,' অগ্নিকুণ্ডটায় কিছু বার্চছাল দিয়ে বললে স্তেকোলনিকভ।

বার্চছাল ফটফট শব্দ করে আগুন জ্বালিয়ে তুলল। টেনর বলল:

'অভিজ্ঞতার বিনিময়। গ্র্যান্ড আইডিয়া! অভিজ্ঞার বিনিময় আমাদের করতেই হবে অন্তত ক্যাম্প ফায়ার জ্বালাতে হয় কী করে সেটুকু শেখার জন্যেও। মিঃ খ্রুশ্চভ খুবই সঠিক, খুবই ঠিক কথা বলেছেন তিনি ফিওদর। আমেরিকায় আমি নিশ্চয় ওঁর সঙ্গে দেখা করব, দেখা করে রুশীতে বলব উনি কত সঠিক... আমি আমেরিকাকে না ভালোবেসে পারি না ফিওদর। এটা আমার দেশ... টেনররা হল ইয়াঙ্কি। যদি সাইবেরিয়ার ভাষায় বলতে হয় তবে টেনররা হল আমেরিকার "চালদোন", আদিবাসী... আমেরিকা — এ হল

উৎপাদনশক্তির জন্মভূমি। উৎপাদনশক্তি — বিশ্বের কাছে এই হল আমেরিকার খ্যাতি এবং এই তার লজ্জা। আজকের আমেরিকার উৎপাদনশক্তি একটা স্কাই-স্ক্র্যাপারের মতো, নিজের বনিয়াদ ঘায়েল করে যে আকাশে মাথা তুলছে... কথাটা বুঝলি ফিওদর, নাকি বুঝলি না!'

'না বোঝার কী আছে, জন, বেশ বুঝছি।'

'মানে বনিয়াদ — এটা হল তার জনসাধারণ... মহান, চমৎকার, উদ্ভাবনশীল তার জনগণ। এই জনগণই নিজের শ্রমভার লাঘব করে বানিয়ে তুলছে অটোমেটিক মেসিন, গুরুভার কাজ থেকে মুক্তি চাইছে... কিন্তু মুক্তি সে পাচ্ছে একেবারে সমস্ত কাজ থেকেই, হয়ে পড়ছে বেকার, বঞ্চিত হচ্ছে নিজের টেকনিকাল প্রতিভার ফল থেকে। আমেরিকার টেকনিকাল সমৃদ্ধির এই হল মহা ট্রাজেডি। বনিয়াদ ছাড়া বাড়ি যে দাঁড়াতে পারে না।'

'জন, আজ তুই যুক্তি দিচ্ছিস কমিউনিস্টের মতো। ভয় পাচ্ছিস না তো, তোর একথা আমি কোথাও হয়ত উদ্ধৃত করে দেব, আমেরিকায় গিয়ে তুই শেষে মুশকিলে পড়বি?' সপরিহাসে সতর্ক করে দিল স্তেকোলনিকভ।

টেনর বললে:

'সে ক্ষেত্রে তোকে আরো দশ কোটি আমেরিকানকে কমিউনিস্ট বলতে হবে। একথা কেন ভাবছিস ফিওদর যে পুঁজিবাদের সমালোচনা করলেই সে কমিউনিস্ট হবে?'

'নিশ্চয় হবে, এই আমার ধারণা। সে লোক যদি ভয় পেয়ে নিজেকে কমিউনিস্ট বলতে না চায়, অথবা যদি নাও জানে যে সে কমিউনিস্ট, তাহলেও। আমার বাপের বেলায় তাই ঘটেছিল। কমিউনিস্ট ধারণাগুলো একান্ত কমিউনিস্টদেরই একচেটিয়া নয়। এককালে লিখিত ভাষা যেভাবে উঠেছিল, এ ধারণাগুলোও ঠিক তেমনি স্বাভাবিকভাবেই উঠছে। মানুষ, অথবা সঠিকভাবে বললে মানব সমাজ চিরকালই আরো উন্নত, ন্যায়সঙ্গত জীবন বিন্যাসের জন্যে চেষ্টা করে এসেছে... তাই নয় কি জন?'

'তা বটে, কিন্তু কী প্রমাণ হল তাতে?'

'এ থেকে প্রমাণ হয় যে একমাত্র ন্যায্য জীবন বিন্যাস হল সেইটে যেখানে প্রত্যেকটি লোকের সমান ও সর্বোচ্চ গ্যারাণ্টিকৃত অধিকার থাকছে জীবনে, থাকছে সমস্ত সুখ ও সমৃদ্ধি উপভোগের সমান সুযোগ, যেখানে মানুষের

চেতনা তাকে সকল লোকের ভাই ও বন্ধু করে তুলেছে। এই রকম ধরনের জীবনকেই বলে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বা কমিউনিজম। আমেরিকা মার্কস. লেনিন থেকে, মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও, আমেরিকানরা ঘুণাক্ষরেও কখনো কমিউনিজমের কথা না শুনলেও তারা ঠিক ঐ পথেই যাবে। সমাজবিকাশের বাস্তব নিয়মটাই তাই। এ হল ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, জন।'

'না, হে কমরেড জেলা কমিটি সেক্রেটারি, এটা প্রপাগান্ডা। এটা হচ্ছে ফ্যানাটিসিজম... জিনিসটাকে আমি সম্মান করি,' বুকে হাত রাখল টেনর। 'তোদের মতো জাতিকে হিংসা করতে পারি আমি... কিন্তু কেন এই সামাজিক বিকাশের বাস্তব নিয়ম বহির্ভূত হয়ে দাঁড়াল আমেরিকা?.. কমিউনিস্ট অনিবার্যতা কেন পাশ কাটিয়ে গেল আমেরিকাকে?'

'প্রতিটি দেশেই সমাজবিকাশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সমাজচেতনার স্বকীয় গতিবেগ থাকে,' উত্তর দিল স্তেকোলনিকভ।

'এটা একটা খুবই সাধারণ জবাব ফিওদর,' টেনর বলল, 'এতই সাধারণ যে এটা জবাব হল না। আমেরিকায় আছে বিশেষ এক ধরনের গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ — সেইখানেই তার শক্তি।'

'গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ?' অগ্নিকুণ্ডের কাছে এগিয়ে এসে সশব্দে জিজ্ঞেস করল বাখরুশিন। 'বিশেষ রকমের পুঁজিবাদ? চিরন্তন পুঁজিবাদ?'

'সে কথা আমি বলছি না পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ... এ পুঁজিবাদে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু এমন দুর্ঘটনা নয় যাতে তার মরণ ঘটবে, সে দুর্ঘটনায় বরং তার পুনর্জন্ম হবে।'

'কী সে পুনর্জন্ম? হয়ত বা সমাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদে?'

'হয়ত সমাজতান্ত্রিক,' টেনর পুনরাবৃত্তি করল। 'মার্কিন পুঁজিবাদে সমাজতান্ত্রিক উপাদান তো এখনই রয়েছে...'

টেনরের পাশে উবু হয়ে বসল বাখরুশিন। তার কাঁধে হাত দিয়ে একান্তই বন্ধুর মতো জিজ্ঞেস করল:

'প্রিয়বর মিঃ টেনর, একথা আপনি কি সত্যি সত্যিই বলতে চান? আপনি যে কিনা অত কিছু বোঝেন, ধরতে পারেন...'

এই সময় এসে হাজির হল ত্রফিম আর তুদোয়েভ। আলাপ ছিঁড়ে গেল। ত্রফিম সরাসরি বলতে শুরু করল দারিয়া স্তেপানোভনার সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা। জানাল:

'আমার সঙ্গে দেখা করল, কথা শুনল আমার... নাতি সেরিওজাকেও ছেড়ে দিল আমার কাছে... একেবারে যেন সেই প্রথম জীবনে ফিরে গিয়েছিলাম।'

এতে চটে উঠল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, জানিয়ে দিল ভদ্রতার ধার সে আর ধারবে না, আজকেই সে টেনরের সামনেই সোজাসুজি বলে দেবে ত্রফিম সম্বন্ধে, টেনর সম্বন্ধে কী সে ভাবে।

৩৯

আহার্যের পরিমাণে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ভুল করেনি। দানা ক্যাভেয়ারের পেছনে ত্রফিম তেমনি করে লাগল, যেমন করে শুয়োর লাগে ঘ্যাঁটের পেছনে। ত্রফিমের লোমশ হাতখানা তার মুখ থেকে ক্যাভেয়ারের পাত্র পর্যন্ত কী দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করছে, এমন কি একগুঁয়ে বোলতাটা পর্যন্ত তার চামচেতে বসবার কোনো অবকাশ পাচ্ছে না, এটা লক্ষ্য না করার চেষ্টা করল বাখরুশিন আর স্তেকোলনিকভরা। এতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল টেনরের। যাই হোক না কেন, ত্রফিম তার স্বদেশীয়। তাছাড়া কালো ক্যাভেয়ার আর রুশী ভোদকার প্রতি আমেরিকানদের আসক্তি নিয়ে ঠাট্টা তামাসা তাকে প্রায়ই শুনতে হয়েছে। তাই ত্রফিমকে সে ইংরেজিতে কী বলল। স্তেকোলনিকভ সবটা না বুঝলেও মোট কথাটা কিছুটা ধরতে পারল: ব্যাঙের ছাতার সুপের জন্যে পেটে কিছুটা জায়গা রাখার পরামর্শ দিচ্ছিল জন। ত্রফিম তাতে রুশীতে বলল:

'যার যেমন খাওয়ার ধাত...'

ক্যাভেয়ার শেষ হবার পর পরিতৃপ্ত ত্রফিম ব্যাঙের ছাতার সুপ না খেয়ে যখন পাইপ ভরতে শুরু করল, টেনর তখন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললে:

'ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ ও বাহাদুর ক্যাভেয়ার-বিজেতা, আমার ধারণা এমন চমৎকার ভোজনের পর যথাযোগ্য মিষ্টি মুখ হতে পারে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের প্রতিশ্রুত সেই ভাষণটা...'

শ্রোতারা টেনরকে সমর্থন করল, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ শুরু করল বলতে।

'বেশ, আপনাদের যা ইচ্ছে,' রাজী হয়ে গেল বাখরুশিন। 'আমারও বিশ্বাস সত্যি কথায় সম্পর্ক নষ্ট না হয়ে তা নিবিড় হওয়াই উচিত। তবে, পারস্পরিক সুসম্পর্কের ইচ্ছে না থাকলে স্পষ্ট কথায় তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে।'

কিন্তু পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে কথা বলতে দেবার আগে মন্তব্য করা দরকার যে খোলাখুলি স্পষ্টোক্তি শুধু এই কালে নয় সর্বকালেই সেই ধরনের সাহিত্যিক রচনার এক আবশ্যিক সহচর, যাতে সমাজজীবনকে দেখানো হয়ে থাকে নায়কদের মারফত।

তাই হুঁশিয়ার করে দেওয়া দরকার যে চল্লিশের পরিচ্ছেদটি হবে একটা মনোলোগ, পড়ে শোনানো সংবাদপত্রের একটা রাজনৈতিক প্রবন্ধের মতো। কিন্তু পরবর্তী ঘটনার গতি এবং ত্রফিম বাখরুশিনের আচরণের কতকগুলি প্রবণতা এতে নির্ধারিত হচ্ছে। তাই ধৈর্য ধরে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কথাটা সমস্ত শোনা ভালো, তাতে পরে অস্পষ্টতা থাকবে না।

হয়ত স্মরণে আছে বাখরুশিনের আভ্যন্তরীণ যে "রিলের" কথা বইয়ের প্রথম দিকে বলা হয়েছিল, বক্তৃতা শুরু করার আগে তা খুব একটা চড়া সুরে সুইচ করা হয়, ফলে মনে হবে যেন সে পিকনিকে একটা সহজ আলাপ করছে না, সামাজিক অভিশংসক বক্তৃতা দিচ্ছে।

শোনা যাক ও কী বলে।

৪০

'আমি এই বলে শুরু করতে চাই মিঃ টেনর... একথা ভাবলে ভুল হবে যে আমরা রাশিয়ানরা, বরং বলি আমার মতো মুজিকরা আমেরিকার জীবনধারা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমার কাছে আমেরিকা হল, বলা যেতে পারে, সেই পুরনো মালেরই পুনরাবৃত্তি, তবে চটকদার মোড়ক। মার্কিন পুঁজিবাদের তুলনায় আমাদের রুশী পুঁজিবাদের চিমনি ছোটো, ধোঁয়া কম ছিল, কিন্তু তাহলেও ধোঁয়ার ঝাঁঝটা, চিমনির কালিটা একই।'

তন্দ্রাতুর ত্রফিমের দিকে চেয়ে বাখরুশিন বলল:

'আজকে আমার বক্তৃতাটা তোর জন্যেই ত্রফিম, প্রধানত তোকে উদ্দেশ করে।'

তারপর মাঠে উপবিষ্ট সকলের উদ্দেশে ফের শুরু করল:

'আমি আমেরিকায় যাইনি। এই বৃহৎ দেশটায় আমার এবং দারিয়া স্তেপানোভনার যাওয়া হয়ে ওঠেনি এমন কতকগুলো কারণে যা আমার আয়ত্তে ছিল না, কিন্তু আমেরিকা সম্বন্ধে আমার ধারণাটা আমি শুধু কাগজ থেকে বা সিনেমা থেকেই গড়ে তুলিনি। আমাদের লোকেরা আমেরিকায় খুব বেশি দিন না কাটালেও সে সম্পর্কে ত্রফিমের চেয়ে অনেক বেশি অনেক স্পষ্ট করে বলেছে, অথচ ত্রফিম সেখানে আছে আজ চল্লিশ বছর। ও যেন এক মস্ত জাহাজের খোলের মধ্যেকার যাত্রী, সে জাহাজ সম্পর্কে এইটুকু ছাড়া আর কিছু সে বলতে পারে না যে পাথুরে কয়লাগুলো খুব ভারি আর কালো।'

হালকা একটা মেয়েলি খিলখিল শোনা গেল, তার সঙ্গে টেনরের হোহো আর বুড়ো তুদোয়েভের কাসিভরা হাসি।

পুরোপুরি তন্দ্রা ছুটে গেল ত্রফিমের।

'আমার বস্ত্রহরণ করবি ঠিক করেছিস তাহলে?' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে জিজ্ঞেস করল সে।

'নগ্নের বস্ত্রহরণ করা সম্ভব কি?.. চাই তোর নিজের নগ্নতা ও মানবিক দৈন্যটা যাতে তোর দৃষ্টি গোচর হয়। সবসময় পোষাক পরলেই লোকে ভূষিত আর পোষাক না পরলেই নগ্ন হয় না। ওই তোর কোটটার কথা ধর। সুন্দর কোট — পুরোটা উল না হলেও বেশ সুদৃশ্য, পোষাকী। কিন্তু ও কোট কি তোর?'

ত্রফিম হেসে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল এক ঝাঁক মশার দিকে।

'কার তবে? ভাড়া করে তো আনিনি?'

'ঠিক ওই ভাড়া করেই এনেছিস। তোকে এটা পরতে দেওয়া হয়েছে,' একেবারে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা করল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। 'তুই এটা সাময়িকভাবে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছিস, যেমন তোর ফার্মটার বেলায়, যেটা মনে ভাবিস তোর নিজের।'

'তুই হয়ত বলতে চাইছিস পিওতর, দলিলপত্রে ফার্মটার মালিক এলজা, ইচ্ছে করলে সে আমায় দরজা দেখিয়ে দিতে পারে।'

'না ত্রফিম,' জবাব দিল বাখরুশিন। 'দলিলপত্রে ফার্মটা কার নামে আছে সেটা আমার যুক্তি নয়। আমি বলতে চাই, ফার্মের মতো অন্যান্য আরো অনেক জিনিস পুঁজিবাদী দেশে ব্যক্তিগত বলে ধরা হলেও তা কেবল মালিকানার ভাব করে আসলে ভাড়া নেওয়া।'

'কী যে সব জ্ঞানের কথা তুই বলতে শুরু করেছিস, পিওতর ...'

'আমিও আপনার কথা বুঝছি না পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ,' শোনা গেল টেনরের গলা।

'যদি বুঝতে চান তবে বুঝতে পারবেন।' বাখরুশিন জবাব দিয়ে সকলের উদ্দেশে বললে, 'ত্রফিমের ফার্ম জিনিসটা কী? এটা একটা ছোট্ট পুঁজিবাদী উদ্যোগ যেখানে কয়েকগণ্ডা বারোমেসে বা মরশুমী মজুর খাটায় ত্রফিম। খাটায় একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে তাদের কাজের যতটা সম্ভব বেশি অংশ নিজে দখল করে তা টাকায় পরিণত করবে। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, তাই!' সায় দিল টেনর।

'লাভই যদি না মিলবে তবে লোকে ফার্ম চালাবে কেন?' সমর্থন করল ত্রফিম।

'তার মানে ফার্মার ত্রফিম ছোটো হলেও একজন পুঁজিপতি ও শোষক,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ চালিয়ে গেল।

'কিন্তু ও তো নিজেও মেহনত করে,' আপত্তি করল টেনর।

'হ্যাঁ, আমি তো হাত গুটিয়ে বসে থাকি না,' ফের টেনরের সঙ্গে যোগ দিল ত্রফিম।

বাখরুশিন বলল:

'ব্যাঙ্ক-মালিক বা কোনো একটা ফ্যাকটরি-মালিকও কি হাত গুটিয়ে বসে থাকে? ওদেরও কি কিছু না কিছু করতে হয় না, কারবার কি করে চালাতে হবে তা নিয়ে ভাবতে হয় না?.. কিন্তু যে মুনাফা সে লোটে, এ কাজটুকু কি তার সমতুল্য? যত কর্মিষ্ঠ ব্যাঙ্কারই সে হোক, তার রোজের দাম পঞ্চাশ লাখ ছেড়ে দাও লাখ দশেক ডলারও কখনো হতে পারে না ... আপনি আরো সঠিক বলতে পারবেন মিঃ টেনর, কে কার ঘাড় ভেঙে প্রতিদিন কত লাখ করে পায় ... কিন্তু কথাটা তা নয়, বলছিলাম ত্রফিমের ফার্মটার কথা, যেটা ও সম্পত্তি রূপে আসলে ভাড়া পেয়েছে। ভাড়া দিয়েছে তারা যারা সবকিছুর প্রভু, দেশের

মালিক। দিয়েছে এই অলিখিত সর্তে যে সে মজুরদের কাছ থেকে যথা সম্ভব নিঙড়ে নেবে পুঁজিবাদী ধারার জীবনযাত্রার নিয়ম অনুসারে। যথাসম্ভব নিঙড়ে নিয়ে তা টাকায় পরিণত করবে এবং পরিণত করে তা দিতে হবে তাদের যারা আধিপত্য করছে দেশে; আর নিজের জন্যে, ত্রফিমের জন্যে থাকবে শুধু সেইটুকু মুনাফা যাতে সে নিজেকে মালিক বলে বোধ করতে পারে।'

'আগুন যেন পুরো দমে জ্বলতে শুরু করেছে,' স্তেকোলনিকভকে ফিসফিস করে বলল টেনর। 'পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে আজ আমি দেখছি নতুন আলোয়।'

'নিজের ফার্মের ব্যাপারে তুই কি স্বাধীন ত্রফিম?' জিজ্ঞেস করল বাখরুশিন, 'উত্তর দিতে হবে না, আমি নিজেই উত্তর দিচ্ছি, কারণ তোর কারবার আমি চোখে না দেখলেও আমার কাছে সেটা তোর চেয়ে বেশি পরিষ্কার। না, নিজের কারবারে তুই স্বাধীন নোস, যেমন মিঃ টেনর তাঁর নিজের "ফার্মটাতে" স্বাধীন নন, শাদা কাগজ আর টাইপ যন্ত্রের যে ফার্মটায় তিনি অবাধে স্বাধীন কথা বপন করবেন বলে ধরা হয়। নিজের কারবারে দুজনের কেউই স্বাধীন নয়। নিজের বিবেচনা মতো এরা কেউ নিজেদের কাজ চালাতে পারে না। ত্রফিম তার ফার্মের মালিক নয়, সে একটা হুইল, যাকে চালাচ্ছে অন্য আর একটা হুইল ... সেই হুইলটাকে বলি কোম্পানি। কোম্পানিটা কী তা আমি জানি না, কিন্তু এটা জানি যে বৃহৎ পুঁজিবাদী যন্ত্র ব্যবস্থায় এই যে চাকাটা ঘুরছে সেটাও নিজে নিজেই নয়। আর তোর ঘোরাটা যদি এক ইঞ্চি পেছিয়ে পড়ে অমনি তোর চাকার সবকটি দাঁত গুঁড়িয়ে যাবে, তুই তখন একটা অচল চাকা, জঞ্জালের গাদায় ফেলে দেওয়া হবে তোকে। তোর ফার্মে বসবে নতুন মালিক। সে তোর মতো পেছিয়ে পড়ছে না, কারণ নিজের মজুরদের কাছ থেকে বেশি মুনাফা তোলার ব্যাপারে সে তোর চেয়ে বেশি নির্মম ও সুক্ষম। বেশি মুনাফা — এই হল তোর বহুকীর্তিত পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার দাবি — যে প্রতিযোগিতায় মানুষে মানুষে নেকড়ের সম্পর্ক না হয়ে পারে না। কেউ ছেয়ে রঙের, কেউ নীল রঙের, কেউ ডোরাকাটা, কেউ চৌখুপি আঁকা ... কিন্তু সেটা প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা এই যে তাকে খাবে এই ভয়ে, এবং সে নিজে বাঁচার জন্যে অন্যকে খাবে

বা কামড় বসাতে পারবে এই আশায় দিন কাটাতে হয় লোককে। এরই ওপর, বলা যেতে পারে এই সামগ্রিক কামড়াকামড়ির ওপর, এই সামগ্রিক আত্মপ্রবঞ্চনার ওপর — মানুষের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির একমাত্র সর্ত যেন বা এই কামড়াকামড়ি মারামারি — এই আত্মপ্রবঞ্চনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদ আর তার স্বাধীন ও অধীন ক্যাটালাইজারগুলো — এই যে কথাটা ব্যবহার করলাম সেটা ত্রফিমের কাছে অজ্ঞাত হলেও আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাস্পদ মিঃ টেনরের কাছে তার নিজ পোর্ট্রেটের মতোই পরিচিত।'

টেনর চেয়েছিল বাধা দেবে, কিন্তু বাথরুশিন হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে ফের ভাইয়ের উদ্দেশে বলল:

'ঠিক এইভাবেই দিন কাটিয়েছে ত্রফিম, তার প্রতিবেশীদের খেয়ে, ছোটো ছোটো, অসহায়, সহজে স্থানচ্যুত করা যায় এমন সব হুইলগুলোকে মেরে ... ওকেই খেয়ে ফেলবে এই ভয়ে। এইভাবে ও বাঁচছে এবং এখন ... সে কথা ত্রফিমকে বোঝাতে হবে না, আমার চেয়ে ও ভালোই জানে যে ওর নিজের জমি থাকলেও পায়ের নিচে শক্ত ঠাঁই নেই। হ্যাঁ ত্রফিম, তোর এ ভরসা নেই যে তোর আধা-পশমী চেককাটা কোটখানা কেউ খুলে নেবে না ... এমন কি এই মুহূর্তেও তুই নিঃসন্দেহে বলতে পারিস না, জামাটা তুই পরে আছিস কি না ...'

তারপর ফের টেনরের দিকে চাইল সে:

'আমার কথাগুলোও যদি প্রপাগান্ডা মনে হয় মিঃ টেনর, তবে কোনটা সত্যি বলবেন আপনি, নিজেদের এবং পরস্পরকে বোঝার যেটা শ্রেষ্ঠ উপায়? আমি যা বললাম সেটাই যদি আপনার পুঁজিবাদের সমাজতান্ত্রিক উপাদান হয় তাহলে যেখানে পরস্পরের প্রাণ নিয়ে জুয়া চলে, সেই শয়তানের আড্ডাটার কী নাম দেবেন? আর এইটে যখন সকলের চোখে ধরা পড়বে তখন পুঁজিবাদ একেবারে নগ্ন হয়ে পড়বে, তা সে জনগণের পুঁজিবাদ, শ্রম পুঁজিবাদ বা অতি সমাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদ যেই নাম দিন না কেন। তখন দেখা যাবে, সমাজবিকাশের বাস্তব যে নিয়মের কথা ফিওদর স্তেকোলনিকভ বলছিলেন সেটাকে আপনাদের দেশ বা অন্য কোনো পুঁজিবাদী দেশ এড়িয়ে যেতে পারে কিনা।'

টেনর অমায়িকভাবে মাথা নোয়াল বাথরুশিনের দিকে:

'আমার তাতে কোনোই লোকসান নেই... শুধু এইটে বিশ্বাস করুন: আমি, কি আপনার ভাই, কি লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী — এরা কেউ ইতিহাসের আবহাওয়া গড়ে না।'

'কে গড়ে তাহলে?' এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রশ্ন করল স্তেকোলনিকভ। 'উত্তর দিতে হবে না... বরং আলোচনাটা চা দিয়ে শেষ করা যাক। কেৎলি ফুটছে বলে মনে হচ্ছে।'

ঘাসে বিছানো চাদরের চারধারে সবাই সান্ধ্য চায়ের জন্য বসলে ত্রফিম কনিয়াক টেনে নিল।

'পিওতরের কথাগুলো চায়ে ধোয়া যাবে না,' বিমর্ষ মুখে বলল সে। 'হ্যাঁ, আমার জীবনটা নেকড়েরই জীবন... সত্যি সত্যিই আমি জানি না এ কোটটা আমার কী না...' সকলের দিকে ফোলা চোখে চাইল সে, তারপর এনামেলের একটা মগে ঢালা কনিয়াকটা নিঃশেষ করে চুপ করে রইল।

চিরকালকার কোলাহলপ্রিয় আলাপী টেনরও নীরব। কিন্তু নীরবতাও কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে বাঙ্ময়।

৪১

ভারসাম্য হারিয়ে ত্রফিম উন্নত জীবনধারা নিয়ে আর তর্ক তুলল না। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের জ্ঞানবুদ্ধি সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করত টেনর। সম্ভবত নিজের বুদ্ধিতে ততটা নয়, যতটা টেনরের মারফত ত্রফিম টের পেল জীবন প্রকরণের জ্ঞানে তারা কতটা তফাৎ।

ত্রফিমের মনে হল, সত্যি সত্যিই ও যেন এত বছর কেবল এক মস্ত জাহাজের খোলে কাটিয়েছে; সে জাহাজকে বলা যেতে পারে আমেরিকা আর সেখানে সে নিজের ফার্মটি ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। ওর সমস্ত কৌতূহল সীমিত হয়ে গেছে কেবল তার কারবারের আয় ব্যয়ের হিসাবে। যদি বা সে নিউ ইয়র্কেও গিয়ে থাকে তবে সেখানেও সে নগরটার খোল ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি।

আর পিওতর কলখোজে বাস করলেও গোটা দেশের স্বার্থ নিয়ে তার জীবন। ও দেশের ইস্পাৎ উৎপাদনের কথা বলছিল, ফসলের পরিমাণের কথা,

আলোচনা করেছে আমেরিকার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা নিয়ে, সবজান্তা খাঁটি আমেরিকান টেনর পর্যন্ত হাঁ করে শুনেছে তার কথা।

এই হল তোমার মুজিক, পিওতরকে ও ভেবেছিল সেই মুজিক যাকে ও তার পোষাক, বাজনাদার ঘড়ি, হাল ফ্যাশনী স্যুটকেস আর নিজের মার্কিনী সচ্ছলতায় অবাক করে দেবে। ত্রফিম নিজেকে যতটুকু জানে, তার চেয়েও ভালো করে তাকে জানে এরা।

পিওতরের আছে প্রত্যয়, আছে বিশ্বাস। আগামী কালটা ওর কাছে রোপিত বাগানের মতো। আগে থেকেই সে সঠিক জানে কী ধরনের আপেলগাছ বেড়ে উঠবে আর তা থেকে কোন কোন বছরে কত কত ফলন সে পাবে।

আর ত্রফিমের কী আছে? কিছুই নেই। কিছুই নেই শুধু সাফল্যের একটা ঠুনকো আশা ছাড়া। আর কে জানে, ওর অনুপস্থিতিতে ফার্মটা হয়ত ইতিমধ্যেই ...

কিন্তু সে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে না তার। সে ভাবনা ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে এই বাসে যেখানে সবাই তাকে দেখছে, হয়ত বা পিওতরের মতো টের পেয়ে যাচ্ছে তার ভাবনাটা।

বাস থামল কারখানার ডিসপেনসারির সামনে, যেখানে নাদেজদা কাজ করে। আন্দ্রেই লগিনভের কাছ থেকে ত্রফিম তার রিসেপশান সময়টা জেনে নিয়েছিল। ইচ্ছে করেই সে এল ঘণ্টা শেষ হবার কাছাকাছি।

নাদেজদা ত্রফিমোভনা বসেছিল তার কেবিনেটের দুয়ারের দিকে পেছন দিয়ে। ত্রফিম দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আসতে পারি?' সে সহজভাবেই বললে, 'আসুন।'

ত্রফিম আসবে এটা সে আশা করেনি, কিন্তু অবাক হল না।

জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কী দরকার?'

'কথা কইতে এলাম,' ও বললে।

'কী নিয়ে?'

'তা ঠিক আমিও জানি না নাদেজদা ত্রফিমোভনা... সুকন্যার সঙ্গে কু-পিতার কথাবার্তা বারণ বলে আমার মনে হয় না।'

'বসুন ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, আমি কেবল বুঝতে পারছি না, এসব

কেন। আপনার কাছে চল্লিশ বছর যাবৎ আমার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। দুনিয়ায় আমার আবির্ভাব সম্বন্ধে আপনার ধারণা পর্যন্ত ছিল না। আপনি যদি এখানে না আসতেন তাহলে আমার সম্বন্ধে আমার ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে আপনি কখনো জানতেও পারতেন না।'

'কিন্তু আমি যে এসে দেখলাম আমার মেয়ে আছে, নাতি আছে। আমার ওপর কি আপনার কোনো করুণাও নেই। বাপকে উত্তর দেবার আগে একটু ভেবে দেখুন।'

'আপনি একথা বলার আগেই ভেবে দেখেছি। মাকে যখন চিঠি লিখেছিলেন তখনই ভেবেছি। এখানে আসা স্থির করার সময় মায়ের কথা ভেবে দেখেছিলেন কি? আপনি ভেবেছিলেন কি, যা মৃত যা গত তাকে খুঁড়ে তুলতে তার খুব আনন্দ হবে? নাকি ভেবেছিলেন আপনার আগমনে তার শোভা বাড়বে? আপনি মার কথা মোটেই ভাবেননি। ভেবেছিলেন কেবল নিজের কথা। নাকি আমার ভুল হচ্ছে?..'

'না ভুল আপনার হয়নি। শুধু নিজের কথাই আমি ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন আর ভাবি না।'

'তাতে কিছুই বদলাচ্ছে না। আপনার আসায় আমার বা আমার ছেলেমেয়েদের আনন্দ ঘটেনি। কিন্তু আপনি জানতেন না আমরা আছি, তাই এজন্যে দোষ দেব না আপনাকে। কিন্তু মা ... আপনার তরফে একটা হৃদয়হীন আচরণ হয়েছে এটা... লজ্জাহীন আচরণ। যে অতীত হারিয়ে গেছে তাতে ফেরার অধিকার থাকে শুধু তার যে তার জন্যে অনুতপ্ত, সে অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথাটা যে বোঝে। কিন্তু আপনি কিছুই বোঝেননি। আপনি ওর কাছে ফিরলেন শুধু স্নায়ুতে সুড়সুড়ি দেবার জন্যে, আপনার পুরনো পরিচিতদের কাছে, ভাইয়ের কাছে নিজেকে দেখাবার জন্যে। চাল দেখিয়ে চলে যাবেন বলে। আপনার কাছে এটা একটা থিয়েটারের মতো। কিন্তু এই যে দৃশ্যটায় আপনি আমাদের টেনে নামিয়েছেন তাতে অভিনয় করতে বাধ্য হওয়ার জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারি না। আপনি যদি খানিকটা ভদ্র লোকও হতেন তাহলে পিওতর কাকা আপনাকে যেদিন বলেছিল যে মা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় না, তার পরের দিনই আপনি চলে যেতেন। কিন্তু সেটা আপনি করলেন না, আপনি কেবল নিজের কথাই

ভেবে চললেন; হয়ত বা আমার জন্যে যে ডলার খরচ করেছেন সেটা হিসেব করলেন। টিকিট যখন কেনা হয়েছে তখন সবটা উশুল করতে হবে বৈকি...'

'হয়ত তাই,' স্বীকার করলে ত্রফিম। 'নিঃসন্দেহেই তাই। কিন্তু অন্যরকমও তো হতে পারত। ধরা যাক, আমি যদি আমেরিকা না যেতাম, কলচাকের সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরতাম জ্যান্ত, সুস্থ দেহে। তখন কি আমায় বাপ বলে আপনি ডাকতেন, নাতিরা আমায় দাদু বলত?'

'বলত বৈকি।'

'তাহলে এখন বাধা কিসের?.. আমি তো সেই...'

'না, আপনি এখন যা সেক্ষেত্রে তা থাকতেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নে চল্লিশ বছর বাস করলে আপনাকে মানুষ হয়ে উঠতে হত। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আপনার মতোই ঝানু শত্রুপক্ষীয় অনেকে এখন ভালো লোক, সোভিয়েত মানুষ... এমন কি কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। নিজেদের অতীত তারা ভুলে গেছে... নিঃশেষে ভুলেছে। সে কথা কেউ তাদের স্মরণ করিয়েও দেয় না। আর আপনি... আপনি শাদার দলে গিয়েছিলেন তো কেবল নিজের হাড়টুকু, নিজের শোচনীয় মাংসখণ্ডটুকু, নিজের ঠাঁইটুকু হারাবার পাশবিক ভয়ে, অজ্ঞতার বশে। সব কিছু অন্যরকম হলে আপনাকে তো পিওতর কাকা নিজে, সারা গ্রাম আপনার চোখ খুলতে সাহায্য করত... গ্রাম কেন, জীবনই আপনার চোখ ফোটাত। আর এখন যেমন আমার মাকে নিয়ে আমার গর্ব, তেমনি গর্বই বোধ করতাম আমার বাপের জন্যে। কলচাক যাদের ঠকিয়েছিল, কলুষিত করেছিল এমন যারা আজ সুখে বাস করছে তাদের সংখ্যা তো কম নয়! তাদের নাম করতে চাই না, কিন্তু আমাদের হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারই তো আগে ছিলেন কলচাক অফিসার। আর এখন উনি আঞ্চলিক সোভিয়েতের ডেপুটি, দুবার পদক পেয়েছেন। ওর কথাই বা কেন... কারখানা-মালিকের সেই ছেলেটা... যার সঙ্গে আপনি বনে লুকিয়ে ছিলেন। সে এখন বাপের কারখানার ডিরেক্টর। সে কারখানা অবশ্য এখন চেনার জো নেই, ওকেও চেনা দায়। কে বলবে, কী না হতে পারতেন আপনি এদেশে!'

'সে বেঁচে গেছে বলতে চান? দল বদলেছে?'

'আপনাদের ভাষায় এটাকে কী বলে জানি না, তবে মা'র কাছে শুনেছি, সে এসে ধরা দেয়, সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করে।'

'শেয়াল বটে!'

'আপনার নিজের আরণ্যক আত্মীয় হিসাবে লোকের বিচার নাই বা করলেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাদেজদা ত্রফিমোভনা, ত্রফিমকে চলে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে। কিন্তু স্থানচ্যুত হবার লক্ষণ দেখাল না ত্রফিম।

'সবাই তাহলে সময়মতোই অনুতাপ করেছে, আমিই কেবল বলা যেতে পারে দেরি করে ফেলেছি।'

'দেরি হওয়া সম্ভব কেবল মৃতদের পক্ষে,' উত্তর দিল নাদেজদা ত্রফিমোভনা।

'কিন্তু আমি তো বেঁচে!'

'নিজেকে ভোলাবেন না ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, আত্মপ্রবঞ্চনা করবেন না।'

নাদেজদা ত্রফিমোভনা, নার্সকে ডেকে ত্রফিমকে দেখিয়ে বললে "রোগীকে" যেন স্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বাসে তুলে দেয়।

'ধন্যবাদ নাদেজদা ত্রফিমোভনা, এখনো আপনার সাহায্য ছাড়াই চলতে পারি,' এই বলে ত্রফিম বিদায় না জানিয়েই মাথা উঁচু করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কাঁধ ঝাঁকাল নার্স:

'এটি ওই সেই, নাদেজদা ত্রফিমোভনা?'

'সেই বটে।'

"জীবনে কত রকম সাক্ষাৎই হয়..." কথা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল নার্সটির, কিন্তু নাদেজদা ত্রফিমোভনা আগেই সেটা আঁচ করে গ্লাসে ডবল ডোজ টিংচার ভালেরিন ঢালতে বললে।

হয়ত সেটার দরকার ছিল না, কিন্তু নার্স বুঝল যে নাদেজদা ত্রফিমোভনা তার বাপের কথা নিয়ে আলাপ করতে চায় না।

৪২

ত্রফিমের সঙ্গে দেখা হবার সেই রবিবারেই বাখরুশিতে ফিরে এল দারিয়া স্তেপানোভনা। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সেটা ভালো লাগল না।

'কী ব্যাপার দারিয়া? ছুটির দিন দেখে আমি যে একটা গাড়ি পাঠিয়েছিলাম তোমায় ওখান থেকে কুভশায় ভাইপোর কাছে পাঠাবার জন্যে। আর তুমি হঠাৎ সবাইকে অগ্রাহ্যি করে এসে হাজির... ভূষিমালের বস্তাটা তোমায় কী দিয়ে গুণ করল? কী দিয়ে মায়া জাগাল তোমার?'

নিজে ভেবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না দারিয়া। তার মাথার মধ্যে যে বিভিন্ন আবেগের সংঘাত চলছিল, তা সে গুছিয়ে তুলতে পারছিল না। শুধু একটা কথা ছিল পরিষ্কার। লুকিয়ে থাকাটা তার পক্ষে হত আরো অপমানকর। বললে:

যা হবার তা পাঁচ জনের চোখের সামনেই হোক। গুজব রটবে কম, আমিও শান্তিতে থাকব। নইলে দাঁড়াত যেন আমি কেমন ভয় পাচ্ছি... ওর সঙ্গে ফয়সালা করতে হয় তো লোকের সামনেই হোক, একা একা নয়।'

ওর ঘরের ফটক থেকে দারিয়াকে বিদায় দেবার সময় বাখরুশিন তবু বললে:

'রাগ কোরো না দারিয়া, আমি এখন কেবল কবে পুরনো বাখরুশি তুলে দেওয়া বাবদ রেলওয়ের কাছ থেকে দলিল আর টাকা পাব সেই নিয়ে ঘুমের মধ্যেও ভাবছি। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কি বলে, মাথা গলাবার সময় নেই মোটে। শুধু তোমায় সাবধান করে দিই: ওর কোনো কথা কোনো চোখের জলে বিশ্বাস করো না... ও একেবারে হৃদয় থেকে বলছে বলে মনে হলেও বিশ্বাস কোরো না। বিশ্বাস কোরো না কারণ ও হল মুহূর্তজীবী। প্রধান কথা হল ওর মাথার ঠিক নেই। কোনো সংযম নেই ওর। নিজের কাছ থেকে ও নিজেও যেটা আশা করে না, সেইটাই আশা করা যায় ওর কাছে। যা করবার শেষ করে দাও, ফিরে যাক ও তার এলজার কাছে...'

এই বলে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ গাড়িতে উঠে চলে গেল কলখোজ আপিসের দিকে।

ফটকে দাঁড়িয়েছিল দারিয়া, ইচ্ছে হয়েছিল বাছুর ঘরে যায়, কলখোজ আপিসে একবার ঢুঁ মারে। কিন্তু সেরিওজাকে কারো কাছে রেখে যাবার মতো ছিল না। এক মিনিট পরে আসছি বলে কাতিয়া গেছে, পুরো ঘণ্টার মধ্যে তার দেখা নেই। আর ভোর থেকে বড়ো নাতি বরিস গেছে মাছ ধরতে।

মোড়ের মাথায় দেখা দিল ত্রফিম। ওকে দেখার পর এখন আর দারিয়ার

চলে যাওয়া ভালো দেখায় না। বিশেষ করে ত্রফিম ততক্ষণে টুপি খুলে সুপ্রভাত জানিয়ে বসেছে।

'কাতেরিনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি,' ফটকের গোড়ায় কেন দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ দেখাল দারিয়া: 'সেরিওজাকে কারো কাছে রেখে যাবার নেই। তোমার ওই ব্লাস্ট ফার্নেসের পর এখন দেশলাই নিয়ে খেলা শুরু করেছে। কোন দিন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে বসবে।'

ত্রফিমের মুখে হাসি ফুটল।

'শিকার এসে আপনিই ধরা দেয় দেখছি। নাতির ধাইগিরি করতে আমি খুব রাজী। সেই জন্যেই আসছিলাম। অন্যায় কিছু করব না, ভয় নেই। ওকে নিয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াব, যখন বলবে ফিরে আসব।'

সেই সময় জানলা খুলে গেল। ত্রফিমের গলা শুনে সেরিওজা ঘর ফাটিয়ে চ্যাঁচাল:

'গ্র্যান্ড-পা, গ্র্যান্ড-পা, শিগগির চলে এস জানলা দিয়ে, আসল মজারু দেখাব তোমায়...'

'আরে, সেরিওজা যে!' নাতিকে অভিনন্দন জানাল ত্রফিম, তার হাতে চুমু খেল। 'একটু মোটা হয়ে পড়েছি রে, জানলা দিয়ে গলবে না। তার চেয়ে বরং তুই চলে আয় জানলা দিয়ে। দিদিমার তো আপত্তি নেই তোর সঙ্গে নদী পারে যেতে? কাঁকড়া ধরা যাবে, পাইক মাছের মাকেও ঘায়েল করতে পারি...'

জানলা থেকে ত্রফিমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেরিওজা।

'চলো যাই।'

ত্রফিমের গলা জড়িয়ে ধরল ছেলেটা, গালে গাল ঠেকাল। দারিয়া ঘুরে প্রতিবেশীদের জানলার দিকে একবার চকিতে চেয়ে বলল:

'বেশ, ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে এসো... আপত্তি নেই... তোমার এখানকার দিন তো এবার ফুরিয়ে এল।'

'আর আট দিন। নয় দিনের দিন চলে যাচ্ছি। তাহলে আপত্তি নেই। ধন্যবাদ।' ত্রফিম দারিয়ার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল, তারপর সেরিওজাকে কোল থেকে নামিয়ে তার শার্ট ঠিক করে দিল, একটু কুঁথিয়ে নিচু হয়ে ওর ছোটো ছোটো জুতোর ফিতে বাঁধল, তারপর ওর হাত ধরে এগিয়ে গেল রোদ ঢালা রাস্তা দিয়ে।

সবাই দেখল, বিপ্লকায় ত্রফিম একটা ছোট্ট শাদা-চুলো ছেলের হাত ধরে যাচ্ছে। সবাই জানত ছেলেটার নাম সেরিওজা, ত্রফিমের আপন নাতি সে। জানত, দেখল, কিন্তু কোনো আলোচনা করল না। আলোচনা করল না এই জন্যে নয় যে তাদের বলবার কিছু ছিল না, নিজস্ব মত ছিল না কোনো। সে জন্যে নয়... বোঝাই যায় জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সেরা মূল্যায়ন হয় নীরবতায়।

সত্যি, কী কথাই বা বলা যাবে। এটা ভালো হল, নাকি খারাপ? ত্রফিমের সঙ্গে নাতিকে ছেড়ে দিয়ে ঠিক করেছে দারিয়া, নাকি করেনি? অমনি হাজারটা "না" হাজারটা "হ্যাঁ" আর হাজারটা "কিন্তু"তে তার জবাব মিলবে... হয়ত মনে মনে কিছু একটা ভেবে রেখেছে দারিয়া। হঠাৎ সে যে বাখরুশিতে এসে হাজির হল, সেটা কি বিনা কারণেই? কী উচিত, অনুচিত, সে ওর জানা আছে। যুদ্ধের সময় ও যে কলখোজ সভাপতি হয়েছিল, সবাই ওকে মেনে চলত, সে কি অমনি অমনি?

সেরিওজা যে সকলের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এ সম্পর্কে একেবারে ভাবিত না হয়ে কিন্তু সে আনন্দে তাকাচ্ছিল ত্রফিমের চোখের দিকে, নয়ত রাস্তার কোনো একটা বড়ো গুবরে পোকা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, নয়ত যে পাইক মাছটা আজ দাদুর সঙ্গে ধরা হবে তার কথা ভেবে উল্লসিত হয়ে উঠছিল। ত্রফিমও নজর করলে না রাস্তাঘাট, জানলা, কৌতূহলী চোখ। দুনিয়ায় ওর যা সবচেয়ে প্রিয় তারই হাতে হাত দিয়ে সে হাঁটছিল, যার জন্যে ও যেন সবকিছু করতে প্রস্তুত, এমন কি কলখোজের শস্য গুদামের দরোয়ান হয়ে থেকে যেতেও রাজী... হয়ত বা... ত্রফিম নিজেও জানত যে সে "মুহূর্তজীবী" তবু সেই মুহূর্তে ওর জীবনের একমাত্র আনন্দ, একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল সেরিওজা।

লোকে দেখল, ত্রফিম আর সেরিওজা গেল নদীর দিকে, বড়ো পাইক ধরার জন্যে জ্যান্ত টোপ জোগাড় করলে তারা। লোকে শুনল, ত্রফিম সেরিওজাকে বলছে:

'পাইক মাছের মা ততক্ষণ টোপ গিলুক, আমরা খানিকটা চাষ করে নিই।'

আর সেরিওজা হল ট্র্যাক্টর-ড্রাইভার, ত্রফিম হল ট্র্যাক্টর। হামাগুড়ি দেওয়া ত্রফিমের পিঠের ওপর কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল ছেলেটা, তার কান

ধরে কখনো এদিকে কখনো ওদিকে চালাতে লাগল, তারপর চালাল জলের দিকে।

ট্র্যাক্টর রূপী ত্রফিম জলের মধ্যে কনুই পর্যন্ত পেঁাছে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল।

ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে যা উচিত, সেই ভাবে ঘড়ঘড় শব্দটা থামিয়ে ত্রফিম বললে:

'ইগনিশন পয়েন্ট ভিজে গেছে।'

লোকে দেখল, ট্র্যাক্টর বালির ওপর শুয়ে শুকোতে লাগল তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল:

'সেরিওজা, পাইক গিলেছে রে!'

তীরে পোঁতা ছিপটার কাছে ছুটে গেল ত্রফিম আর সেরিওজা। সুতো টেনে ধরেছে। বলা কঠিন ওদের মধ্যে কার খুশি বেশি। দুজনেই কান ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছিল...

টেনর সবসময়েই এসে হাজির হয় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং ঠিক সময়টিতে। ইতিমধ্যেই অলক্ষ্যে সে ট্র্যাক্টর ও ট্র্যাক্টর-ড্রাইভারের ছবি তুলে নিতে পেরেছিল। এবার মাছটা ছুটে যাবে এই আশঙ্কায় সে অপর পার থেকে হুঁশিয়ার করে বলল যেন আস্তে আস্তে গুটায়।

কিন্তু কে তখন শোনে টেনরের কথা। আশাতীতভাবে কথা তার ফলে গেছে। নাতির চোখে ও এখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। আর তখন সেইটাই তার কাছে বড়ো কথা।

"ছিঁড়ে না গেলেই বাঁচি," ভাবল সে।

কখনো সুতো ছেড়ে, কখনো টেনে মাছটাকে কাহিল করে আনল ত্রফিম। মাছটা ভয়ানক ঝাপটা মারল সুতোয়। কিন্তু বাচ্চা বয়সে মাছ ধরেছে ত্রফিম, ওদের মতিগতি ওর জানা।

হঠাৎ দেখা গেল পাইক মাছটাকে। সুতো ছেঁড়ার শেষ চেষ্টা করছে ওটা। সেরিওজা চেঁচাচ্ছে। মাছটা ধরবার জন্যে ছুটে জলে নেমে গেল সে। কিন্তু ভয় পেল।

শেষ পর্যন্ত পারে উঠল পাইক। অমনি কোথা থেকে যে সব লোক জুটে গেল আশ্চর্য। এসে জুটল সেরিওজার ভাই বরিসও। চোখে তার আনন্দ।

'মাছ বটে একখান!' খুশিতে বলল ছেলেটা।

কিন্তু তার আনন্দে ত্রফিমের কিছু এসে যায় না। এ নাতিটিও তার, কিন্তু ত্রফিমের কাছে সে পর। তার কারণ দশবছরের বরিস জানে যে তার দাদুটা দাদু নয়, ধেড়ে নেকড়ে, পালিয়েছিল আমেরিকায়। হয়ত কোনো কিছুর জন্যেই বরিস কখনো ত্রফিমের কাছে আপন হয়ে উঠবে না। কিন্তু সেরিওজা এখনো ছোটো, দাদুর জন্যে ওর ভালোবাসা জাগানো যায়। বাচ্চারা তো শুধু এইটুকু দেখে, কে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে, তার জন্যে কী করে দিচ্ছে।

বালির ওপর লাফাচ্ছিল মাছটা। মাথায় পাথরের বাড়ি মেরে মাছটাকে চুপ করিয়ে দিতে সেরিওজার সামনে লজ্জা হল ত্রফিমের। মাছটার দিকে চেয়ে সেরিওজা দেখল রক্ত।

'ব্যথা লাগছে ওর?' ত্রফিমকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আরে না,' জবাব দিল ত্রফিম। 'ওটা যে মাছ।'

কিন্তু নতুন প্রশ্ন করল ছেলেটা:

'আর নদীতে ওর ছেলেপিলেরা আছে?'

সেরিওজার অস্থিরতা লক্ষ্য করে ত্রফিম খাবি খাওয়া মাছটার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলল:

'ছেলেপিলে হবে কোত্থেকে? ওটা বুড়ি। দেখছিস না কেমন মোটা... তবে নাতিপুতি হয়ত আছে নদীতে।'

হঠাৎ ত্রফিমের হাত জড়িয়ে ধরল সেরিওজা:

'গ্র্যান্ড-পা, গ্র্যান্ড-পা, পাইক দিদিমাটাকে ছেড়ে দাও নদীতে!'

খিলখিল হাসি শোনা গেল। সেরিওজার ভাই বরিসও হাসছিল।

'সত্যি বলছিস ছেড়ে দিতে?' পরিহাসের সুরে জিজ্ঞেস করল ত্রফিম।

জিজ্ঞেস করেই নজরে পড়ল ছেলেটার চোখে জল। ভয় পেয়ে গেল ত্রফিম। ধীরে ধীরে সে বড়শি থেকে খসিয়ে নিল মাছটা, অপরাধীর মতো বললে:

'এক্ষুণি সেরিওজা, এক্ষুণি ছেড়ে দেব...'

সযত্নে মাছটা নিয়ে সে নদীতে ছেড়ে দিল।

ত্রফিমের কাছে ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে ধরল সেরিওজা। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল:

'মুখটা ওর ভালো হয়ে যাবে?'

ত্রফিম বলল:

'কালই ভালো হয়ে যাবে। কাতলা মাছ হল গে ডাক্তার, সে ওর যা দরকার প্রেসক্রিপশন লিখে দেবে, পাইক মাছটা দেখো না, ভালো হয়ে বাঁচবে এখন একশ বছর।'

পারের লোকেরা চুপ করে গেল। চুপ করে রইল টেনর। ত্রফিম সেরিওজাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আর নাতিপুতির কাছে সাঁতরে চলে গেল পাইক মাছটা, হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল সেরিওজা।

ঘটনাটা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কানে গেল। সে বললে:

'বাঁশির মিষ্টি সুরে সাপকে ভোলানো যায়, কিন্তু তাতে তার বিষ যায় না...'তারপর নিঃশ্বাস ফেলে যোগ করল: 'সেরিওজাকে দেখানো দারিয়ার উচিত হয়নি। অত মিহি তারটা ত্রফিমের কানের উপযুক্ত নয়। আর নাদেজদা যদি আর্তিওম ইভোলগিনকে বাপ বলে মেনে থাকে, তাহলে সের্গেই কিছুতেই নেকড়ের নাতি হতে পারে না। কিন্তু কী হবে বলে। ও চলে যাবার পর সপ্তাহ দুয়েক কাটলেই সেরিওজা সব ভুলে যাবে... শুধু শিগগির শিগগির গেলেই বাঁচি!'

এমন ইচ্ছে শুধু একলা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচেরই নয়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে বাচ্চা সেরিওজা বাখরুশিতে আমেরিকানদের শেষ দিনগুলোর ঘটনায় যে ভূমিকা নিল সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৪৩

মাছ ধরে নদীতে ছেড়ে দেবার এই ছোটো ঘটনাটায়, সেরিওজার প্রতি ত্রফিমের আশ্চর্য টান দেখে লোকের মনে দোলা লাগল। ওর প্রতি দারিয়া স্তেপানোভনার আচরণেও খুব সামান্য হলেও কেমন একটা উষ্ণতা দেখা গেল।

'বুড়ো মাছটার ওপরেও যখন তোমার মায়া হল তখন বোঝা যায় তোমার মধ্যে ভালো কিছু একটা এখনো হয়ত থেকে গেছে,' কবরখানায় গিয়ে বসার সময় দারিয়া বলল ত্রফিমকে।

দিয়াগিলেভ বংশের কবরগুলোয় ক্রুশ বদলানো হয়েছে, নতুন লোহার রেলিং বসেছে।

'সবই এবার যথারীতি হল। এ'দের আর নালিশের কিছু থাকবে না। ভালো ভালো ক্রুশ। পাশে বেড়া, অনেক জায়গা। শুয়ে থাকার মতো বেশ শুকনো ডাঙা। বালি।'

'ভেজা, এ'দো কিছু নয়,' কথা চালিয়ে গেল দারিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করলে: 'আমেরিকায় কবরখানাগুলো কী রকম? খুব ঘেঁসাঘেঁসি বুঝি?'

'যেখানে যেমন। কেমন লোক তার ওপর। টাকাওয়ালা লোকের জায়গার অসুবিধা নেই। এলজাকে আমি যেমন রবার্টের কবরে সমাধির ব্যবস্থা করব। রবার্টই তো ওর ধর্মসঙ্গত স্বামী, রবার্টের পাশে শোয়াই তার উচিত।'

দারিয়া যেন নিজের সঙ্গেই তর্ক করছে এমন সুরে প্রকাশ্য বিদ্রুপেই বললে:

'লোকের যদি জানা থাকে কবে কাকে মরতে হবে, কোথায় কার সমাধি হবে, তবে সেটা ভালোই। তোমার এলজার বয়স এখন কি অনেক?'

'সত্তর পেরিয়েছে। আমার চেয়ে অনেক বড়ো। সত্তর অবিশ্যি খুব একটা বেশি বয়স নয়, কিন্তু ও ফুটতে শুরু করেছিল আগে। দিন কাটিয়েছে দৃকপাত না করে। এখন আর হাঁটতে পারে না।'

দারিয়া ওর দিকে চেয়ে মন্তব্য করল:

'ওর কথা তুমি বলছ এমন করে যেন ও তোমার কেউ নয়। হাজার হোক বৌ তো...'

'একদিক থেকে বটে কিন্তু অন্যদিক থেকে... মিতিয়াগিন ডাঙ্গায় তোমায় যা বলা হয়ে ওঠেনি, সেইটে বরং শেষ করি।'

'বেশ শোনাও,' সায় দিল দারিয়া। 'তোমার বর্তমানের পারিবারিক অবস্থাটা জানাই উচিত।'

'সবটাই যাতে তুমি জানো সেই আমার ইচ্ছে। সেবার কতদূর বলেছিলাম?'

'মোজা পরে এলজার সেই নাচ পর্যন্ত,' মনে করিয়ে দিল দারিয়া।

'ঠিক। তোমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো দারিয়া। এবার পরের বছরগুলোর কথাটা শোনো। ঘটনা অনেক, তবে মনে করতে ইচ্ছে হয় না। যাই হোক...

এলজা আমায় তার ফার্মে নিয়ে গেল, স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। রবার্টের সঙ্গে। প্রথমটা আমায় ও ঘোড়ার দেখাশোনার কাজে লাগাল, পরে আমি হয়ে উঠলাম ওর ডান হাত। দুধ, মাংস, সবজি বিক্রির ভার ছেড়ে দিলে আমায়, ভার ছেড়ে দিত তার যুবতী বৌয়েরও, তাকে আমি গির্জার উপাসনায় নিয়ে যেতাম। কেমন উপাসনা সে তোমায় না বললেও চলবে। বৌ আমার জন্যে পাগলা হয়ে উঠেছিল এটা বুড়ো টের পেয়েছিল কিনা জানি না, আর আমিও নিজের দোষ ঢাকতে চাই না, ওর সঙ্গে তখন মেক্সিকো হোক, আলাস্কা হোক পালাতে আমিও রাজী। ওকে তা বললাম।'

'ভালোবেসেছিলে তাহলে?' সঠিক জানতে চাইল দারিয়া।

'সবকিছু দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, তাই হবে। ও কিন্তু নিজের ফার্ম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে প্রিয়তমের সঙ্গে কুঁড়ে ঘরে স্বর্গের সন্ধান করতে রাজী হল না। বললে ধৈর্য ধরতে। অচিরেই ওর রবার্টও মারা গেল। মাছ খেয়ে।'

'ফুড পয়জনিং?'

'হ্যাঁ। মরার পর ডাক্তাররা তাই সার্টিফিকেট দিয়েছিল। মাছের বিষ। আসলে কী ঘটেছিল সেটা আমি ওকে কখনো জিজ্ঞেস করিনি... জানার ইচ্ছেও হয়নি জানতেও চাইনি... এইটুকু জানি যে ও রোজ রাতে আবেগ ভরে প্রার্থনা করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর কবরে গিয়ে কেঁদে কাটাত। ও তার মরণ কাছিয়ে এনেছিল কিনা জানতে চাই না। কিন্তু রোজ রাতে সে আমাদের খাটের চারপাশে পবিত্র জল ছিটাত।'

'তাতে ফল হয়েছিল কিছু?'

'হয়েছিল। আমায় সে কখনো দেখা দেয়নি। পরে আমরা নতুন বাড়ি বানাই।'

'তার মানে তুমি ওর স্বামী হলে?'

'আসলে স্বামী, কিন্তু আইনত ওর ফার্মের ম্যানেজার হিসাবেই রয়ে গেলাম, কারণ দলিল অনুসারে ফার্মটা যায় ও আর ওর মেয়ের কাছে। তাছাড়া অন্য কিছু হতে পারত এ আমার মাথাতেই ঢোকেনি। কিন্তু পরে যখন আমি সেয়ানা হয়ে উঠেছি, পাশের ফার্মটা কিনে নিলাম, তারপর আরো তিনটে ফার্ম, তখন বুঝতে শুরু করলাম, ফার্মের কে মনিব আর কে

এলজা আমায় তার ফার্মে নিয়ে গেল, স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। রবার্টের সঙ্গে। প্রথমটা আমায় ও ঘোড়ার দেখাশোনার কাজে লাগাল, পরে আমি হয়ে উঠলাম ওর ডান হাত। দুধ, মাংস, সবজি বিক্রির ভার ছেড়ে দিলে আমায়, ভার ছেড়ে দিত তার যুবতী বৌয়েরও, তাকে আমি গির্জার উপাসনায় নিয়ে যেতাম। কেমন উপাসনা সে তোমায় না বললেও চলবে। বৌ আমার জন্যে পাগলা হয়ে উঠেছিল এটা বুড়ো টের পেয়েছিল কিনা জানি না, আর আমিও নিজের দোষ ঢাকতে চাই না, ওর সঙ্গে তখন মেক্সিকো হোক, আলাস্কা হোক পালাতে আমিও রাজী। ওকে তা বললাম।'

'ভালোবেসেছিলে তাহলে?' সঠিক জানতে চাইল দারিয়া।

'সবকিছু দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, তাই হবে। ও কিন্তু নিজের ফার্ম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে প্রিয়তমের সঙ্গে কুঁড়ে ঘরে স্বর্গের সন্ধান করতে রাজী হল না। বললে ধৈর্য ধরতে। অচিরেই ওর রবার্টও মারা গেল। মাছ খেয়ে।'

'ফুড পয়জনিং?'

'হ্যাঁ। মরার পর ডাক্তাররা তাই সার্টিফিকেট দিয়েছিল। মাছের বিষ। আসলে কী ঘটেছিল সেটা আমি ওকে কখনো জিজ্ঞেস করিনি... জানার ইচ্ছেও হয়নি জানতেও চাইনি... এইটুকু জানি যে ও রোজ রাতে আবেগ ভরে প্রার্থনা করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর কবরে গিয়ে কেঁদে কাটাত। ও তার মরণ কাছিয়ে এনেছিল কিনা জানতে চাই না। কিন্তু রোজ রাতে সে আমাদের খাটের চারপাশে পবিত্র জল ছিটাত।'

'তাতে ফল হয়েছিল কিছু?'

'হয়েছিল। আমায় সে কখনো দেখা দেয়নি। পরে আমরা নতুন বাড়ি বানাই।'

'তার মানে তুমি ওর স্বামী হলে?'

'আসলে স্বামী, কিন্তু আইনত ওর ফার্মের ম্যানেজার হিসাবেই রয়ে গেলাম, কারণ দলিল অনুসারে ফার্মটা যায় ও আর ওর মেয়ের কাছে। তাছাড়া অন্য কিছু হতে পারত এ আমার মাথাতেই ঢোকেনি। কিন্তু পরে যখন আমি সেয়ানা হয়ে উঠেছি, পাশের ফার্মটা কিনে নিলাম, তারপর আরো তিনটে ফার্ম, তখন বুঝতে শুরু করলাম, ফার্মের কে মনিব আর কে

চাকর। দেখা গেল সবই ওর নামে লেখা, আমার জন্যে কেবল অল্প একটু ব্যক্তিগত হাত খরচ... এই ভাবেই চলল। পুঁজি বানিয়ে চললাম আমি কিন্তু সে পুঁজিটা হল ওর। অবিশ্যি এখনো আমিই মাথা! আমি নইলে কুটোটি পর্যন্ত নড়ে না। আমিই মাথা কিন্তু অই পর্যন্ত।'

'দ্যাখো দিকি! তুমি নেকড়ে, তোমায় কিনা খেল একটা ভেড়ী, সে কী ব্যাপার?' ত্রফিম সম্পর্কে যতটা পারে জানার জন্যে উস্কানি দিল দারিয়া।

'কিন্তু এখন আর করব কী। জীবন তো আর নতুন করে শুরু করা যায় না। দেখতেই পাচ্ছ, আমি তো তবু এখনো কাস্তে চালাতে পারি, কিন্তু সে তার আরাম কেদারা ছেড়ে উঠতে পারে না, কিন্তু নিজেরটা ঠিকই আদায় করে নেয় ডাইনী। বিছানা থেকে ওকে তুলে আনতে হয়, বিছানায় গিয়ে শোয়াতে হয়... খুব ভারি নয় যদিও... দুই পুদও ওজন হবে না, কিন্তু ঝামেলা... আমার কাছে ও পর। ওর ওপর আমার টান এই নখের ডগাটুকুর চেয়ে বেশি নয়। কেবলি বিরক্তি ধরে। সেটা যে মানিয়ে চলেছি তা শুধু এই জন্যে যে ভগবান তোমার জন্যে আমায় শাস্তি দিচ্ছেন। সহ্য করছি।'

'এখন তাহলে কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল দারিয়া।

'কী ভাবব? ওখানে আমি শুধু ওইটুকুই। এলজা ফার্মটা তার মেয়ের নামে লিখে দিয়েছে, মেয়েটা বিবাহিতা। দুটি ছেলে আছে। আমার নাতি তো তারা নয়। তার স্বামীটাও আমার জামাই নয়। লোকটা খারাপ নয় কিন্তু বোকাটে। আমি না থাকলে পরের দিনই ফার্মটাকে সে উড়িয়ে দেবে। এলজা জানে যে ফার্মটা আমার জীবন। সেই জন্যে উইলে লিখেছে: ফার্ম চালাবার জন্যে আন্না যদি আমায় ছাড়া অন্য কাউকে বসায় তবে মোট পুঁজির এক তৃতীয়াংশ আমায় শোধ দিতে হবে। আন্না কি আর তাই চাইবে? বোকা তো নয়। বেশ জানে, আমি নইলে ফার্মও থাকবে না, ও-ও থাকবে না। মায়ের মতোই ও আমায় ধরে রাখবে সম্মানী খেতমজুর করে।'

গোঙানির মতো একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ত্রফিমের বুক থেকে:

'আহ! এলজার কাছ থেকে যদি ফার্মটা শুধু একবার কেনা যেত... কিনে তারপর কাউকে বিক্রি করে দিতে পারলে...'

'সে আবার কেন ত্রফিম? কী বলছ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল দারিয়া স্তেপানোভনা।

'কেন আবার কী? তাহলে যে বাড়িটি সে ভালোবাসে সে বাড়িটি এলজার থাকবে না। যে বাগানটি তার নয়নের মণি সেটি থাকবে না। পুকুর থাকবে না, কিছুই থাকবে না। ঘর ভাড়া নিতে হবে, মরতে হবে পরের ঘরে।'

'আর তুমি যাবে কোথায়?'

'আমি? আমি চলে যাব ডেনমার্কে কি অন্য কোনো পুণ্যধামে। যাবার জায়গার কি অভাব আছে?'

'হয়ত বা রাশিয়াতে?'

'রাশিয়াতেও হতে পারে। আমি তো এখানে কাউকে খুন করিনি। তোমাদের সরকারের কাছে কোনো কিছু অপরাধ নেই আমার। আর এখানকার সবাই যা ভাবে সে রকম করে আমি যে ভাবতে পারি না... সেটা খুব জরুরী কথা নয়, বিশেষ করে শস্য গুদামের দারোয়ানির কাজে।'

'কষ্টের কপাল তোমার, সম্মানী খেতমজুর মশায়। কিন্তু সে ভাগ্য তো তুমি নিজেই গড়েছ। তুমিই তো তার মালিক। বুঝতে পারছি তুমি চাও আমি খানিক চোখের জল ফেলি, তোমায় ক্ষমা করি, সহানুভূতি দেখাই। কেন বলো তো? কথাটা কি কেবল আমার ক্ষমা করা নিয়ে! শুধু কি আমার কাছেই তুমি অপরাধী? নিজে একবার ভেবে দেখো। নিজের হৃদয়ের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো তো: এই মাটির কাছে কি কোনো দোষ করোনি তুমি?'

বেঞ্চি থেকে উঠল দারিয়া। সোজা হয়ে দাঁড়াল। বন আর মাঠের শ্যামল প্রসার, দিগন্তের কাছে নীল হয়ে ওঠা পাহাড় আর কারখানার দূর ধোঁয়ার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে।

'আর তোমার মনের মধ্যে যদি কোনো অনুতাপ না থাকে, নিজের জীবনের চেয়েও যেটা তোমার কাছে মূল্যবান হওয়া উচিত, তাহলে এই যা কিছু শুনলাম এ শুধু তোমার একটা কান্না-কান্না খেলা, শুধু নিজের জন্যে খেলা।'

'আর যদি সত্যি হয়ে থাকে? যদি এখানে থেকে যেতে চাই, তাহলে কী বলবে তুমি?'

'তোমার সবই যে "যদি"।'

'তুমি তাহলে হ্যাঁ, না কিছুই বলতে চাও না।'

'বাজে কথা থাক এখন। কবরের মধ্যে তোমার দাদু দিয়াগিলেভ ক্ষেপে উঠবে যে। চেঁচিয়ে উঠে বলবে, "নিকোলায়ী মোহরগুলোর জন্যে যে হতভাগা তুই আমার কাছে দোষী..." "আমি যদি থেকে যেতে চাই" — এমন সহজ ব্যাপার এটা নয়। আমি তো কল্পনাই করতে পারি না যে তুমি তোমার দেশের মাটিতে থাকছ, ভাবতেই পারি না।'

'কিন্তু দেশের মাটির নিচে?'

'তোমার মতো লোকেরা মেয়াদের আগে মাটি নেয় না। মরতে মরতেও তারা ভাবে আরো কিছু দিন অন্যকে মেরে যাই। ফার্মটা কিনে ফের কাউকে বিক্রি করে দেবে, তাই না... ধন্যি তুমি! ফার্মটা তোমার হোক, যারই হোক, সঙ্গে করে তো আর কবরে নিয়ে যেতে পারবে না। এলজাকে জব্দ করা কিসের জন্যে? ভালোবাসার জন্যে? ঘোড়া হারাবার ভয়ে সে লাস্সোটা নিজের হাত থেকে খসাতে চায় না বলে? ও যে বুড়ি। ওকে বোঝা দরকার... দেহটা মরলেও বুকের স্পন্দন তো থেমে যায়নি... চলো, এগোও, পেছনে তাকিয়ো না। মৃতেরা সেটা পছন্দ করে না।'

চুপচাপ চলল ওরা। নিজের নিজের ভাবনায় বিভোর। বিদায় জানিয়ে দারিয়া বললে:

'যদি পারো, মানুষের মতো ফিরে যেও। এর বেশি আমরা তোমার কাছ থেকে আশা করি না।'

ত্রফিম এগোল লেনিভি চড়াইয়ের দিকে আর দারিয়া তার বৈধব্যের ঘরের দিকে। যা বলবার সে সব বলে দিয়েছে, ত্রফিমের সঙ্গে সাক্ষাতের আর প্রয়োজন নেই তার।

এই কথা সে ভাবছিল সূর্য পাটে বসার সময়। আমরাও দূর শুীতিওমির বনের ওপর সূর্যকে পাটে বসতে দিয়ে যাত্রা করিগে অভ্যাগত ভবনের দিকে।

৪৪

সে সন্ধ্যায় মদ খেল ত্রফিম। খেল এক লিটার ভোদকা আর এক জাগ কালো কারেণ্টের ব্র্যাণ্ডি। ওকে এমন অবস্থায় টেনর, তুদোয়েভ বা পেলাগেয়া কুজমিনিচনা আগে কখনো দেখেনি।

গোটা লেনিভি চড়াই ফাটিয়ে ত্রফিম কদর্য গালমন্দ করতে লাগল এলজার উদ্দেশে। ওকে ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা হল। দরজার সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফ্রেমটা পর্যন্ত ভেঙে বসল সে। জিভ ওর জড়িয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পা টলছিল না।

ওকে শান্ত করার কম চেষ্টা করেনি টেনর। তার ইংরেজির উত্তরে ও রুশী মুখ খিস্তি করে বললে, টেনর তার শরীরে এঁটেলুর মতো লেগে আছে, ডলারের জন্যে রক্ত চুষে খাচ্ছে ওর।

তারপর টুপি খুলে সে গাইতে লাগল:

হেঁকে যায় দুষমনী ঝঞ্ঝা...

তুদোয়েভা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে টেলিফোন করতে শুরু করল। কিন্তু ত্রফিম ততক্ষণে গ্রামের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছে। সারা রাস্তা কাঁপিয়ে ও চেঁচাচ্ছিল:

"নিপীড়ন তামসিক শক্তির..."

গাঁয়ে মিলিশিয়ার লোক ছিল একটি, কাজ করে অন্য জায়গায়, কিন্তু বাস বাখরুশিতে। কী করা উচিত সে ভেবে পেল না।

একদিকে এটা শান্তি ভঙ্গ। অন্যদিকে লোকটা বিদেশী, ভিসা তার ফুরোয়নি। যা তা একটা কিছুও গাইছে না, গাইছে উচিত মতোই একটা গান, যদিও খেয়াল নেই তার।

'শেষ... সব খতম!' বাখরুশিনদের ঘরের জানলার কাছে ও চ্যাঁচাল। 'সব চুকিয়ে দিলাম। বাখরুশিতেই থেকে যাব আমি। আয় ভাগাভাগি করে নিই। বাড়ির যে অর্ধেকটা তোর ইচ্ছে সেই অর্ধেকটাই তুই নে। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। যেখানে জন্মেছি সেখানেই মরতে চাই। দুই ছেলে থাকলে বাড়ি শুধু এক ছেলেই পাবে এমন সোভিয়েত আইন নেই। আমি তেরেন্তি বাখরুশিনের আপন ছেলে। শাদারা আমায় ঠকিয়েছিল... দে আমায় কাগজ, কলখোজে দরখাস্ত লিখব আমি...'

ত্রফিমের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাছাড়া লোকও জুটে গিয়েছিল। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ রাস্তায় গিয়ে হাত ধরে ত্রফিমকে টেনে নিয়ে এল ঘরের ভেতর।

'ভাগাভাগি করতে চাস কর। আমার আপত্তি নেই। করাতে কেটে ভাগ করে দেব শিগগিরই... এখন বাপু একটু ঘুমো। ভোর হতে দেরি নেই...'

'কাগজ দে আমায়, আর্জি লিখতে চাই আমি,' ত্রফিম দাবি জানাল, 'এখানে আমার সেরিওজা আছে, ও দেশে কেউ নেই... সেখানে আমি একা। এলজা আমার কে? আমায় ও নিঃশেষ করে খেয়েছে। একটা খালি বোতল হয়ে বেঁচে থাকতে আর চাই না। আমার নাতি আছে সেরিওজা... আমায় সে ভালোবাসে। বুড়ো পাইক মাছটার ওপরেও ওর কী মায়া... কাগজ দে আমায়।'

বহু কষ্টে শোয়ানো হল ত্রফিমকে। নিজের জীবন নিয়ে ও বহু বিলাপ করল, অভিশাপ দিল এলজাকে।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ, ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা এবং ছুটে আসা টেনর ঘুমতে পারল না মাঝ রাত পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত চোখ বুজে এল ত্রফিমের। ঘুমল সে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে। ঘুমের মধ্যে গালাগালি দিলে। সেরিওজাকে ডাকলে।

সকালে সে জাগল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের আগে। জলের মতো শান্ত, ঘাসের মতো বিনীত।

ভাইকে দেখে বললে:

'আহাম্মকটাকে মাপ করিস পিওতর। নেশা চড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবই মনে আছে।' লাল ফোলা ফোলা চোখ তুলল সে, তখনো সে চোখ থেকে নেশা কাটেনি। 'ঠিক করলাম, বাখরুশিতে থেকে যাব।...'

'কিন্তু এ তো এক গ্রাম থেকে উঠে আর এক গ্রামে গিয়ে বসা নয়...'

'তা জানি। কিন্তু সেই আমার ইচ্ছে... এইখানেই আমার দেশ, আমার নাতি সেরিওজা, ও ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই। থেকে যাব, বাস্। নিজের জন্মভূমি গ্রাম থেকে তো কেউ আমায় জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারে না...'

চোখে ওর স্থির সংকল্প। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

'আর তোর ফার্মের কী হবে?' সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ।

'ফার্ম-টার্ম নেই আমার। কিছুই নেই। দারিয়া জানে। তাকে জিজ্ঞেস করিস... আমার এই যা দেখছিস সেই সব। অনুতাপের সময় পেরিয়ে যায় শুধু মৃতের পক্ষে। আমি তো এখনো মরিনি।'

'এখানে কী করবি তুই!'

'শস্য গুদামে দারোয়ানির কাজ করব।'

এতে চটে গেল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ। গলা চড়িয়ে বললে:

'ন্যাকামি রাখ ত্রফিম। তোর কথায় বিশ্বাস করি না আমি। বড় বেশি গলাবাজি করছিস তুই, হাত নাড়ছিস, লোককে তাক লাগিয়ে দিতে চাস, যেন কৃপা করতে চাস কাউকে। এই হল একদিক। অন্যদিকে, ভয় পাচ্ছিস ফের বুঝি মত পালটে যাবে, তাই পাঁচ জনের সামনে নিজের জাহাজটা পুড়িয়ে ফেরার পথ বন্ধ করতে চাস। ন্যাকামিটা অনেক সময় সত্যির মতো দেখায়, কিন্তু তাই বলে সেটা সত্যি হয় না কখনো, খোদ ওঝা নিজে যাই ভাবুক।'

'অন্তত আধখানাও যে বিশ্বাস করে সেও ধন্য। আমি নিশ্চিত সংকল্প করেছি।'

'সেটা কতদিনের জন্যে! তোর সবই যে ওখানে, নিজের গুহায়। আমাদের মাটিতে যে তোর পায়ের কড়ে আঙুলটাও নেই। দুদিন যেতে না যেতেই যে ফার্ম থেকে তোর ডাক পড়বে। সম্পত্তির টান। তার বাঁধা গোলাম যে তুই। তুই জীবন কাটিয়েছিস, কাটাচ্ছিস কেবল যে তোর নিজের জন্যে, কারো জন্যে এতটুকু পরোয়া না করে...'

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ তার গায়ে আটপৌরে কোটটা চাপিয়ে পকেটে একটা কাগজে মোড়া মাছের চপ নিয়ে বেরিয়ে গেল। গেটের হুড়কোর শব্দটা কানে যেতে ত্রফিম ফিরল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার দিকে। এতক্ষণ চুপ করে ছিল সে:

'ও ফার্ম তো আমার নয়। অবিশ্যি সেটা বড়ো কথা নয়। আমি ওর মাথা সত্যি, আমি নইলে ফার্মটার মাথা থাকবে না তাই নয়, প্রাণই থাকবে না। কিন্তু এলজাই কি আর সে ফার্মের মালিক। পচা টায়ারের মতো ফার্মটা যে-কোনো সময় ফেটে যেতে পারে। এমন অনেক ফার্মই তো ফেটেছে, আমি সেগুলো হস্তগত করেছি। আমাদের ফার্মটারও সে হাল হতে পারে।

একটা বড়ো রকম মোড় নিতে হলেই পতন… পিওত্তরের চেয়ে আমি ভালোই জানি কী ঘটে… শুধু গায়ের শার্টটা ছাড়া আর কিছুই নিজের থাকে না কারণ সবাই একেবারে শেষ কড়ি নিয়ে খেলে। দুর্দিনের জন্যে কারো কোনো সঞ্চয় নেই। সবই লগ্নিতে। এমন কি ঘরের যে কুকুরটার দাম দু ডলার, ফার্ম ডুবলে সেটা পর্যন্ত ক্রোক হবে। কুকুরটাকে পর্যন্ত চলতি পুঁজি বলে ধরা হয়। হাসির কথা, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী আইভান টুড যখন ডোবে, তখন নিজের কুকুরটা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয় তাকে। খাঁটি জাতের কলি কুকুর। কুকুরটা কোঁকাত, আমার ঘরে থাকতে চাইত না। তবু ঋণের দায় মেটাতে হল তাকে। ওর দাম ধরা হয়েছিল কুড়ি ডলার। আমি আপত্তি করিনি। কুকুরটা তখনো বাচ্চা। পরে মারা যায়, টুডের ছেলেটার জন্যে কেঁদে কেঁদে। আমিও তেমনি টেঁসে যেতে পারি।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, 'থাক, থাক ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ, হঠাৎ এসব কী বলতে লেগেছেন… কথা নেই, বার্তা নেই, একটা মানুষ হঠাৎ কাঙাল হয়ে পড়ল — এ কি আর দুনিয়ায় হয়।'

'আমাদের ওখানে ঠিক এই-ই হয়। আমাদের ওখানে বেঁচে থাকা যায়, প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা যায় কেবল ঐ শেষ সীমাটায়। আর তোমার শুয়োরটা যদি তোমার প্রতিযোগীদের চেয়ে কয়েক পাউন্ড বা কয়েকদিন পিছিয়ে পড়ে, তবে সে তোমায় খাবে। এমনি কি লাখপতিরা পর্যন্ত তাদের প্রতিটি পেনির হিসেব মেলায়। পেনির হিসেব না রাখায় লাখ টাকা খতম এ আমিই দেখেছি। চামড়ার নিচে চর্বি যার নেই, তার পক্ষে ছোট্ট একটা গরমিল কী জিনিস তা আমি জানি। সবই কারবারে। প্রতি বছরেই এক একটা অতল গহ্বর লাফিয়ে চলেছি আমি। প্রতি বছরেই ভয় হয়, লাফটা বুঝি বা এক ইঞ্চির জন্যে ফসকে যাবে। আর আমি এখানে বসে থাকলে অবস্থাটা সেই লাফ মারার মতোই। জানি না ঘটনাচক্রে কোথায় দাঁড়াব। অন্য লোকের জন্যে লাফ মেরে মেরে নিজের আয়ুক্ষয় করায় ঘেন্না ধরে গেছে। অথচ লাফ না মেরেও উপায় নেই। কেন না সেখানকার গোটা জীবনটাই হল হয় সৌভাগ্যের পুরো লাফ, নয় মরণের কমতি-লাফ। এক ইঞ্চির ফারাক… সে এক ইঞ্চি কী তা তোমরা এখানে জানো না…'

ও যা বলছিল তার খুব কমই মাথায় ঢুকছিল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার। বলতে গেলে হয়ত অসঙ্গত কিছু বলে ফেলবে এই ভয়ে চুপ করে রইল সে। তার কথাবার্তা ত্রফিমের কাছেও প্রয়োজন ছিল না। কারণ তার সঙ্গে কথা বলছিল না ত্রফিম, বলছিল নিজের সঙ্গে। দুজন ত্রফিম, দুটো কণ্ঠস্বরের লড়াইয়ে মীমাংসা করতে চাইছিল সে। একজন ত্রফিম ধরাশায়ী হয়ে চুপ করে গেছে, কিন্তু তখনো নড়ছে। দ্বিতীয় জন আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে তাকে, যাতে ফের কখনো সে উঠে দাঁড়াতে না পারে, মুখ না ভেঙচায়।

অর্থোডক্স ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে মলোকান মত গ্রহণ করাটা এর চেয়ে অনেক সহজ বোধ হয়েছিল। এখন যে সত্যি সত্যিই তার গোটা জাহাজটাকে পোড়াতে হবে। আর জাহাজটা পুড়ছে খুব খারাপ। আগুন উসকিয়ে তোলা দরকার। তাই সে আধ গ্লাস ভোদকার সঙ্গে মাছের চপটা শেষ করে খোয়ারি ভাঙবে ঠিক করল। তা করার পর ফের নালিশ করতে শুরু করল:

'পিওতর আর এদের হাল সবই ভালো। এরা কখনো ডুববে না। ফসল হানি কি শুয়োরের মড়ক যদি বা হয় তাতেই কী? পশু চিকিৎসকরা সব ছুটে আসবে। কর্জ মিলবে। মিতিয়াগিন ডাঙ্গায় শ' দুয়েক কাঠের ফ্রেম কেটে রাখতে পারে পিওতর, ভালো দরে ছেড়ে দেবে। আমারও বন আছে। কিন্তু তার একটা গাছও আমার নয়। সব হিসেব করা, টাকা ধরে দিয়েছে আগেই। আর সে টাকায় হাম্বা উঠছে গরুর, চর্বি জমছে শুয়োরের। শেষ ডলারটি পর্যন্ত কারবারে ঢালা। প্রতি শরতে একবার করে সব দান ফেলে বাজী ধরতে হয় জুয়ায়। প্রতি শরতে ফাটকা বাজার জানিয়ে দেয়, পরের লাফ মারতে পারবে কি, না কি জ্যান্ত গিয়ে কবর নেবে। প্রতি বছরেই পাতালে পড়ব এই ভয়। যদি রেহাই পাই, তবে যে লাভ হল তাতে আনন্দ নেই। লাভটা বেশিই হোক কমই হোক, তা সবই যাবে ফার্মে। তার হুইলটা এক মিনিট এক দণ্ডের জন্যেও থামতে পারবে না। যন্ত্রগুলো ক্রমাগত উন্নত করে তুলতে হবে, বাড়তি হাত, বাড়তি পেটের ছাঁটাই করতে হবে, তা না পারলে ঐ পেটই তোমায় খাবে।'

এই সব কথা শুনে ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার পেটের মধ্যে কেমন ঘুলিয়ে উঠছিল। ঠাণ্ডা হয়ে আসা এক ঢোক চা খেল সে, তার পর আয়েস করে বসল এই ভেবে যে ত্রফিম তার কথা শুরু করেছে মাত্র, দুপুর পর্যন্ত

বসে থাকবে। কিন্তু ত্রফিম উঠে দাঁড়াল, বাকিটা শেষ করল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই:

'নিজের মজুরদের ওপর, এমন কি ধর্মভাই মলোকানদের ওপরেও যদি একটু কৃপা দেখাও, নতুন মেসিন এনে তাদের ছাঁটাই না করো, প্রতিবেশী প্রতিযোগীরা যা আগেই করেছে, তাহলে অবস্থাচক্রের কাছে তোমার কোনো ক্ষমা নেই, যে শরতে লাভ গোণার কথা, সেই শরতেই খতম।'

মাথায় টুপি দিয়ে যাবার উদ্যোগ করল ত্রফিম। কিন্তু ভাষণটা ওর শেষ করা উচিত। শেষ করলে এই ভাবে:

'অল্প কি মাঝারি লাভ আর ভদ্র রকমের রক্ত চোষাও আমাদের ওখানে হতে পারে না। লোকের ওপর করুণা করলে নিজেই মরবে। যাক, দূর হোক গে ছাই!.. পরের গাড়ির বড়ো চাকাটা হওয়ার চেয়ে বরং শক্ত মাটিতে, রোদ্দুরে শস্য গুদামের দরোয়ান হওয়াই ভালো... আমি বাখরুশিতেই থেকে যাব।'

ত্রফিম ছুটে বেরল ঘর থেকে। রাস্তায় নেমে মনে হল, দারিয়ার কাছে যাবে নাকি, নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাবে? কিন্তু ঠিক করল সেটার দরকার নেই। এই ভেবে সে চলে গেল বড়ো সড়কের দিকে। রাস্তার একটা গাড়ি কি ট্রাক ধরে শহরে যাবে। ফার্মে সে আর ফিরবে না এই অনড় সিদ্ধান্তটা কি আর সত্যি বাখরুশিতে ঘোষণা করা যায়।

৪৫

ত্রফিম বাখরুশিতেই থেকে যাবে এ সংবাদে গ্রামটা চঞ্চল হয়ে উঠল তার অপ্রত্যাশিত আগমনের চেয়েও বেশি। সম্ভবত তার কারণ, ত্রফিমের কথাবার্তা, তার ফার্মের চাষ চালাবার সুযোগ্য পদ্ধতি নিয়ে তার আলোচনা — তার সবকিছু থেকে এরকম অপ্রত্যাশিত সংকল্পের জন্যে কেউ তৈরি ছিল না। বরং এই আশাই করা যেত যে ত্রফিম এখানে যে আতিথেয়তা ও সম্মান পেয়েছে তা তার ফার্মে ফিরে গিয়ে সব ভুলে যাবে, যদিও টেনর তা ভুলবে না। বাখরুশিতে যা দেখে ও তারিফ করেছে তা সবই ভুলে যাবে, মনে রাখবে শুধু কলখোজ জীবনের তুচ্ছ ঘাটতিগুলো, সেইগুলোই বড়ো

করে তুলবে। আর কোথাও হয়ত, কোনো খবরের কাগজের নিন্দুক বা কোনো কলঙ্কসন্ধানীর সঙ্গে আলাপে ও রুশ দেশে জন্ম ও সেই কারণে বিশ্বাসযোগ্য লোক হিসাবে ভণ্ড আফশোসে স্বদেশের কুৎসা রটাবে। হয়ত কমিউনিস্ট গোলামি ও কলখোজী বিড়ম্বনায় তার ভাই পিওতর ও ভূতপূর্বা স্ত্রী দারিয়া বাস করছে বলে খেদ করবে, বলবে দারিয়া যেন তার বাছুরগুলোর সঙ্গে সারা জীবনের জন্যে বাঁধা, কোনো রকম আনন্দের কোনো স্বাদই পায়নি।

সবাই জানে, ইচ্ছে হলে সবকিছুর ওপরেই কালি লেপা যায়, সন্দেহ ঘনিয়ে তোলা যায়। কে বাধা দেবে যদি ও বলে, আগের কালে দুঃস্থরা যে গাছের ছালের জুতো পরত সেই লাপতি ও পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের ঘরে নিজের চোখে দুয়োরের কাছে হুকে ঝুলতে দেখেছে। তার প্রমাণে ফোটোগ্রাফও দাখিল করা যায়। কেউ তো আর ভাববে না যে সে লাপতি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের লোকান্তরিত বাপের, এই পরে সে জোয়ান বয়সে কারখানার মরশুমী কাজে যেত। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ সেটা রেখে দিয়েছে।

ইয়েলেনা সের্গেয়েভনাই যখন এখনো জানে না, তখন কে জানবে আমেরিকায় যে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ তার নিজের বাড়ি আর পাশের দুটো কুঁড়েকে "পুরনো আমলের মিউজিয়ম" করবে ঠিক করেছে। দেয়াল থেকে পুরনো বেঞ্চিগুলো সে যে বাদ দেয়নি, নিজের গ্রামের নয় এমন কি আশেপাশের গ্রামের পুরনো গেরস্থালি জিনিসপত্র জড়ো করে সে যে তার চিলেকোঠাটা বোঝাই করেছে সে তো আর খামোকা নয়। ঠাকুর্দার আমলের দেবপটগুলোও রয়েছে ঐ চিলেকোঠায়।

বলে দিলেই হল "দেখো, তোমার শ্রীমান কমিউনিস্ট পিওতর বাখরুশিনের আসল চেহারা!" তখন যাও গিয়ে প্রমাণ করো গে যে একটা মিউজিয়ম গড়ার শুভ প্রেরণা থেকে সে এ সব করেছ।

বেশ রঙ চড়িয়ে, যুক্তি গ্রাহ্য করে নিন্দে রটাতে পারে যে জিভ, তার চেয়ে ভয়ংকর আর কিছুই নেই। আর ঠিক সেইটেই আশা করা যেত ত্রফিমের কাছে, কারণ সঙ্গতিহীনতাটা ওর শুধু স্বভাব নয়, তার জীবনের ধরন।

সকালে সে বললে দুদোরভ হল একটা “চাবি দেওয়া মোরগ-ঘড়ি” আর সন্ধ্যাতেই তাকে ঐ একই পেলাগেয়া তুদোয়েভার সামনে আকাশে তুলল এই বলে যে সে “ভবিষ্যতের নবী”। পান্তেলেই দরোখভ তার কাছে আগে ছিল “পিওতরের খেলার জন্যে একটা শুয়োরের ফাঁকা পাতনা” আর পরে সেই পান্তেলেই হয়ে দাঁড়াল “স্বদেশী তাজ্জব”। আবার পরের দিনই তাকে তুলনা করলে ভুয়ো ব্যাঙের ছাতা বলে “দেখতে ভারি খাসা, খেতে সর্বনাশা।”

কিন্তু কারো মাথায় কখনো আসেনি যে ত্রফিম সবচেয়ে প্রধান ব্যাপারটায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়াবে। অথচ তাই সে করল। সকলেই জানল ত্রফিম কী ভাবে নিজের ফার্মের জীবনটাকে অভিশাপ দিচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুরারোগ্য ব্যাধিগুলো খুলে দেখাচ্ছে। খুলে দেখাচ্ছে সঠিকভাবেই, যদিও রাজনীতির দিক থেকে সে একটা অজ্ঞ লোক।

‘চৈতন্যোদয় হল তাহলে,’ তুদোয়েভ বলল, ‘নিজের গায়ে ছেঁকা খেয়ে বুঝল যে ও তার ফার্মের মালিক নয়, তার গোলাম, আমেরিকার আসল মালিক মিঃ ক্যাপিট্যাল ওকে শুধু মনিব-মনিব খেলতে দিয়েছে।’

বুড়োরা তুদোয়েভের চিরন্তন শ্রোতা, তাদের মধ্যে সে বহুক্ষণ এই নিয়ে মিটিং চালাল, পুঁজিবাদী দেশ সম্পর্কে তার নিজের ধারণা বললে:

‘সম্পত্তি যদি সবচেয়ে ঘায়েল কোথাও হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে সেইখানে যেখানে সম্পত্তিতে হাত না দেবার আইন চালু। আইনটায় হাত দেওয়া চলবে না, ওদিকে সম্পত্তি ঘায়েল। সেই জন্যেই সেখানকার প্রতিটি ধনী ঘুমতে যায় ভয়ে ভয়ে, সকালে উঠে হয়ত দেখবে সে কাঙাল,’ পিওতর বাখরুশিনের কথার পুনরাবৃত্তি করল সে।

শুয়োরপালক পান্তেলেই দরোখভ ত্রফিমের খবরটা পেয়েছিল ছেলের কাছ থেকে। নিজের মনে সে ঠিক করল:

“তার মানে আমাদের এরোড্রামের কাছাকাছি সেঁধোচ্ছে।”

ত্রফিমের সদুদ্দেশ্যে তার বিশ্বাস ছিল না। মিস্টার বাখরুশিন তার কাছে ছিল কেবল নেকড়ে, আর কিছু নয়।

পেলাগেয়া কুজমিনিচনারও একই মত। দারিয়া স্তেপানোভনার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সে সন্তর্পণে, তাকে কোনো রকম আঘাত না দিয়ে নিজের ভাবনাটা জানাল:

'তুই মেয়ে এ নিয়ে অত ভাবিস না তো… সকলের কাছে ও যা, তোর কাছে অবশ্য ও তা নয়। মরলেও কবরে তো যায়নি। আমার কেবল ধারণা, একটু খেলবে তারপর চলে যাবে।'

'ওর এ খেলার দরকার কী? তুই ওর জীবনের ঘটনা জানিস না, আমায় ও সব সেদিন বলেছে কবরখানায়। পিওতরের ইয়েলেনাকে বলেছে আরো অনেক কথা… আমার কাছে ইয়েলেনা এসেছিল। বললে, মানুষটার রাজনীতির চোখ খুলছে। বলে, গহ্বর লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া — একে জীবন বলে না। এমনভাবে গোটা পুঁজিবাদের শ্রাদ্ধ করলে যে তা রেডিওয় ব্রডকাস্ট করার মতো। তার মানে ভেতরে ভেতরে এই সব জমেছিল। তর্ক করেছে নিজের সঙ্গে। দুদোরভের সঙ্গে যে তর্ক করেছে সেটা হয়ত আমাদের জীবনটা ভালো করে বোঝার জন্যে… তারপর ওই পচা ফোড়াটা ওর ফেটে গেল। আমাদের কাছে নিজের কাছে ও নিজেকে সাফ করে নিতে চাইছে।'

তুদোয়েভা সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল কিন্তু নিজের মতটা ছাড়ল না:

'তুই বাপু ভারি ছেলে মানুষ, দারিয়া, এখানে কী কাজ করবে ও? ভেবে দ্যাখ। গুদামে কি ঘোড়ার আস্তাবলে লোকেদের দরজা খোলার জন্যে দাঁড়িয়ে কি আর সত্যিই থাকতে পারে। তার ওপর এখন তো ওর পেনসনের বয়স। কে পেনসন দেবে ওকে? কিসের জন্যে? ওর ফার্মের জন্যে? তার মানে কাজ করতে হবে। কোথায় কাজ করবে? কলখোজের বোর্ডে তো ওকে আর নির্বাচন করা চলে না!'

'দরোয়ানি থেকে শুধু করবে। তাতে খারাপের কী আছে? দরোয়ানির কাজ যদি ভালো করে তো সেটা লোকের নজরে পড়বে। পরে উন্নতি হবে…'

'কিসের উন্নতি?.. জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারি করে দেবে লোকে?'

'সেক্রেটারি কেন… ত্রফিমের নিজের গুণ আছে। ব্যবসার ঝোঁক ওর বরাবর। আমেরিকায় তা আরো পাকা হয়ে উঠেছে… আর আমাদের এই দোকানদারির হাল যে কী তা তুই নিজেই জানিস… প্রথম শ্রেণীর শসা বিকোয় তৃতীয় শ্রেণীর দরে… যে কোনো গুদাম ম্যানেজারকেই ত্রফিম লজ্জা দিতে পারে।'

এতে সায় দিল তুদোয়েভা, কিন্তু পুরো নয়:

'ও আর বলতে হবে না। বিক্রির ব্যাপারে বলা যায় যে ওস্তাদ। চেহারাটাও

তেমনি। মাথায় টুপি, চাঁছা ছোলা মুখ, পাইপ। কলখোজের আয় ও লাখ দশেক বাড়াতে পারে বটে… বীটের শাকগুলোর জন্যেও টাকা আদায় করে নেবে… তবে মনে রাখা ভালো: যতই খাওয়াও, নেকড়ের চোখ বনের দিকে।'

'কিন্তু বন কি আর ওর আছে?' প্রশ্ন করল দারিয়া। 'বনের বাকি আছে কেবল ঐ ঝোপটুকু, যার নাম সের্গেই… ওকে দেখলেই যে ও কেঁপে কেঁপে সারা। কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করে ওর জন্যে। ওকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া সাজে…'

নীল ঠোঁট নড়তে লাগল তুদোয়েভার। তারপর জিভ দিয়ে চেটে সে বললে:

'ওকে তাহলে ক্ষমা করবি ঠিক করেছিস? যা কিছু করেছে সব ভুলে যাবি? ওরে দারিয়া, দারিয়া। তুই যে একেবারে ভেড়ী হয়ে বসেছিস।'

এতে আহত হল দারিয়া স্তেপানোভনা। বাঁ চোখের পাতা কেঁপে উঠল তার। সঙ্গে সঙ্গেই সে পেলাগেয়া কুজমিনিচনার জবাব দিল না। ভাবল একটু। জানলার দিকে তাকাল, যেন দেখে নিল আঙিনায় কী রকম খেলা করছে সেরিওজা। তারপর পাশের শাদা চুলগুলো ঠিক করে বলল:

'ত্রফিম যদি লোকের সামনে তার প্রায়শ্চিত্ত করে, শেষ জীবনটা নিজের আপন দেশে কাটায় তাতে আমি খারাপ কিছু দেখি না। পিওতরের মতো আমিও ওর সব কথা বিশ্বাস না করলেও কিছু তো বিশ্বাস করতে হয়… ওর ভেতরে কিছু তো একটা নাড়া খেয়ে উঠেছে… ও যাতে না থাকে সেটা বোঝাবার দায় তো আমার নয়। ওর আমেরিকা ফেরা উচিত সেটা আমি বলব কেন! তুই এটা বুঝতে পারছিস নাকি পারছিস না?'

এর পর অর্থহীন কিছু "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে" বলে যব চাষের দিকে কথার মোড় ফেরানো ছাড়া তুদোয়েভার কিছু করার রইল না। যব এবার "মোটা দানায় বড়ো বড়ো গুছিতে আগে আগে পেকে" সবাইকে অবাক করে দিয়েছে।

তুদোয়েভার চালাকি টের পেয়ে বিষণ্ণভাবে হাসল দারিয়া, শাদা দাঁতের ঝলক দেখা গেল একটু, তারপর শান্তভাবে বললে:

'ভাবনা সকলেরই আছে, কারো বা যব নিয়ে, কারো বা অন্য কিছু নিয়ে।'

তুদোয়েভা তার উত্তর না দিয়ে বিদায় নিতে শুরু করল:

'এই সেরেছে, কটা বাজল ... আমার টেনরটি বোধ হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে। এই সময় ওকে ওর দুই নম্বর খাবার দিই — ও বলে "লাঞ্চ"। অল্প নোনা শসা আর চায়ের বদলে ঘোল — তাতে নাকি ভুঁড়ি কমবে। চললাম ...'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেল সে, যদিও ভালোই জানত যে অভ্যাগত ভবনে টেনর নেই।

চলে যাবার সময় হয়ে আসায় টেনর এই শেষ দিনগুলোর প্রতিটি ঘণ্টা উশুল করে নিচ্ছিল। এখন সে কথা বলছিল এক নবীন স্থপতির সঙ্গে, লেনিনভি চড়াইয়ে নতুন বাখরুশি গ্রামের প্রকল্পটি তারই রচনা।

স্থপতি তাকে দেখাল রাস্তা ঘাট, এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় নির্মিতব্য গৃহগুলির নকসা। বেশি আগ্রহজনক নকসাগুলোর ফটো তুলে নিল টেনর। যেখানে ওরা কথা কইছিল সেটা পুরনো ক্লাবঘর। সেখানে নতুন গ্রামের পরিকল্পনা নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল।

কলখোজের পার্টি সেক্রেটারি গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ দুদোরভও সেখানে জুটল। টেনরকে অভিনন্দন জানিয়ে রসিকতা বিনিময় করে ও জিজ্ঞেস করল:

'প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করি, ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ যে আমেরিকায় ফিরবে না সিদ্ধান্ত করেছে তাতে আপনার দুঃখ হচ্ছে না কেন বলুন তো? আপনার আগামী বই থেকে এমন একটা চরিত্র লোকসান হয়ে গেল।'

'দুঃখু কেন হবে গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ?' পাল্টা প্রশ্ন করল টেনর। 'আমায় যা খুশি বলুন, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বলবেন না। আপনারা কি সত্যিই ভাবেন যে এই চতুষ্পদটি যে পঞ্চাশ হাজার কি আরো বেশি ডলার এলজাকে না জানিয়ে দুর্দিনের জন্যে "জেনারেল মোটর্স"এর শেয়ারে ঢেলেছে তা ও ছেড়ে দিতে পারে? মাননীয় গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ, বহু দেনা ও হাজারটা দায় ঘাড়ে নিয়ে আমি কি এমন একজনকে নিয়ে বই লিখব যে আমেরিকায় ফিরবে না, এই কি ভাবছেন? তিনটে "হা-হা", আপনাদের চালিয়াত ছোকরারা আজকাল যা বলে। আমায় যা খুশি ভাবুন। ব্যবসায়ী, কারবারী, দাঁওবাজ — আপত্তি করব না। সম্ভবত এ সব আখ্যা কম বেশি আমার ওপর প্রযোজ্য। কিন্তু যে সমাজে আমার কাজ, সে সমাজ থেকে অন্যরকম কিছু আচরণ আমি করতে পারি না আর আমার কাজ চলে যে

আইনে সেটা হয়ত আমার মনঃপূত নয়। কিন্তু ফিওদর পেত্রভিচের সঙ্গে আমার যতটা পরিচয় আপনার সঙ্গে ততটা নেই। এবং যতটা অকপট ও আস্থাশীল হওয়া আমার ইচ্ছে ততটা হয়ত আমি নই। কারণ আমার "ঈশ্বর আমার অভ্যন্তরে, দেব কুলুঙ্গিতে নয়"। এ কথাটা বলেছিলেন ঐ চুতুষ্পদ ভদ্রলোকটি এবং এখন আমি তার প্রয়োগ করছি নিজের সম্পর্কে, যদিও প্রত্যক্ষ অর্থে নয়। বাখরুশিনের সঙ্গে সফরের উদ্যোগ নেবার আগে আমি সেই সব কটি বাঁধন যাচাই করে দেখেছি যাতে এই মনুষ্যসদৃশ জীবটি আমেরিকার সঙ্গে বাঁধা। তা না করে আমার উপায় ছিল না। ঝুঁকি নেবার মতো কোনো তহবিল আমার নেই।'

'আর ওর নাতি সেরিওজার বাঁধন সম্পর্কে কী বলবেন, যাকে ও মাথায় করে রাখতে রাজী?'

খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিল টেনর:

'ফের বলি, চতুষ্পদ যদি দু পায়ে দাঁড়ায় তখন তাকে মানুষের মতো লাগে। মানছি তা লাগে। নাতির জন্যে ওর স্নেহ জেগে উঠেছে। ও নিজেও বিশ্বাস করে বসেছে যে ওর সমস্ত জীবন এখন নাতিটির জন্যে। কিন্তু এই উদার অনুভূতি ওর হৃদয় থেকে জাগে নি, হৃদয়ে এসে পৌঁছিয়েছে। তা যেই সরে যাবে অমনি সে চারপায়ে ভর দেবে, দু পায়ে আর দাঁড়াতে পারবে না। কারণ চতুষ্পদের পক্ষে চারপায়ে দাঁড়ানোটাই স্বাভাবিক, দু পায়ে হাঁটা হল একটা শক বা বলা ভালো সার্কাসী খেল। আমি এই ভাবি, আর তাই ভাবে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচও, আরো সঠিক বললে আমি ভাবি পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের মতো, অতি জটিল সঙ্গীতও যে শুনে বুঝতে পারে। অর্কেস্ট্রার রূপকে বলতে হলে শ্রীমান নেকড়ের স্বভাবটাকে বলা যায় একটা রূঢ় সুর-ভণ্ডুল, যার সঙ্গে সঙ্গত করছে একটা পুরনো সামোভারের গোঙানি আর একটা বেহালা, বিশ্বাসী কানে যা কখনো শোনাচ্ছে ভাবাকুল কখনো ট্রাজিক। কিন্তু সেটা শুধু বিশ্বাসী কানের জন্যে। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কানে নয়, আমার কানে নয়, আশা করি আপনার কানেও নয়। এ ছাড়া আর আধখানা কথাও আমি বলতে রাজী নই, কারণ আপনাদের নীল চোখে আমার একজন স্বদেশবাসীকে আমি আর ছোটো করতে রাজী নই।'

৪৬

ইতিমধ্যে ত্রফিম হাঁটছিল শহরের প্রধান রাস্তা, লেনিন রাস্তায়। রাস্তায় ডিউটিরত মিলিশিয়ার একটি লোকের কাছ থেকে সে জেনে নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে থেকে যাবার দরখাস্ত কোথায় দিতে হবে; মিলিশিয়ার লোকটি ভেবেচিন্তে বলে মেহনতীজন প্রতিনিধিদের অঞ্চল সোভিয়েতের সভাপতির কাছে দেওয়া দরকার এবং কী করে সেখানে যেতে হবে তাও বলে দেয়।

তাই লেনিন রাস্তা ধরে হাঁটছে ত্রফিম। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল কী বড়ো বড়ো বাড়ি উঠেছে শহরটায় — এই যে শহরটাকে ও আগে চিনত এমন কি বাস করে গেছে, হয়ত আবার বাস করবে। "জেনারেল মোটর্স"এর শেয়ারে সাতান্ন হাজার ডলার — আইন অনুসারে সে টাকা আমেরিকা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। আর "জেনারেল মোটর্স"এর কারবার যদি ভালো চলে, তাহলে এই সাতান্ন হাজার ও চারশ তেইশ ডলারের সঙ্গে ডিভিডেণ্ট হিসাবে আরো কিছু যোগ হবে... না এখানেও মুশকিলে পড়বে না, মোটেই না।

একটা মস্তো খাবারের দোকানের সামনে থামল ত্রফিম, দোকানটায় বড়ো বড়ো জানলা, খরিদ্দারদের যাওয়া আসার আর শেষ নেই। তা দেখে কলখোজী দোকানের আইডিয়া মাথায় এল ওর — এরকম একটা দোকান সে খুলতে পারে। আসলে কি আর গুদামের দরোয়ান হয়ে সে থাকবে। ওটা হল কথার কথা। নিদেন পক্ষে তার সিদ্ধান্তটা যাচাই করে নেবার জন্যে।

সোৎসাহে ভেবে চলল ত্রফিম। একটা ট্রাক যাবে, একটা আসবে। দুঘণ্টা বাদে বাদে মাল যাবে বাখরুশি থেকে। তাজা মাংস, টাটকা দুধ, ক্ষেতের শর্বজি, রেফ্রিজারেটর থেকে মাখন। চাই কি হ্যাম, বেকন...

চমৎকার।

কলখোজী দোকানটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ত্রফিম। খরিদ্দারদের চাহিদা জেনে নিচ্ছে। টেলিফোন করছে বাখরুশিতে: "শ তিনেক পিকিং হাঁস আর পাঁচ পিপে মুরম শসা পাঠিয়ে দে পিওতর।" "ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি," উত্তর

দিচ্ছে পিওতর। খুশিতে সে ভরপুর। দোকানটার কল্যাণে টাকা আসছে কলখোজে, তার প্রতিটি কোপেকেই ত্রফিমের যশ।

নতুন জীবনের চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকায় ত্রফিম লক্ষ্য করেনি কখন সে অঞ্চল সোভিয়েতের বাড়িটায় এসে পৌঁছেছে। সভাপতির সঙ্গে কোথায় দেখা করা যাবে জিজ্ঞেসাবাদ করে নিয়ে সে লিফটে উঠল, হাজির হল রিসেপশন ঘরে।

সেক্রেটারির কাছে সে নিজের পরিচয় দিল, 'আমি আমেরিকা থেকে এসেছি। এই আমার সফরের অনুমতি। এই আমার ভিজিটিং কার্ড।'

সেক্রেটারি সভাপতির কক্ষে অন্তর্ধান করল। মিনিটখানেক বাদেই ফের দরজা খুলে গেল, সেক্রেটারি তাকে ডাকল ভেতরে।

'আসুন, আসুন মিঃ বাখরুশিন ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ,' সভাপতি বললেন, 'আমাদের এলাকার বিখ্যাত লোক, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বাখরুশিনের আমেরিকান ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম। বসুন। আমার কাছে কোনো নালিশ নেই তো? বাখরুশিতে কেউ আপনার অপমান করেনি তো?'

সেক্রেটারির কাছ থেকে সভাপতির নাম জেনে নিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল ত্রফিমের। এখন সেটা জানতে চাওয়া ভালো দেখায় না বলে মিঃ প্রেসিডেণ্ট বলে ডাকাই স্থির করল।

'না মিঃ প্রেসিডেণ্ট, একেবারেই অন্য ব্যাপার। আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম একেবারেই অন্য কাজে।'

এই বলে ত্রফিম মস্ত ঘরখানায়, লেখার টেবিলটায়, বহু চেয়ার পরিবেষ্টিত দ্বিতীয় টেবিলটায় চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর ভয়ে ভয়ে লেনিনের ছবিটার দিকে চেয়ে নির্দিষ্ট আসনটায় বসল।

'বলুন তাহলে মিঃ বাখরুশিন।'

'মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমি আপনার কাছে এই আর্জি নিয়ে এসেছি যে আমি বাখরুশিতেই থেকে যেতে চাই, এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার ইচ্ছে।'

'সে কী! অনেক দিন থেকেই এ সংকল্প করে রেখেছেন নাকি?'

'কাল রাতে স্থির করলাম।'

'কী কারণে মিঃ বাখরুশিন?'

'পুঁজিবাদের সঙ্গে চিরকালের মতো সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই। ওখানে আমি একলা। ওখানকার সবাই আমার পর। আর এখানে আমার নাতি রয়েছে সেরিওজা, তার কথা পর্যন্ত আমি জানতাম না। আমার "জেনারেল মোটর্স"এর শেয়ারের টাকাগুলো যদি আমায় রাশিয়ায় ফেরত না দেয় তো নয় নাই দেবে। তা ছাড়াই চালিয়ে নেব। কার কাছে কোথায় আর্জি দিতে হবে বলুন।'

'আমি যতদূর জানি আপনার সফরের মেয়াদ তো শেষ হতে চলেছে। আপনার দরখাস্ত দেখতে তো তিন চার দিনে হবে না।'

'আমার তাড়াহুড়া নেই মিঃ প্রেসিডেণ্ট। অপেক্ষা করে থাকব।'

জবাবে মৃদুস্বরে বললেন সভাপতি:

'কিন্তু সাধারণভাবে স্বীকৃত চলতি নিয়ম অনুসারে অন্য দেশ থেকে আগত কোনো নাগরিকের সফরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায় না সেই দেশের সম্মতি ছাড়া।'

'কিন্তু আমি ওদের সম্মতির পরোয়া করি না। কার কাছে আর্জি লিখতে হবে বলুন। আপনার কাছে, নাকি প্রধান মন্ত্রীর কাছে, নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে।'

সভাপতি বললেন:

'সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ভরোশিলভের কাছে।'

'কাগজে সবটা লিখে দিন ... আর মেয়াদের ব্যাপারটা, চিঠি যাওয়া আসার সময়টা — ও নিয়ে ভাববেন না। ভিসা না থাকলেও আমার গাঁয়ের জঙ্গল আমায় লুকিয়ে রাখতে পারবে। এই তো আর প্রথম নয় ... জোর করে তো কাউকে তার আপন দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'দেখছি, আপনি একেবারে মনস্থির করে এসেছেন, ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ ... তবু আপনাকে সাবধান করে দিই, আপনার ভাবনা বা সংকল্প বদলাবার জন্যে বলছি না, তবু জানিয়ে রাখি, এমনও হতে পারে যে আপনার আর্জি মঞ্জুর হল না ...'

'কেন হবে না? আমি কি শাদা মনে সর্বান্তঃকরণে থাকতে চাইছি না?'

ধৈর্য ধরে শান্তভাবে ব্যাখ্যা করলে সভাপতি:

'এই ধরনের ব্যাপার প্রথম দৃষ্টিতে অতি স্বচ্ছ মনে হলেও কখনো কখনো

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি দেখা দেয়। আপনার বেলায় ঠিক তাই ঘটবে একথা বলছি না, কিন্তু হুঁশিয়ার করে দেওয়া উচিত... আপনার গাঁয়ের জঙ্গলে এক মাস দুমাস তিন মাস লুকিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তারপর হেমন্ত... শীত... আমরা তো সাবালক মিঃ বাখরুশিন।'

'ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেণ্ট। কী করতে হবে সেটা জানা গেল... ধন্যবাদ... আশা করি সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ বাখরুশিনের সঙ্গে আপনার এ বছরে দেখা না হলেও সামনের বছরে ফের দেখা হবে...'

'দাঁড়ান... আপনি যে বলেছিলেন লিখে দিতে...'

'ধন্যবাদ। মনে থাকবে আমার। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি... ধন্যবাদ... আপনার মিলিশিয়া যদি আমায় দূর শুতিওমির বনে খোঁজ করতে যায় তো সেটা বেফয়দা হবে... আমার জোয়ান কালে লোকে আমায় বলত "ছেয়ে নেকড়ে", কেউ কেউ এখনো বলে... নিজের জন্মভূমিতে জীবন কাটাবার অনুমতি যতদিন না পাচ্ছি, ততদিন ও আখ্যাটা আমার শেষবারের মতো কাজে লাগুক। আর মিঃ গুবের্নিয়া প্রেসিডেণ্ট, সে অনুমতি যদি না পাই, তবে আমার স্বদেশের ভূমিতে মাটি নেবার জন্যে কারো অনুমতি চাইতে হবে না। ঈশ্বরের কাছেও নয়। গুড বাই মিঃ প্রেসিডেণ্ট। আসি!'

৪৭

ত্রফিম যখন বড়ো সড়কের বাসে করে ফিরল তখনো বেলা পড়েনি। গাঁয়ে পেঁছিতে এক কিলোমিটার পথও নয়। ঠিক করল সোজা দারিয়ার কাছে যাবে। টেনরের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হচ্ছিল না। সর্বোচ্চ সোভিয়েতে দরখাস্ত পাঠিয়ে তারপর জানাবে।

তার মারফত সে তার শেষ কথা ও অভিশাপ পাঠাবে এলজার কাছে, যে তার জীবন খেয়েছে, ফার্ম খেয়েছে। আর শেয়ারগুলো আছে যে বিশ্বাসী মলোকানের কাছে, সে সেগুলো বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দেবে। তার জন্যে ত্রফিম হয়ত তার বৃদ্ধা স্ত্রী সমেত রাশিয়ায় ফেরার ব্যবস্থা করতে পারবে, বাখরুশিতে বা শহরে তার জন্যে রুটির ব্যবস্থা করা যাবে।

পাঁচ-দশ মাস একটু সইতে হবে, তারপর সে তো জলে ছাড়া মাছ। এমন কি কলখোজের বোর্ডেও নিয়ে নেবে ওকে। তার মেয়ে নাদেজদার কাছ থেকেই শুধু নয়, অন্যান্য কথাবার্তা থেকেও সে শুনেছে, এমন কি ফৌজদারি অপরাধে অপরাধীও যদি মন থেকে অনুতাপ করে, অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে কাজ করে তা দেখায়, তবে তাকেও মার্জনা করে দেয় সোভিয়েত রাজ। ত্রফিমও দেখাবে। তখন দারিয়ার রাগ জল হয়ে যাবে। সবই ঠিকঠাক হয়ে যাবে তখন।

দারিয়াকে সে পেল ক্ষেতে, সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করল:

'গুবের্নিয়া লাটের কাছে গিয়েছিলাম। সর্বোচ্চ সোভিয়েতে দরখাস্ত দেব। লেখাটায় একটু সাহায্য করো আমায়, খুব আন্তরিক যাতে হয়। ঠিক ঠিক কথা যাতে বসান যায়।'

'মন থেকেই যদি সর্বোচ্চ সোভিয়েতে দরখাস্ত পাঠাচ্ছ, তাহলে পরের কাছ থেকে কথা ধার নেবার দরকার কী? আপনা থেকেই কথা জোগাবে তোমার,' জবাব দিল দারিয়া। 'সরকারের কাছে যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইছ সেটা পিওতরের টাইপিস্ট সাশাকে গিয়ে যা বলতে চাও সব বলো...'

ত্রফিম বলল:

'ঠিক বলেছ। বটেই তো। এ ব্যাপারে তোমার জড়িয়ে কাজ নেই। কিন্তু ভয় হয় কী জানো, সব গুলিয়ে যাবে বোধ হয়। ধান ভানতে শিবের গীত শুরু হবে। অথচ দরকার আসল কথাটা। গোটা জীবনের কথা তো আর দরখাস্তে ধরবে না।'

'যা বললে, সেই সারকথাটুকুই গিয়ে বলো।'

'সে সারকথাটা কী দারিয়া?'

'তুমি যদি তা না জানো, তবে জানবে কে?'

'ফের ঠিকই বলেছ। যখন পালিয়েছিলাম, তখন কারো সঙ্গে পরামর্শ করিনি। আর যেই পায়ের দাগ মোছার কথা, অমনি সাহায্য খুঁজছি ... উঁহু! আমি নিজেই লিখব, নিজেই! একেবারে সোজা গিয়ে লাগবে তেমন কথা নিজেই আমি দিতে পারব। নিজের হাতে নিজের গলাটা পর্যন্ত আমি এখন কেটে ফেলতে পারি। কলখোজ দপ্তরে যেতে যেতে ঠাণ্ডা না হয়ে গেলেই হয়।'

'আমিও তাই ভাবছি। তুমি যে খড়ের মতো। দপ করে জ্বলেই নিভে যাও।'

'ভয় নেই। কথাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবার কথা বলছিলাম। অন্য কিছু নয়। ধন্যবাদ। ছুটি, দপ্তর আবার বন্ধ না হয়ে যায়...'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে গেল ত্রফিম।

ওর সম্বন্ধে আর কিছু না ভাবার চেষ্টা করল দারিয়া। চেষ্টা করল কারণ তুদোয়েভার সঙ্গে আলাপের পর তার কথা হয়েছিল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সঙ্গে। সে বলেছিল:

'ওকে বিশ্বাস করার ইচ্ছা যদি তোমার অতই হয়ে থাকে তবে অন্তত লোকের সামনে সে কথা বোলো না, নইলে পরে ও যদি চলে যায় তখন লজ্জায় পড়তে হবে।'

ত্রফিম যে ফিরে যাবে এ বিশ্বাস পিওতরের একেবারে লোহার মতো অটল। দারিয়া সেটা হিসাবে না নিয়ে পারল না। কিন্তু ত্রফিম যদি অঞ্চল সোভিয়েতের দপ্তরে গিয়ে থাকে, আর এখন সর্বোচ্চ সোভিয়েতে দরখাস্ত দেবার জন্যে তৈরি, তবে যেটা সত্যি, সেটায় সে না বিশ্বাস করবে কী করে?

সারা জীবন দারিয়া পিওতরকে সর্বোচ্চ বিচারক বলে মেনে এসেছে। সব ব্যাপারেই। নিজের চোখ কানের চেয়েও সম্ভবত তাকে সে বিশ্বাস করেছে বেশি। কিন্তু পিওতরেরও তো ভুল হতে পারে। মানুষ তো...

আর সেই মুহূর্তে সে টের পেল যে ত্রফিম থাকুক, এইটেই চাইছে ও নিজে। কেন সে ইচ্ছে হচ্ছে ওর? নিজেকে জিজ্ঞেস করল সে, আর তার যে জবাবটা পেল, তাতে শান্ত হয়ে এল সে।

ত্রফিমের থেকে যাবার সংকল্পে দারিয়া মোটেই তুষ্ট বোধ করেনি। যদি বা করে থাকে তো সেটা তার কাছে প্রধান ব্যাপার নয়, অনেক গৌণ একটা ব্যাপার। ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই তার। তাই এখানে সে যত দিনই থাক, দারিয়ার কাছে সে কখনো নির্দোষ হয়ে উঠবে না, এমনকি যদি সে তাকে মার্জনাও করে দেয়।

মার্জনীয় কখনো মার্জনাপ্রাপ্তের সমান নয়। বেঁচে বর্তে থাকলেও, হাঁটা চলা করলেও মাথা তোলা যায় না। অতীত ঘুমিয়ে থাকে, মরে না।

অতীত খুবই ভুলে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু নিজের আচরণে যদি সে অতীত জেগে ওঠে তবে লোকে তা মনে করবে না এমন নয়।

সুস্থ লোক এক কথা। কিন্তু চিকিৎসা করে যে সুস্থ হল তার কথা আলাদা।

দারিয়ার মনটা এতে সুস্থির হয়ে এল; আলুর ক্ষেতের প্রথম ছোটো ছোটো আলু সে খুঁড়ে তুলতে লাগল নাতিদের জন্যে।

ইতিমধ্যে কলখোজ দপ্তর থেকে সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ত্রফিম তার দরখাস্ত ডিকটেট করতে লাগল টাইপিস্টের কাছে। তার শুরুটা এই:

'জীবনের শেষ বেলায় স্বদেশভূমি থেকে বিচ্ছেদের দুঃসহ ভার অনুভব করে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক স্টেটের অধিবাসী ও বর্তমানে স্বীয় জন্মভূমি বাখরুশি গ্রামে বসতকারী ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ বাখরুশিন স্থির করেছি এইখানেই চিরকালের মত থেকে যাব...'

আর্জিটা দীর্ঘ, বিশদ করে লেখা। খুব একটা তাৎপর্য নেই এমন কথাও সে বাদ দিল না। বললে, কেমন করে লালদের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল বনে, সোভিয়েত-রাজে বিশ্বাস করেনি, কলচাক সৈন্যদের কাছ থেকে কী ভাবে পালায়। খুঁটিয়ে বললে এলজার কথা, যার জন্যে সারা জীবন সে চাকরের মতো খেটেছে, বললে "জেনারেল মোটর্সে" সাতান্ন হাজার ডলার শেয়ারের কথা, যা প্রয়োজন হলে সে রেড ক্রসে বা নতুন বাখরুশি গ্রাম নির্মাণে দান করে দিতেও রাজী।

বললে, নিজের গ্রামটি সে ফের দেখেছে, জেনেছে তার নাতিনাতনিদের—ইয়েকাতেরিনা, বরিস, সের্গেই-দের, আছে তাদের মা, তার আপন ঔরসের মেয়ে নাদেজদা ত্রফিমোভনা।

টাইপিস্ট সাশা তার আর্জিতে সংশোধন করলে অল্পই। এমন কি যেসব কথা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নিকট কোনো আবেদনে খাপ খায় না, যেমন যেখানে সে যিশু খৃষ্টের নামে প্রার্থনা করেছে তার স্বদেশভূমি, দাদু হিসাবে নিজের নাতিনাতনিদের দেখার অধিকার এবং আপন গ্রামে মাটি নেবার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক, সেটাও সে কাটল না।

টাইপ করা আর্জিটা ত্রফিমের কাছে পড়ে শোনাবার সময় সাশার এইটে খুব ভালো লাগল যে ত্রফিম তার একটা লাইনেও দারিয়া স্তেপানোভনার কথা, তার সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর উপাধির কথা মনে করিয়ে দেয়নি, যদিও জানত তাতে তার দরখাস্তের বিবেচনা ত্বরান্বিত হত, হয়ত তার অনুকূলেই রায় আসত।

দেরি হয়ে গিয়েছিল, সাশা বললে দরখাস্তটা সে পরিষ্কার করে পরদিন সকালেই টাইপ করে দেবে। ভোরে উঠেই সে কাজে বসবে, আটটা নাগাদ পরিষ্কার কাগজে টাইপ করে সব তৈরি করে রাখবে।

৪৮

অভ্যাগত ভবনে ফেরার ইচ্ছে হল না ত্রফিমের। টেনর হয়ত তার মত বদলাবার চেষ্টা করবে, এখনো যখন দরখাস্তটা পাঠানো হয়নি।

টেনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাগ্য পরীক্ষায় কী লাভ! উষ্ণ স্বল্পস্থায়ী রাত। গোরামিলকার তীরেই তা কাটিয়ে দেওয়া যায়। চাঁদের আলোয় একা একা বসে থাকবে, নদীর রুপোলী ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবে। নরম ঘাসের ওপর গড়িয়ে নেবে... তারপর মাঝ রাতে, টেনর যখন নাক ডাকাবে তখন ফিরবে। আর সকাল সকাল সাশার কাছে গিয়ে সই করবে আর্জিতে, নিজেই তা ডাকে দিয়ে আসবে।

তাই সে এখন নদীতীরে। জন টেনরের সাঙ্গীতিক রূপকটা যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে তার হৃদয়ে এখন বেহালার ঝঙ্কার সঙ্গত করছে গোরামিলকা নদীর রুপোলী ঢেউয়ের সঙ্গে। পাইপ, ড্রাম এবং হাল ফ্যাশনের অন্য যেসব মার্কিনী যন্ত্র কর্ণবিদারী শব্দ করতে সক্ষম, তাদের বহুস্বরী হট্টগোল এখন স্তব্ধ হয়ে আছে ত্রফিমের মধ্যে।

চেক কোটটা খুলে ফেলল সে। সেটা মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়ল সবুজ তীরভূমিতে, ভাবতে লাগল নতুন করে জীবন শুরুর কথা।

হৃদয়ের মধ্যে সুন্দর করে বেজে চলল বেহালা...

এখানে তার অভিপ্রায়ের অকপটতায় দারিয়া স্তেপানোভনার সঙ্গে একত্রে বিশ্বাসের অবকাশ মিলছে আমাদের। ঐ বিশ্বাসের যুক্তিটা সাধারণ বুদ্ধির

বিরুদ্ধে নয়। এমনিভাবেই শেষ হয়েছে নাট্য, ছায়াছবি, সাহিত্যের বহু রচনা শুধু নয়, সংবাদপত্রে পত্রিকায় পড়া বহু সত্যি ঘটনাও।

কিন্তু পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ ও টেনরের মতের সঙ্গে সায় দিলেও কেউ আমাদের বাধা দেবে না। টেনরও তো খুব পরিষ্কার করেই আমাদের বলেছে, ত্রফিমের জানোয়ারী হৃদয়ের হঠাৎ আসা সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বিচার করে দেখা দরকার।

ইতিমধ্যে ত্রফিমের ভেতরে বেহালাটা বেজে চলল "পঞ্চমে", এবং এ কাহিনীর এমন একটা অসাধারণ অঙ্কপাতের সম্ভাবনা তা দিল, যা মিলনান্তক সঙ্গীতনাট্যের মঞ্চে (যদি তা সেখানে অভিনীত হত) কোমলপ্রাণ দর্শকদের চোখে জল টেনে আনবে। শেষ দৃশ্যে ত্রফিম আর দারিয়া, আন্দ্রেই আর কাতিয়া, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ আর ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা চাই কি টেনর আর তুদোয়েভা (মিলনান্তক সঙ্গীতনাট্যে তা চলে) জোড়ায় জোড়ায় নেচে নেচে সবার সঙ্গে সবার মিলমিশের গান গাইতে গাইতে সংবাদপত্রের সপ্রশংস সমালোচনার অপেক্ষা করবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা সেরকম সুবোধ বালক নয়। তারা সেই ইতালীয় গল্পের কার্লো কাকার কাঠের তৈরি পুতুল বুরাতিনোর মতো, পাণ্ডুলিপির পাতায় দেখা দেওয়া মাত্র তারা স্বাধীন আচরণ করতে শুরু করে দেয়। মাঝে মাঝে তারা রচয়িতার সঙ্গেও দ্বন্দ্ব বাধিয়ে বসে (ভেবে দেখুন, যে-লেখকের কাছে তারা তাদের সমস্ত অস্তিত্বের জন্যে দায়ী সেই লেখকের সঙ্গে), খুব কম করে বললেও লেখনী মেনে না চলে লেখনীকেই চালাতে শুরু করে।

আর ঠিক তাই ঘটতে চলেছে পরের উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদে, মিষ্টি নদী সেই গোরামিলকার তীরে, যা মানচিত্রে কিছুটা অন্য নামে প্রবাহিত।

৪৯

গোরামিলকা নদীর রুপোলী ঢেউয়ে চোখ জুড়িয়ে চাঁদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ "জেনারেল মোটর্স"এর শেয়ারের কথা ভাবতে শুরু করল।

রেড ক্রসে বা নতুন বাখরুশি নির্মাণের তহবিলে তা দান করে দেবে বলে উত্তেজনা বশে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি একটু তাড়াহুড়ো করেনি? এ সৎকাজটা অবিশ্যি তার হৃদয়ের প্রেরণা থেকেই, তবু সুদ ধরলে প্রায় ষাট হাজার ডলার, খুব একটা মস্ত পুঁজি না হলেও অল্প টাকা নয়...

মনে মনে ডলারটাকে রুবলে পরিণত করে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হল ত্রফিমের। হয়ত নদীর শীতল হাওয়ার জন্যে। সে যাই হোক, সে টাকাটা এখানে কুকুরের মাছি খাওয়ার মতো লোকে গিলে খাবে। হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গে শেষ। কলখোজের লাখ লাখ টাকার মধ্যে মিশে গিয়ে চোখেই পড়বে না, কোন খাতে তা ব্যয় হল...

তারপর কোট গায়ে দিয়ে ও ফার্মটার কথা ভাবতে শুরু করল। যাই বলো, ফার্মটা ওর কাছে কয়েদখানা, সে তার কয়েদী। সে কথা ঠিক। কেবল এত বছর... ফার্মটার একটা চাকা হয়ে চলা অভ্যেস হয়ে গেছে তার... ফার্মটা ডুবে যেতে পারে। তা ঠিক। আগেই হোক পরেই হোক, তা ঘটবেই। কিন্তু ও যদি কালই আর্জি সই করে সর্বোচ্চ সোভিয়েতে পাঠায় তবে তার পক্ষে কালই যে ফার্মটা ডুবছে। এত বছর ধরে যা নিয়ে ও বেঁচেছে তা ছেড়ে দিতে হবে কালই। এমন কি তার পোষা "কিং" পায়রা পর্যন্ত আর তার থাকবে না। কিন্তু পায়রার কথাটার মানে হয় না। এখানেও তা পোষা যায়... কিন্তু "বুইক"? তার কুকুরটার চেয়েও অবিশ্যি গাড়িটা বুড়ো, কিন্তু এখনো জোর চলে।

না, না, কোথাকার এক পুরনো "বুইক"এর কথা সে ভাববে না, তার জায়গা তো অচল লোহার স্তূপে। সব কিছু নাকচ করে নতুন করে শুরু করা যখন স্থির, তখন ওই সব বাজে জিনিসে মাথা খারাপ করবে না সে। সেখানে ওর পায়ের নিচে শক্ত মাটি নেই। তার জন্যে নেই নিরুদ্বেগ বার্ধক্য। কয়েক বছর পরেই ওকে পায়ে মাড়িয়ে যাবে নিষ্করুণ কমবয়সীরা, যেমন করে ও মাড়িয়ে গেছে আইভান আর রবার্টকে... না রবার্টকে ও শেষ করেনি। করেছে এলজা... কিন্তু কার জন্যে?

পেছনের দিকে আর তাকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না ত্রফিমের, কিন্তু সামনে তাকাবারই বা কী আছে। তার ফার্মের আগামী দিনটা ওর পক্ষে মোটেই ভালো কিছু নয়।

"তাই কী?" হঠাৎ একরোখার মতো প্রশ্ন করল সেই ত্রফিম যে এতক্ষণ হার মেনে পড়ে ছিল। তাই কী? কাউকে কি ও নিজেকে মাড়িয়ে যেতে দেবে? যতই বুড়ো আর কাহিল হোক না সে? তারপর, পিওতরের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎকার থেকে একা টেনরই বা কেন টাকাটা মারবে? এ সাক্ষাৎকারের প্রধান ব্যক্তি কি ত্রফিম নয়? ওকে ছাড়া এ সব কি ঘটতে পারত?

জন্মভূমি দেখে, অতীতের কথা মনে পড়ে নরম হয়ে আসা একটা আহাম্মক নয় কি সে? দারিয়াও তো অতীত। নাতি সেরিওজা কি ওই দারিয়ার অহমিকার বড়শিতে গাঁথা একটা টোপ নয়? ত্রফিম নিজেই কি একটা বোকা পাইক মাছ নয়, যাকে কেউ কৃপা করে ফের নদীতে ছেড়ে দেবে না?

কী জন্যে ছেড়ে দেবে সেই ফার্মটা, যা থেকে এখনো সে মুনাফা ওঠাতে পারে, তাকে শেয়ারে পরিণত করে নিতে পারে দুর্দিনের জন্যে। বাখরুশি নিয়ে লেখা বইটার সমস্ত আয় টেনরকেই বা সে ছেড়ে দেবে কেন? কম ডলার তো টেনর পকেটস্থ করবে না। ত্রফিমের খানিকটা ভাগ পাওয়া তো উচিত।

ভূলুণ্ঠিত ফার্মার ত্রফিম হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল, অন্য যে ত্রফিম নদী তীরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল তার কানে কানে ফিসফিস করতে লাগল সে:

'রাত এখনো কাটেনি, শেষ বারের মতো সব খতিয়ে দেখা দরকার। রাশিয়ায় থেকে যাওয়া যদি স্থির করেই ফেলে থাকো, তবে অত তাড়াহুড়া কেন? আমেরিকায় গিয়ে পাওনা টাওনা আদায় করে কি ফের আবার এখানে ফেরা যায় না? খৃষ্টের নামে ও সম্প্রদায়ের দিক থেকে ধর্মভাই হলেও লোকটা মানবিক দুর্বলতার ফাঁদে পড়তে পারে, তার শেয়ারগুলো মেরে দেবে। মামলা করতে হবে তার সঙ্গে, আর মামলায় হয়ত বেরিয়ে পড়বে যে তুমি এলজা আর তার মেয়ের সম্পত্তি ফার্মটা থেকে চুরি করেছ। আইনের কাছে ঠিক তাই দাঁড়াবে।'

না, না, এখনো রাত পোহায়নি, নিজের কাছে খোলাখুলি সবটা পরিষ্কার করে নেওয়ার সময় আছে। এলজা মরো মরো। না মরে পারে না। হয়ত ও নেই, তার মধ্যেই মারা যেতে পারে, ফিরে গিয়ে ও এমন চালে চলতে পারে যে আন্নির কাছে অসহ্য হয়ে উঠবে। আন্নি ওকে ছাঁটাই করলে এক তৃতীয়াংশ দিতে বাধ্য। আর সেটি — হুঁহুঁ — কম টাকা নয়...

ঠিকই, ফের একবার সবই ভেবে দেখতে হয়, যদিও এমনিতে পরিষ্কার যে দাঁড়িপাল্লা কাণ্ডজ্ঞানের দিকেই ঝুঁকছে। আর কাণ্ডজ্ঞান বলছে — সাময়িকভাবে আমেরিকায় ফেরো।

কিন্তু কী বলবে দারিয়াকে? কী বলা যাবে সবাইকে? ও নিজেই তো তার সংকল্পের কথা বলে বেরিয়েছে... ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, ও যা ভাবছে সেটা বলা অসম্ভব। কেউ তার সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস করবে না। ওদের দেখবার ধরনই যে আলাদা।

'কিন্তু একটা উপায় আছে। কিছুই না বলা। সেই সবচেয়ে ভালো...' এক ত্রফিম অন্য ত্রফিমকে পরামর্শ দিল।

এ দুই ত্রফিম তখন এমনভাবে মিশে গেছে, যে কোনো সাধারণ মনস্তাত্ত্বিকই আর তাদের আলাদা করতে পারত না; অভ্যাগত ভবনে তারা ফিরল প্রায় এক হয়ে।

সিনেমায় এটা দেখানো যেত অতি পরিষ্কার করে। প্রথমে বড়ো করে দেখানো হল দুজন ত্রফিমকে, পরে মতপার্থক্য পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রমশ মিশে যাচ্ছে... কিন্তু... আধুনিক শিল্পকলা সিনেমার যুগ্ম শটে যা সম্ভব তা, খেদের বিষয়, কথা-সাহিত্যে অচল।

এ অংশটারও তেমনি আমাদের কাহিনীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এখানে রাখা হয়েছে কেবল এই জন্যে যাতে ত্রফিম বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, সত্যি ও মিথ্যা এই দুই চূড়ান্ত রাস্তার মোড়ে মস্তো বাঁক নেবার আগে খানিকটা থমকে যায়।

টেনর ঘরে ছিল না। স্তেকোলনিকভের সঙ্গে শেষ দেখা করতে গিয়েছিল সে, মাঝ রাত পর্যন্ত সেখানেই কাটাচ্ছে। পেলাগেয়া কুজমিনিচনা ঘুমুচ্ছিল। চাবি ছিল সিঁড়ির নিচে যথা স্থানে। নিজের ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালল ত্রফিম। টেবলের ওপর নিউ ইয়র্ক থেকে এলজার টেলিগ্রাম।

ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞের কাছেও দুর্বোধ্য এই পারিবারিক সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম থেকে ত্রফিম বুঝল যে ফার্মের হাল আশাতীত ভালো। "প্রথমটা" (সঙ্কেতার্থ দুধ) যার জন্যে ত্রফিমের দুশ্চিন্তা ছিল তা "উপচে হৈহৈ"। তার অর্থ দুধের পরিমাণ, ক্রিম আর দাম বেশি মিলেছে। পরে "দুই" ও "তিন নম্বরের" সাফল্য বলা হয়েছে, এটা হল মাংস আর শবজি। শেষে বলা হয়েছে

"কাঠটা থেকে ভালোই ফল মিলছে।" কথাটা বুঝতে হবে: আন্নির স্বামী ইউজেন ফার্মের কাজ ভালোই চালাচ্ছে।

"কাঠটা থেকে ভালোই ফল মিলছে" এই সংবাদটা সবকিছু ঘুলিয়ে তুলল এবং গোরামিলকার তীরে ত্রফিমের ভাবনার উপসংহার ঘটাল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেকে ফার্মের বড়ো চাকা বলে ভেবেছে। এখন দেখা যাচ্ছে তার স্থান গ্রহণ করার মতো লোক আছে। হিংসের জ্বালায় ত্রফিম এত দ্রুত তৎপর হয়ে উঠল যে সে নিজেও সেটা আশা করেনি।

অনতিবৃহৎ সুটকেসটায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চটপট গুছিয়ে ত্রফিম টেবলে বসল। ইচ্ছে ছিল সকলের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখবে। কিন্তু বারান্দায় একটা শব্দ শোনা গেল। ত্রফিম স্থির করল টেনর ফিরছে, তাই বাতি নিবিয়ে দিল।

ফের শোনা গেল শব্দ। ত্রফিম কান পেতে শুনল। বোঝা গেল বেড়ালের বাচ্চাটা ঝাঁটার সঙ্গে খেলছে। ত্রফিম চিঠিকে বিদায় দিয়ে লাইট না জ্বেলেই বেরুল ঘর থেকে। নতুন পাতা কাঠের মেঝে পাছে ক্যাঁচক্যাঁচ করে এই ভয়ে সন্তর্পণে সে হেঁটে গেল বারান্দা দিয়ে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গ্রামের উল্টোদিক ধরল।

এখন সে আর দুজন নয়, পুরোপুরি একটা কেঁদো জানোয়ার হয়ে ছুটল তরুণ বার্চগাছগুলোর মধ্যে দিয়ে। পেছনে তাকাতে তাকাতে সে ঢালু বেয়ে উঠতে লাগল, গ্রাম এড়িয়ে পেঁছিবে বড়ো সড়কে।

পেছনে তাকাবার দরকার ছিল না। কেউ ওকে ধরার চেষ্টা করেনি। বুড়ো মানুষের পাতলা ঘুম ভেঙে তুদোয়েভাই সবার আগে ওকে পালাতে দেখে। কিন্তু সেও টেলিফোন করে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে জাগাবার কথা ভাবেনি।

পেলাগেয়া কুজমিনিচনা তার প্রিয় রুশী প্রবাদগুলোকে সর্বদাই অকাট্য বলে ভেবেছে। তার একটা এখন খেটে গেল।

ত্রফিমের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সে তার "এক যে ছিল"র নতুন একটা ছত্র রচনা করল:

'...শান্ত এক চাঁদনী রাতে সে গোপনে বাখরুশি ছাড়ল, ঘুমন্ত গ্রামটার নুন-রুটির জন্যে বিদায় জানাতে লেজটাও নাড়ল না...'

৫০

চড়াই থেকে ত্রফিম চাঁদের আলোয় ফিতের মত ধুধু সড়কটা দেখতে পেল। রাত্তিরেও তা কম ব্যস্ত নয়। লরি যাতায়াত করছে।

অচিরেই ত্রফিম সড়কে পৌঁছে হাত নেড়ে একটা "মাজ" লরি থামাল — লড়িটার ওপরে উঁচু করে খাঁচা করা, খাঁচাটা তাজা কপিতে ভর্তি।

'যদি আপত্তি না থাকে তবে শহর পর্যন্ত যাব,' তরুণ ড্রাইভারটিকে বললে ত্রফিম, 'পুষিয়ে দেব।'

'চলে আসুন,' দরজা খুলে বললে ড্রাইভার। 'দুজনে থাকলে জমবে।'

গাড়িতে বসে হালকা লাগল ত্রফিমের। এ ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না ও। পালিয়ে আসাটাই ওর পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

লরি ড্রাইভার কপি নিয়ে যাচ্ছিল বাখরুশি থেকে শহরের কলখোজ বাজারে। হাত তুলে ও যখন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তখনই সে ত্রফিমকে চিনতে পারে। ওর কাছে অদ্ভুত লেগেছিল যে ত্রফিম এত রাতে বাখরুশি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে সড়কের ওপর "লিফট" চাইবে।

রেল লাইন পেরিয়ে যাবার আগে ব্রেক কষে ড্রাইভার কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে যাচ্ছেন?'

'এয়ারপোর্টে,' জবাব দিল ত্রফিম, 'ভোরের প্লেন ধরব।'

'ট্যাক্সিতেই তো আপনার সুবিধা হত, এতে তো আপনাকে ভয়ানক ঘুরতে হবে।'

'কী করা যাবে। এই দাঁড়াল হে ছোকরা। যাবো ঠিক ছিল না, হঠাৎ ঠিক করলাম।'

'কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছেন নাকি?'

'নিজের সঙ্গেই ঝগড়া করলাম আর কি। তাই রাতেই চললাম ... বলা যেতে পারে পালালাম।'

'তাহলে সেরিওজার কী হবে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'কোন সেরিওজা?' ত্রফিম ড্রাইভারের মুখের দিকে চেয়ে বলল: 'তা ভালোই হল, আপনি বাখরুশির লোক। চিঠি আর লিখতে হবে না। আমি আর অন্য কিছু করতে পারতাম না বাপু... দেখা যাচ্ছে আমার সবখানিই

ওখানে, এখানে যেন আমি আসিইনি। এখানে যে লোকটা এসেছিল সে আমার দেহ ধরলেও অন্য কেউ। আপনি ছোকরা কে বলুন তো?'

'আমার নাম আলেক্সেই। হেড মেকানিক আন্দ্রেই লগিনভের জ্ঞাতি ভাই।'

'জ্ঞাতি ভাই, তা ভালোই হল।'

'ভালোর কী আছে তাতে? সে আপনার নাতজামাই, আমি তো নই,' রসিকতা করল ড্রাইভার।

ত্রফিম বললে, 'ভালো হল, কারণ আমার ঐ বাজনদার ঘড়িটা আমি আপনার হাত দিয়ে পাঠাতে পারি। সেরিওজা ওটা শুনতে ভালোবাসত। দিনে বার কুড়ি করে ওকে শোনাতাম। এটা ওকে দিয়ে দেবেন আলেক্সেই... পৈতৃক নামটা যেন কী?'

'সেমিওনভিচ। দিয়ে দেব। ছেলেটা যখন বাজনা ভালোবাসে তখন না দেবার কী আছে। তবে পরে দেবেন, আমার দুহাত এখন জোড়া...'

'আর দারিয়া স্তেপানোভনাকে, আলেক্সেই সেমিওনভিচ...'

'তাকে কী দিতে হবে?'

'আমিও জানি না। বলবেন, যা দেখলেন। যা শুনলেন আমার কাছে। পালাল আর কি... ধেড়েটা। নেকড়ের মত পালাল, আর ঠিক রাত্তিরেই।'

কেবিনে নীরবতা নেমে এল। "মাজ" ছুটে চলছিল পুরো গিয়ারে। পেরিয়ে যাচ্ছিল ঘুমন্ত গ্রাম, শ্রমিক বসতি। শহর থেকে তখনো গাড়ির স্রোত শুরু হয়নি। কেবিনের খোলা জানলা দিয়ে আসছিল পাইনের গন্ধ। বাতাস তাজা।

বনের ওপাশে কোথায় ব্লাস্ট ফার্নেসের আভা কমছে বাড়ছে। স্ল্যাগ ঢালা হচ্ছে। ত্রফিমের দিকে মুখ টিপে হেসে চাইল চাঁদ, ত্রফিম মুখ ফিরিয়ে নিল।

'আর পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে কী বলব?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

ত্রফিম পাইপ ধরাবার জন্যে দেরি করল উত্তর দিতে। শেষ পর্যন্ত বলল:

'ওকে কিছু বলতে হবে না। আমি নিজেকে যা জানি, ও আমায় জানে তার চেয়ে ভালো। আর আমার সঙ্গে যে এসেছিল, সেই টেনরকে বলবেন যে আমি মস্কোয় সেই একই হোটেলে ওর জন্যে অপেক্ষা করব। ও যদি আমার ফেলে আসা লগেজগুলো নিয়ে আসতে চায় তো যেন নিয়ে আসে। না চায় তো পেলাগেয়া তুদোয়েভা সেগুলো নিয়ে যা খুশি করতে পারে। বাস।'

গাড়ি এসে পেঁছল শহরের উপকণ্ঠে। সাময়িক বেড়া দেওয়া নির্মাণক্ষেত্রগুলো দিয়ে চলছিল গাড়ি। লাফাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।

'আমি তাহলে এইখানেই নামি,' আলেক্সেইয়ের হাতটায় চাপ দিয়ে বললে ত্রফিম।

'যা আপনার সুবিধে ত্রফিম তেরেন্তিয়েভিচ,' ব্রেক কষল ড্রাইভার।

ত্রফিম তার মানিব্যাগটা হাতড়াতে লাগল। তা দেখে আলেক্সেই জানিয়ে দিল:

'ব্যস্ত হবেন না। অতিথির কাছ থেকে কিছু নেব না।'

'তাহলে অন্তত এইটে,' ত্রফিম তার সিগারেট লাইটারটা এগিয়ে দিল; সের্গেইয়ের জন্যে প্রতিশ্রুত ঘড়িটা চেন থেকে খুলতে ভুলে গিয়ে পা-দানি থেকে নেমে পড়ল সে, তারপর টুপি খুলে শুভকামনা জানাল: 'ভালো বৌনি হোক!'

বাঁধাকপি ভরা লরির কেবিন থেকে শোনা গেল, 'শুভ যাত্রা!'

৫১

সাড়ে সাতটা নাগাদ ত্রফিমের দরখাস্তটা পরিষ্কার করে ভালো কাগজে টাইপ শেষ করল সাশা।

তারপর রবার দিয়ে ঘসে মেজে নিখুঁত করে তুলল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজটা শেষ করে ঝকমকে দরখাস্তটা দিয়ে ত্রফিমকে অবাক করে দেবার জন্যে তার আর তর সইছিল না।

আগের সন্ধ্যায় খসড়া কপিটা সে মা আর দিদিমাকে পড়ে শুনিয়েছিল। শেষ বয়সে ত্রফিমের যে চোখ ফুটেছে শুধু সেই জন্যে নয়, আর্জির শব্দ নির্বাচনেও খুশি হয়েছিল তারা। প্রতিটি শব্দই যেন গান গেয়ে উঠছে।

খুশি হয়েছিল সাশাও। জীবনে এই প্রথম এমন একটা উঁচু মহলের জন্যে দরখাস্ত লেখার সুযোগ পেয়েছিল সে। টাইপটা বাঁ পাশেও যেমন ডান পাশেও তেমনি সমান হয়ে পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক বইয়ের মতো — এতে আনন্দের আর অন্ত ছিল না তার।

আটটা বাজল। "মস্কোর সময় অনুসারে ছয়টা" ঘোষণা হল লাউডস্পীকারে।

কলখোজ আপিসে শ্বর্ হল কর্মচাঞ্চল্য। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ সম্ভবত খেতগ্বলো দেখার কাজ শ্বর্ করে দিয়েছে। দিন শ্বর্ হয়ে গেল, অথচ দরখাস্তটা এখনো টেবলেই পড়ে আছে, যেন ও নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই।

কেন তাহলে অত তাড়াহ্বড়া করল ও? কেনই বা সাত সকালে উঠে তার নতুন নীল স্বয়েড জ্বতোর পরোয়া না করে ছ্বটে এল শিশির মাড়িয়ে?

হায় রে সাশা, রাতে কী ঘটেছে যখন শ্বনবে তখন কী আহতই না হবে মেয়েটা। তোমার ঐ নিখ্বঁত করে টাইপ করা সাতটা পাতার জন্যে কেই বা ব্যস্ত!.. শোনো গে কী বলছে বাখর্বশির লোকেরা।

শহরে কপি পেণছে দিয়ে ফিরে এসেছে আলেক্সেই, ত্রফিমের সঙ্গে তার নৈশ সাক্ষাৎকারের গল্পটা শোনাচ্ছে সে।

আলেক্সেইয়ের কাহিনী বাখর্বশিন শ্বনল নীরবে। ভোরেই তুদোয়েভা এসেছিল তার কাছে।

'এ ছাড়া আর কিছ্ব হতে পারত না আলেক্সেই,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বললে, অন্বরোধ করলে তাকে যেন দারিয়া স্তেপানোভনার ওখানে নামিয়ে দেয়।

পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের দ্বশ্চিন্তা কেবল ওকে নিয়ে, শ্বধ্ব ওকে নিয়ে। যা ঘটেছে সেটা সবার আগে সেই ওকে জানাবে। প্রতিটি সংবাদদাতা তো শ্বধ্ব সংবাদই জানায় না, দেখতে চায় সে সংবাদে কী প্রতিক্রিয়া হল শ্রোতার। পিওতর বাখর্বশিনের কাছে দারিয়া শ্বধ্ব আত্মীয়াই নয়, কলখোজের একজন নামজাদা লোক। তাছাড়া এ কদিন সবার ম্বখে শ্বধ্ব ওরই কথা।

তাকে শান্ত করা দরকার, বোঝানো দরকার যে ত্রফিমের পিছ্ব হটাটা অনিবার্যই ছিল।

ত্রফিমের পলায়নের সংবাদ দিয়ে ও প্বনরাব্বত্তি করল:

'অন্য কিছ্ব হতে পারত না দারিয়া। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। তোমার সঙ্গে ওর তো কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সম্পর্ক আছে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম ওকে,' দ্ঢ়ভাবে বললে দারিয়া।

এখন আর ওর লজ্জা নেই, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সামনে চোখের জল ল্বকোবারও প্রয়োজন নেই। চুপ করে ও অপলকে চেয়ে রইল সেই জানলাটার দিকে, কিছ্ব দিন আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ত্রফিম তার বড়ো বড়ো কাঁপা কাঁপা হাতে কোলে টেনে নিয়েছিল সেরিওজাকে।

সেটা তো ভান নয়... ভান হলে কি সে কখনো তার নেকড়ের থাবায় তার আর পিওতরের সবচেয়ে আদরের নাতিটিকে নিতে দিত!

নাতিটিকে শুধু নিয়ে যাবার অনুমতি ছাড়া তার সঙ্গে সে এমন কোনো সম্পর্ক রাখেনি, যাতে স্বগ্রামবাসীদের কাছে তার মাথা হেঁট হয়। সেজন্যে তাকে বাঁচাবার কোনো দরকার নেই পিওতরের। লোকে তার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলবে না। কিন্তু নিজের কাছে তো দারিয়াকে মানতে হবে যে সে তুদোয়েভার কথা বিশ্বাস করেনি, পিওতরের কথা না, টেনরের কথা না, সবাইকে অগ্রাহ্য করেই সে ভালোটুকুই দেখতে চেয়েছিল।

'আর সে কি শুধু ওই একা? আমরাও কি তাই চাইনি?' প্রসঙ্গত নিজেদের কাছে আমরাও এ প্রশ্ন করব বৈকি।

দারিয়া ধরতে পারেনি। কিন্তু সে কি ওর দোষ যে ওর চোখ জোড়া জানোয়ারের মধ্যেও দেখতে চায় মানুষকে?

'নিজের জন্যে লজ্জা হচ্ছে আমার পিওতর, কিন্তু আফশোস করব না। হাজার হোক, অন্তত দিনেকের তরে হলেও তো ওর মধ্যে মানুষটা জেগে উঠেছিল, জিতেছিল আমাদেরই আদর্শ। এটা ভালো লক্ষণ... লজ্জা হচ্ছে পিওতর, কিন্তু খেদ নেই আমার।'

'কিন্তু সে তো ভালো কথা। খুবই ভালো,' বাখরুশিন বলল। 'ঘরের ভেতর ডুকরে কাঁদব, কিন্তু লোকে যেন চোখের জল না দেখে। লুকতে চাই বলে নয়, কিন্তু আমাদের এখানে যেমন সুদৃষ্টি আছে, তেমনি কুদৃষ্টিও আছে। তাদের খুশি করে লাভ কী? কোনো কাজের কথা নয় সেটা। বড়ো কথা, তুমি সবই বুঝেছ। আমার চেয়েও ভালোভাবে বুঝিয়ে বললে...

তোমায় যে আমার আপন বোনটির মতো ভালোবাসি দারিয়া, যে বোন আমার কখনো ছিল না।'

এই কথাবার্তার পর তারা গোটা গাঁয়ের চোখের সামনে সের্গেইয়ের হাত ধরে এগিয়ে গেল—গেল ইয়েলেনা কাকীর বাড়িতে, যেখানে তারই মতো পিওতর দাদুর অন্যান্য নাতির সঙ্গে আলাপ হবে তার। বড়ো বাসে করে আজ তারা সবাই আসছে।

কী মজাই না হবে!

৫২

রাতের ঘটনা শোনার পর জন টেনর দুদোরভকে ফোন করে বললে:

'সসম্মানে একটা কথা জানাই গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ। চতুষ্পদটি কাল রাতে স্বাভাবিক ভঙ্গি ফিরে পেয়েছে। সেরিওজাকে সে ওই সেকেলে বাজনাদার ঘড়িটা উপহার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় চেনটা খুলতে ভুলে যায়। বিশদে জানতে পারবেন পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের কাছে। আফশোসের কথা যে পলাতক অভ্যাগত ভবনের জন্যে কলখোজের এবং খাওয়া দাওয়ার জন্যে পেলাগেয়া কুর্জমিনিচনার হিসেব চুকিয়ে দিয়ে যায়নি। কিন্তু ওটা কিছু না। আমি মিটিয়ে দেব। নানান রকমের লোক থাকে আমেরিকায়। চলি।'

তারপর টেনর টেলিফোন করল স্তেকোলনিকভকে:

'ফিওদর, হ্যালো, ফিওদর! চেয়ারটা ভালো করে ধরে রাখিস… শেষ সংবাদ বলছি…'

এই বলে সে খবরের কাগজের চালে ত্রফিমের উধাও হবার ঘটনাটা জানাল।

'আজ রাতে যদি আমিও পালাই, হোটেল দ্য বাখরুশির কিছু কিছু দামী সম্পত্তিও সঙ্গে নিই, তাহলেও কেউ অবাক হবে না। আমায়ও সে ডুবিয়ে গেছে। এবার বাখরুশিতে কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে সোভিয়েত বিরোধী বই লিখব না… বেশ, নয়, সবাই আমার সম্বন্ধে সবচেয়ে খারাপটাই ভাবুক… সারপ্রাইজ দিতে ভালোবাসি আমি। মাফ কর, মিস্টার পলাতকের ছড়ানো ছিটানো জিনিসগুলোর ছবি তুলে রাখি, পরে তোকে ফের ফোন করব।'

অঞ্চলের খবরের কাগজে কলখোজের বিখ্যাত শুয়োরপালক পান্তেলেই দরোখভ সম্বন্ধে একটা বড়ো প্রবন্ধ বেরবার পর থেকে সে শুধু তার শুয়োরপালনের পদ্ধতি সম্বন্ধেই নয়, অন্য সবকিছু সম্বন্ধেও স্থির প্রত্যয় হয়ে উঠেছে।

ত্রফিমের পলায়ন সম্বন্ধে ও নিজের ছেলেকে বলল:

'তার মানে… ওকে একেবারে দেশের ভেতরপানে পাঠাবার মতলবটা

তাহলে ওরা বদলেছে... নয়ত আমাদের লোকেরা ওর স্বরূপ ধরে ফেলেছে... পিয়ন মেয়ে আরিশা যে ওই সাংকেতিক টেলিগ্রামটার কথা বলছিল সে তো আর খামকা আসেনি। কাল সন্ধ্যায় টেলিগ্রাম পেয়েই ও ভেগেছে।'

কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ খবরটা পেয়ে "ছোট্টো" একটা লঙ্কায় জারানো ভোদকা সেঁটে বললে:

'পুঁজিবাদের জোয়াল থেকে ফের ছাড়া পেলাম আমি। আর আমার কোনো দায় নেই।'

দরোখভের মতো সতর্ক এবং কথায় সংযত প্রধান কৃষিবিদ সের্গেই সের্গেয়েভিচ স্মেতানিন জিনিসটার মূল্যায়ন করলে: "রকম ভালো নয়", কড়া যাচাই করা দরকার।

টাইপিস্ট সাশা যখন জানল যে তার মেহনত জলে গেছে, তখন ইচ্ছে হয়েছিল জিনিসটা "যথা স্থানে" পাঠায়, কিন্তু পরে প্রথম কপিটা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে, দ্বিতীয়টা দুদোরভকে এবং তৃতীয়টা বাখরুশিতে বাসা-পাওয়া মিলিশিয়ার লোকটিকে দিয়েই ক্ষান্ত হল।

দারিয়ার নাতি বরিস তার সঙ্গীদের নিয়ে ঝোপের মধ্যে একটা গোপন বৈঠক করে জানাল কী ভাবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গোপন পথ ধরে পলাতক পালিয়েছে তার ফার্মের দিকে। তারপর অচিরেই শুরু হয়ে গেল খেলা। প্রথমে লটারি হল কে ফার্মার হবে, পরে চোখ বন্ধ করে সবাই একশ অবধি গুণতে থাকল, সেই অবকাশে পালাতে হবে ফার্মারকে... তারপর সন্ধান করে পলাতককে ধরে আনার পর ফের লটারি।

সেরিওজা কিন্তু তার "গ্র্যাণ্ড-পা"র অপেক্ষা করছিল। নতুন নতুন বাচ্চা বন্ধুদের আগমনে বাখরুশিনদের বাড়িতে প্রচুর ফূর্তি জমলেও তাতে তার মন ছিল না। পিওতর দাদু তাকে দিয়েছিল এক খাঁচা সমেত আসল জীবন্ত কাঠবেড়ালি, চাকার মধ্যে দিয়ে যখন সে ছোটাছুটি করছিল তখন ফূর্তিতে সের্গেই হেসে উঠলেও থেকে থেকে সে লেনিভি চড়াইয়ের দিকে চাইছিল। চাইছিল আর অপেক্ষা করছিল: "গ্র্যাণ্ড-পা"কে সেখানে দেখা যাবে না কি?

দিদিমার সমস্ত গল্পে খুবই বিশ্বাস করলেও সেরিওজা এটা মানতে পারেনি যে "গ্র্যাণ্ড-পা" আসলে নেকড়ে, মানুষের রূপ ধরে এসেছিল, ফের নেকড়ে হয়ে পালিয়েছে তার সাগর পারের গুহায়।

নেকড়ে হলে তো তার থাবা, দাঁত, নিদেন পক্ষে হিংস্র চোখদুটো নজরে পড়ত সেরিওজার। কিন্তু সে চোখ যে সুন্দর দয়া মায়া ভরা চোখ।

না, সেরিওজা তা বিশ্বাস করতে পারে না। "গ্র্যান্ড-পা"র অপেক্ষা করতে লাগল সে।

শিশুর ক্ষুরধার স্মৃতিতে ত্রফিম যে ভালো জিনিসগুলি গেঁথে দিয়েছিল তা সে ভুলতে চাইছিল না। প্রায় আসল একটা ব্লাস্ট ফার্নেস, ঘড়ি, তার মধ্যে একটা ছোট্ট বাজনাদার বসে ছোট্টো ছোট্টো তারে ঝঙ্কার তুলছে… আসল একটা পাইক মাছ, তাকে ধরতে পারে, মায়া দেখিয়ে ছেড়ে দিতে পারে কেবল সেই… আর হঠাৎ সবাই ওকে বলছে কিনা নেকড়ে! এমন কি হাসিখুশি জন কাকা পর্যন্ত, যে বিদায় নিতে এসেছিল দিদিমার কাছে…

কাঠবেড়ালির সঙ্গে দিদিমা যোগ করলে চারটে শাদা পায়রা,"গ্র্যান্ড-পা" যা ওকে দেবে বলেছিল। আর আন্দ্রেই কাকা তাদের জন্যে চমৎকার পায়রা খোপ বানিয়ে দিলে। এসব ওরা করলে এই জন্যে যাতে সেরিওজা "গ্র্যান্ড-পা"র কথা না ভাবে… তবু সে "গ্র্যান্ড-পা"র জন্যেই অপেক্ষা করবে… না করে সে পারে না… মা'র এই কথাও সে বিশ্বাস করে না, যে "গ্র্যান্ড-পা" তার ছোট্টো বুকটায় থুতু দিয়ে গেছে…

আর দিন গেল। দিন গেল কিন্তু "গ্র্যান্ড-পা" ফিরল না…

৫৩

টেনরের চলে যাবার দিন এল। অভ্যাগত ভবনের সামনে ভিড় জমে গেল যৌথখামারীদের। ছোট্ট একটা মিটিঙের মতো ব্যাপার ঘটল। এই ধরনের স্বেচ্ছা-প্রেরণায় খুশি হয়ে উঠল গ্রিগোরি ভাসিলিয়েভিচ দুদোরভ।

'কেউ সংগঠন করেনি, কিন্তু কেমন পরিপাটি,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে নিজের মত জানাল সে।

তুদোয়েভা, আন্দ্রেই লগিনভ, পশুবিদ ভলোদিয়া, আন্দ্রেই লগিনভের ভাই আলেক্সেই বক্তৃতা দিয়ে তাদের প্রিয় অতিথির শুভ যাত্রা কামনা করল, আশা প্রকাশ করল, এমন করে যে পরিচয়ের শুরু সেটার শেষ খারাপ হবে না।

সে সময় আমেরিকায় নিকিতা সের্গেয়েভিচ খ্রুশ্চভের আসন্ন সফর নিয়ে

কাগজে পত্রে রেডিওয় বহু কথা চলছিল। সেই জন্যে "অ-পার্টি" হলেও তুদোয়েভা বক্তৃতায় টেনরকে এ কথা না শুনিয়ে ছাড়ল না:

'আমাদের প্রিয় কমরেড খ্রুশ্চভের সঙ্গে যখন তোর দেখা হবে জন, তখন ভুলিস না যেন কেমন তোর যত্ন আত্তি করেছি আমি, তোর জন্যে কেমন পিঠে ভেজে দিয়েছি আমি, তোর জামাকাপড় আমি ওয়াশিং মেসিনে নয় নিজের বুড়ো হাতে করে কেচে দিয়েছি... তোর বেটসি যে আমাদের লোকেদের রেঁধে বেড়ে সেদ্ধ ভাজা সব খাওয়াবে তার জন্যে এ কথা বলছি না, ওরা নিজেরটা দেখে নিতে পারবে। বলছি এই জন্যে যে তুই এ সবের মধ্যে আমাদের সকলকে দেখতে পাবি, তোর এই বুড়িকেও দেখবি... এবার আয় দেখি আমার কাছে হাঁদারাম, সবার চোখের সামনে দে তোর চাঁদিতে একটা চুমু দিই। চুমু একটা দিতেই হয়, আর কেন দিতে হয় তা তো বুঝতেই পারছিস।'

তুদোয়েভা চুমু খেল টেনরের মাথায়। সবাই এমন হাততালি দিল যে সারা গাঁয়ে তা শোনা গেল। জবাবে টেনর চুমু খেল পেলাগেয়া কুজমিনিচনার হাতে আর তার ফলে, যেমন বলা হয়, করতালি পরিণত হল অভিনন্দনোচ্ছ্বাসে।

তরুণ কমিউনিস্ট আন্দ্রেই লগিনভ টেনরের মারফত মার্কিন জনগণ ও শান্তিকামীদের অভিনন্দন জানাল। বক্তৃতা শেষ করার সময় প্রসঙ্গত ও বলল:

'আমাদের যৌথখামারীরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার মারফত আপনার কথাবার্তা থেকে সেই আমেরিকাকে দেখেছে, যাকে না ভালোবেসে পারা যায় না, বিশেষ করে আমার পক্ষে। টেকনোলজি আমার কাছে শুধু পেশা নয়, সেই আমার জীবন। প্রিয়বর মিঃ জন টেনর, আমাদের যৌথখামারীদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে আপনি যে কত বড়ো শান্তিযোদ্ধা বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তা আপনিও জানেন না। সত্যের পক্ষে চটক দরকার হয় না: আপনাদের অনেক কিছুই আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। আর শ্রদ্ধেয় জন টেনর, আমাদের কিছু কিছু ব্যাপারও আপনার কাছে বোধগম্য নয়। আমাদের জীবন ধারা ভালো করে যাতে বোঝার সুবিধা হয় তার জন্যে "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব" ইংরেজি ভাষায় এঙ্গেলসের এই বইখানা উপহার দিতে দিন। সেই সঙ্গে আমার তৈরি এই পুলি যন্ত্রটাও নিন, এর

একপাশে ইংরেজিতে অন্য পাশে রুশীতে লেখা আছে "বাখরুশিতে তৈরি"। গ্যারান্টি দিচ্ছি, যে কোনো কাদা থেকে আপনার গাড়িকে ঠেলে তুলতে পারবে।'

প্রধান মেকানিকের বক্তৃতার জবাবে প্রচুর হাসি উঠল চারিদিক থেকে। টেনরও হেসে গ্রহণ করল লগিনভের উপহার।

'আমাকেও... আমাকেও অনুমতি দিন...' টেনর বললে। 'মানে আমিও একটা উপহার দিতে চাই। তবে কেউ কেউ যেহেতু যাবার সময় উপহারটা খুলে দিতে ভুলে যায় তাই আমি এখনই এটা খুলে দিচ্ছি।'

টেনর তার ছোটো কিনোক্যামেরাটা খসিয়ে তুলে দিল আন্দ্রেইয়ের হাতে।

'শেষ পর্যন্ত আমার অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ শুরু করা গেল,' টেনর বললে। 'আমি ভাই এবার আপনাকে, প্রিয় আন্দ্রেই, আমেরিকান টেলিভিজনের করেসপণ্ডেণ্ট করে নিলাম। এখানকার সকলের মতোই আমি তার নাম জানি না, কিন্তু সেই বিশেষ মেয়েটির ছবি তুলে তুলে আপনি যখন একটু ক্লান্ত হবেন তখন লেনিভি চড়াইয়ের নির্মাণকাজের যে ছবি আমি শুরু করেছিলাম, সেটা যেন আপনি চালিয়ে যান, এই অনুরোধ। পুলি যন্ত্রটার জন্যে ধন্যবাদ। অনেক দিন থেকে ওটার ওপর আমার নজর ছিল, যেমন আমার ক্যামেরাটার ওপর নজর ছিল আপনার। এবার আমাদের কাটকুট।'

ফের হাসির হররা উঠল।

'বইটার জন্যেও ধন্যবাদ, নানা লোকের কাছ থেকে আমি ইতিমধ্যেই এ বইখানার সাতটা কপি পেয়েছি, এটিও নিলাম।'

টেনরের পর অভ্যাগত ভবনের অলিন্দে হাজির হল পাইওনিয়ররা। বিউগল বাজাল তারা, তারপর আলাদা আলাদা করে এবং সমবেত স্বরে যে কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগল, সেটার রচনায় বোঝা যায় বড়োদেরও হাত ছিল।

কবিতাটা অবশ্য ছাপার মতো নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ওটা ছাড়া চলে না। তাই মেনে নিতে হচ্ছে।

ফুর্তিতে মাতনের কে করেছে পণ?
মিস্টার টেনর, মিস্টার জন!
কাজের সময়ে কার তন্ময় মন?

ক্লান্তি না জানে সে তো চা-চা জন।
ঘেরাও করেছে কাকে বালবাচপন?
রেড ইণ্ডিয়ান বীর বাহাদুর জন।
চালবাজ বেশভূষা কে করে অমন?
ফ্যাশনের রাজা সেই মিস্টার জন।
কাদায় কিসের ছবি তোলে কোন জন?
যেই হোক — নন তিনি মিস্টার জন।
বনেতে করেছে কেবা এ সমালোচন:
"হেথায় যে সবই খাশা, নয়কো তেমন"
অমায়িক সত্যভাষী মিস্টার জন।
মিল সব শেষ, ছড়া হল সমাপন,
শুভ যাত্রা, শুভ হোক মিস্টার জন,
ফের যেন এ গাঁয়েতে হয় আগমন,
বাখরুশি গ্রাম ফের করবে বরণ!
কেমন?

'আরে না না ছেলেরা!' স্মিত মুখে বলে উঠল জন, 'মিল সব এখনো শেষ হয়নি। আছে আছে... যেমন "যাপন" "আপন"। পদ্য আমিও বানাতে পারি। ধরো — এই রকম:

খুবই মধুর আর একান্ত আপন
হয়ে করে গেছি ভাই দিবস যাপন,
জবাবে বলিলা শেষে মিস্টার জন,
রেখে যাই চিত্তের অভিনন্দন।

টেলিভিজনের লোকেরা যথারীতি দেরি করে এল। তাহলেও শিশুদের সঙ্গে বিদায়ের পালাটা তারা রেকর্ড করে নিতে পারল। এতে টেনর খুশি হয়েছিল, খানিকটা পোজও দিল।

টেলিভিজনের লোকেদের আগমনে অনানুষ্ঠানিকতা খানিকটা কমে গেল এবং ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা বাখরুশিনা সম্ভবত যা বলতে চেয়েছিল তার চেয়ে কমই বললে, তবু নেহাৎ কম নয়, আর তেমন আনুষ্ঠানিকভাবেও নয়।

টেনরের যাত্রা পথের জন্যে এক বাক্স খাবার এনেছিল সে। "মিঃ টেনর" বলে সম্ভাষণ করার বদলে সে মুখ ফসকে বললে "কমরেড টেনর"। এতে

খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে সে একটু থামল কিন্তু ঠিক করলে, যা বলে বসেছে সেটা সংশোধন না করে চালিয়েই যাবে:

'প্রিয় কমরেড জন টেনর! বাক্সটায় কিছু খাদ্য পানীয় আছে। এতে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত আপনার চলে যাবে, এমন কি খাইয়ে কোনো লোকের সঙ্গে যদি তা ভাগও করেন তাহলেও। কিন্তু অনুরোধ রইল জন, আমার খাবার যেন যাকে তাকে দেবেন না। এতে এমন কিছু নেই যা রাস্তায় নষ্ট হয়ে যাবে। খুবই আনন্দ পাবো যদি এর কিছুটাও আপনি নিজের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন আর আপনার স্ত্রী বেটসি, আপনার বাবা মিঃ টম টেনর, আপনার মা মিসেস জয় টেনর ও আপনার ছেলেপিলেদের জ্যাকব, কিটি, আর আমার কাছে যে নামটা খুব প্রিয় সেই পিটার নামের ছোটোটির হাতে দেন। আপনার ঐ পিটারের জন্যে এর ভেতর একটা ছোট্ট থলি আছে, মোরগ আঁকা। তাহলে আসুন, ফের দেখা হবে, ফুর্তিবাজ জন টেনর। ঠিকানা দিয়ে যেতে ভুলবেন না। আশা করি আমেরিকায় যাবার সুযোগ পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের আবার হবে। তা যদি হয় তাহলে আমিও ছেড়ে দিচ্ছি না। আমেরিকায় এখন তো আমার পরিচিত রয়ে গেল,থাকার জায়গাও পাব। এই খাবারের বাক্সটা তাই খুব শস্তা পড়বে না আপনার...'

টেনর মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল, তারপর চুমু খেল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনার হাতে। খুব সাজগোজ করে, আতর মেখে এসেছিল ইয়েলেনা সের্গেয়েভনা, কাঁধের ওপর একটা গোলাপী শাল, তাতে করে ওর গালের আরক্তিম ছোপটাকে ফুটিয়ে তুলেছিল আরো। নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাষণটা দিতে পেরেছে বলে ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল সে।

ভিড়ের মধ্যে দূরে দাঁড়িয়েছিল বাখরুশিন, সপ্রশংস চোখে সে তাকিয়ে ছিল বৌয়ের দিকে। আজ সবই তার কাছে ভালো লাগছে, ভাষণ, রসিকতা, এমন কি বৌয়ের দুঃসাহসী লেস পোষাকটা এবং তার চেয়েও দুঃসাহসী তার জুতোর ছুঁচলো হিলটা পর্যন্ত। আজ এ সবই মানানসই। বিদায়ীর প্রতি সে সম্মান দেখাচ্ছে শুধু কথা দিয়ে, খাবারের বাক্সটা দিয়ে নয়, তার বিদায় উপলক্ষে সাজের ঘটা করেও। বিদায় সম্বর্ধনাটাও ভালোই চলছে। কেনই বা চলবে না, যখন সবই যে খুব আন্তরিক, কোনো রকম বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রধান মেকানিকের ভাই ড্রাইভার আলেক্সেই লাগিনভ বাস নিয়ে এল। সেও খুবই যুতসই একটা কথা বললে:

'আমার কপাল ভালো মিঃ টেনর। আমেরিকা থেকে আসা আমাদের দ্বিতীয় অতিথিকেও আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব। পৌঁছে দেব আর আশা করব যে আপনি আমায় বখশিস দিতে কি সিগারেট লাইটার গুঁজে দিতে চাইবেন না, এবং যাবার সময় করমর্দন করে বিদায় নিতেও ভুলবেন না।'

টেনরও কম গেল না।

'আমি দেব সিগারেট লাইটার? পাগল নাকি!' তবে চশমার কথা আলাদা...'

আলেক্সেই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দেখা গেল টেনরের কালো কাঁচের সানগ্লাস ওর চোখে।

'এটা আমি গুঁজে দিচ্ছি না, আপনার নাকের ওপর আপনার পেশার উপযোগী একটা জিনিস যথাস্থানে পরিয়ে দিচ্ছি। এটি আপনার চোখকে শুধু ঠাণ্ডা রাখবে তাই নয়, অতিথিদের কেবল নম্বর মাফিক — এক নম্বর অতিথি, দুই নম্বর অতিথি এইভাবে চেনার বদলে কে কী ভাবে যাচ্ছে তা দেখেও চিনতে সাহায্য হবে।'

'ধন্যবাদ মিঃ টেনর, আমিও সেটা জানি বলেই বাঁধাকপির লরি না নিয়ে বিয়াল্লিশ সিটের খাঁটি কোচবাসে করে এসেছি।'

টেনরকে এয়ারপোর্টে বিদায় দেবার জন্যে ড্রাইভার আলেক্সেই লাগিনভের আমন্ত্রণে বেশি সংখ্যাতেই সাড়া দিয়ে বসল লোকেরা। ঠিক এই ভয়টাই করছিল বাখরুশিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হল। বাচ্চাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা হল শুধু দুজন "রেড ইণ্ডিয়ান"। তুদোয়েভা ধরে নিল সে এখানেই তাকে বিদায় জানিয়েছে। ইয়েলেনা সের্গেয়েভনাও তার সঙ্গে যোগ দিল। গেল শুধু প্রধানত পুরুষেরা।

বাসটা পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ কিনেছিল অল্পদিন আগে, শনিবার রবিবার যৌথখামারীদের থিয়েটর বা সার্কাসে যাবার জন্যে। সেটা এখন খুব কাজে লেগে গেল। যে করেই হোক, টেলিভিজনে এখন ওটা না উঠে পারবে না। কাগজে, রেডিও বা নিউজ রীলে কলখজের সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য হোক এটা দেখতে খুবই ভালোবাসত যশোলোভী বাখরুশিন। বাসটাকে সে

তার সাংস্কৃতিক সাফল্য হিসাবে গণ্য করত, এটা নিয়ে কোথাও কোনো মন্তব্য হয়নি বলে খেদ ছিল তার। তাই টেলিভিজন অপারেটরের পাশে বসে সে ধীরে সুস্থে হলেও খানিকটা ধূর্তের মতোই বুঝিয়ে দিলে বাসটার প্রসঙ্গ উঠলে কী ধরনের কমেণ্টারি হওয়া উচিত; ওর ভয় ছিল অপারেটর হয়ত ওটাকে ভাড়া করা বাস বলে ভাববে।

এয়ারপোর্টে আগেই এসে হাজির হয়েছিল স্তেকোলনিকভ। এসেছিল জেলা সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ও জেলা-পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। টেনর যে তাদের কাছে সাধারণ টুরিস্ট মাত্র নয় সেইটে বোঝাবার জন্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো হয়ে উঠবে এই আশা প্রকাশ করে এবং সরকারী পদাধিকারীদের পক্ষে যা যা বলা আবশ্যক সে সব বলে, অথবা সঠিকভাবে, আওড়িয়ে জেলা সোভিয়েতের সভাপতি ও পত্রিকা-সম্পাদক শুভ যাত্রা ও বইয়ের সাফল্য কামনা করল টেনরের, জানাল, মার্কিন সংবাদপত্রের প্রগতিশীল প্রতিনিধিটি যে প্রীতিকর ছাপ রেখে গেলেন তা তাঁর দুর্ভাগা সহযাত্রীর পলায়নে বিন্দুমাত্র নষ্ট হবে না।

সম্পাদক জিজ্ঞেস করল:

'কাগজে ছাপার জন্যে কোনো বিবৃতি দিলে কি মিঃ টেনরের অসুবিধা হবে?'

এ সম্মানের জন্যে টেনর ধন্যবাদ জানাল। কাগজের একটি লোক সেই উদ্দেশ্যেই হাজির হয়েছিল, তার কাছে বিবৃতি দিয়ে গেল টেনর, ধন্যবাদ জানাল অভ্যর্থনার জন্যে, সোভিয়েত গ্রামের জীবন ব্যাপকভাবে দেখার সুযোগের জন্যে, এবং শেষ পর্যন্ত বিদায় সম্বর্ধনা ও আস্থাপ্রকাশের জন্যে যা এখনো সে পূর্ণ করে ওঠেনি।

প্লেনে ওঠার ঘোষণা হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মস্তো লোহার পাখিটা উঠে গেল আকাশের নীলে, আর বুকের ভেতরে কেমন ভার ভার লাগল পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের।

মাসখানেক আগে ও টেনরের আগমন প্রতীক্ষা করছিল আশঙ্কা নিয়ে, আর এখন ওর সঙ্গে পরিচিত হয়ে, অভ্যস্ত হয়ে খেদ হচ্ছিল যে মাসটা

কেটে গেল অত তাড়াতাড়ি। এত তাড়াতাড়ি যে আমেরিকায় নিয়ে যাবার মতো যত কথা সে অতিথিকে বলতে চেয়েছিল তার এক দশাংশও সে বলে উঠতে পারেনি।

অন্যদিকে কে জানে, বাখরুশি থেকে টেনর যা জোগাড় করে নিয়ে গেল তা নিয়ে কী সে করবে? হাজার হোক, ও তো পরের অধীন।

তবু ভালোটারই আশা করা ভালো। আশা... কিন্তু মোহ রাখা নয়।

সবই তো হতে পারে জীবনে...

৫৪

পথের একটা জায়গা থেকে তারপর নিউ ইয়র্ক থেকে বাখরুশিতে এসে পৌঁছল টেনরের নিরাপদ পৌঁছনের খবর ও মুখরোচক উপহারের জন্যে তার গোটা পরিবার থেকে ধন্যবাদ দেওয়া টেলিগ্রাম। ত্রফিম সম্বন্ধে একটি কথাও নেই।

আমেরিকায় ও ফিরল একা একা নাকি টেনরের সঙ্গে, তা জানা গেল না। কিন্তু কী এসে যায় তাতে। টেনর যখন চিঠি লিখবে তখন জানা যাবে।

কিন্তু চিঠি এল না টেনরের।

সময় যায়, আর একই জবাব দেয় ডাক পিয়ন আরিশা।

'আমেরিকা থেকে কিছুই নেই।'

বছরের যোগ মেলাচ্ছিল উদার শরত। প্রতি সন্ধ্যায় অ্যাকাউণ্টেণ্টের সঙ্গে বসে বাখরুশিন হিসেব করছিল লেনিভি চড়াইয়ে নতুন বসত পাড়ার জন্যে কতটা খরচ করা সম্ভব। খামার থেকে এবং রেলওয়ে বাবদ যে কয়েক লাখ টাকা মিলেছে তা যথাসত্বর লগ্নি করার ইচ্ছে তার।

লেনিভি চড়াইয়ে দিন রাত কাজ চলছিল। কাজ করছিল নিজেদের লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোকেরাও। প্রধান কৃষিবিদ স্মেতানিন ও পার্টি সেক্রেটারি দুদোরভ থেকে শুরু করে সবাই অন্তত ঘণ্টা দুয়েক করেও খাটত নির্মাণকাজে।

অভ্যাগত ভবনটা এখন নির্মাণকাজের আপিস হয়ে উঠেছে। মনেই হয় না যে ওখানে আমেরিকা থেকে আগত অতিথিরা ছিল। কেবল মোরগ

ক্ষোদাই করা কাঠের নক্সা তোলা তক্তায় তৈরি পায়খানাটা নিয়ে বাখরুশির রসিক লোকেরা এই বলে কিছু কাঁচা রসিকতা করত যে মাতৃভূমিতে ত্রফিম শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বের এমন কিছু একটা রেখে গেছে যা তার বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত প্রতীক।

আর টেনরের নাম থেকে গেল বাখরুশিতে। শুধু কলখোজকে উপহার দেওয়া ফোটোগ্রাফগুলোতে নয়, স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের ছবিতে নয়, একেবারে স্বনামে। কেন জানি কাঠ বইবার মস্ত ট্রেলারটার নাম হয়ে গেল "টেনর"। ফুর্তিবাজ যে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে এসেছিল এখানে, তার নাম জুটল "টেনর"। আন্দ্রেই লগিনভকে দেওয়া কিনোক্যামেরাটারও নাম হল "টেনর"।

মার্কিন অতিথিদের যে আগমনটা কিছুদিন আগেও একটা মস্ত ব্যাপার বলে ধরা হত সেটা এখন কলখোজ জীবনের একটা খুচরো ঘটনায় পরিণত হল।

সবকিছু ঢাকা পড়ল নির্মাণের কাজে।

নির্মাণটা সকলের কাছেই একটা প্রধান ব্যাপার। লোকেদের বাড়ি উঠিয়ে নিয়ে লোনিভি চড়াইয়ে বসানো হল অথবা নতুন করে গড়া হল। তার একটা করুণ দিকও না ছিল নয়। গোরামিলকার মাত্র ওপারে উঠে গেলেও অভ্যস্ত ঘরবাড়িই তো ছেড়ে আসতে হল, যেখানে বহুকাল বাস করে গেছে তাদের মা বাপ, ঠাকুর্দা ঠাকুর্মারা। প্রতিটি গাছ প্রতিটি পাথর প্রতিটি কুয়ো হঠাৎ হয়ে উঠল ভারি প্রিয়।

নতুন বাখরুশিতে রাস্তায় না হয় জলের কলই থাকল, ইচ্ছে করলে নিজের পয়সায় বাড়িতেও ট্যাপ বসানো যাবে, কিন্তু তাতে কী? নিজের নিজের কুয়োর জলে যে রুচি গড়ে উঠেছে লোকেদের। রুশী চুল্লি ভাঙাটাই তো একটা মস্ত ব্যাপার। ঠাকুর্দা শুত ওখানে। বাচ্চা বয়সে ঠাণ্ডার দিনে নিজেরাই খেলা করেছে সেখানে। আর এখন তার ইঁটগুলো হল আবর্জনা।

শহুরে লোকে পুরনো বাসা ছেড়ে আসে নতুন বাসায় হালকা মনে, কিন্তু গ্রামে তা এত রাশি রাশি খুঁটিনাটি মনে পড়িয়ে দেয় যে লোকে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, মাঝে মাঝে পুরনো শ্যাওলা ধরা ঝুনো ছাতটার জন্যে কেঁদেও ভাসায়।

কে এখন টেনরের কথা ভাববে, ত্রফিম তো ছেড়েই দাও।

কিন্তু আমেরিকায় নিকিতা সের্গেয়েভিচ খ্রুশ্চভের স্মরণীয় সফরে ত্রফিম আর টেনরের কথা ফের মনে পড়ল লোকের।

সফরের সে দিনগুলোয় সারা দেশের মতো বাখরুশিনতেও লোকে রেডিও কখনো বন্ধ করত না, টেলিভিজন প্রোগ্রাম ছাড়ত না। প্রতি ঘরে ঘরে শান্তির বিপুল আশায়, সোভিয়েত দেশের এই দূতের বক্তৃতার সাফল্যে আনন্দে লক্ষ লক্ষ লোকের মন ভরপুর।

রেডিও ও কাগজের প্রতিটি কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ টেনর ও ত্রফিমের সঙ্গে তার অনতি অতীতের সম্পর্কটা যাচাই করে নিচ্ছিল। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে খ্রুশ্চভ যে নীতিনিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছেন, সে কি তার কলখোজের ক্ষেত্রে, তার কথাবার্তা আর আচরণে তেমনি নীতিগত অবস্থান বজায় রেখেছিল?

আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় ত্রফিমের ফার্মটা বা পিওতরের গ্রামের কলখোজটা তো একটা অণুমাত্র। কিন্তু এ অণুগুলোর চরিত্রও যে তাদের স্ব স্ব, দেশেরই অনুরূপ।

আয়তনে তফাৎ, কিন্তু মর্মে এক।

নিজের কাজ, আচরণ, কথাবার্তা যাচাই করে বাখরুশিন গলদ কিছু পেল না। তারই ভাবনা, তারই কামনাই তো এখন ধ্বনিত হচ্ছে আমেরিকায়। সে হয়ত ঠিক অমন প্রাঞ্জল করে অমন সাহস করে এসব বলতে পারত না, কিছু কিছু ভাবনা ও লক্ষ্য হয়ত তার মাথাতেও ছিল না, কিন্তু নিকিতা সের্গেয়েভিচের কথা পড়ে এবং শুনে সে দেখছে এ যেন তারই ধ্যানধারণার ক্রমানুবর্তন। ও নিজে যদি তা পুরোপুরি সবখানি ভেবে বার না করে থাকে তো সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল, এখন ও সবই ভাবতে পারছে নিজের প্রত্যয় হিসাবে, কারো ওপর একটা ভয়ানক উঁচু আস্থা শুধু রেখে নয়, নিজেরই অভিজ্ঞতালব্ধ একটা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি থেকেও।

বাখরুশিন হয়ত ত্রফিমের কথা ভাবত না, কিন্তু ওর অস্বস্তি লাগছিল এই জন্যে যে সে কারো কাছে বিদায় না জানিয়ে পালাল তাই নয়, নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেও একটা চিঠি পাঠাল না ধন্যবাদ জানিয়ে। তার মানে, ভেতরে মতলব আছে। আর হয়ত এখন, সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রধানের আমেরিকা

সফরের সময় কোনো দুষ্ট চক্র হয়ত তাকে টেনে আনবে কোনো সাক্ষাৎকারে, আর ঐ আত্মবিক্রীত লোকটা হয়ত যা-তা বলবে বাখরুশি সম্পর্কে।

দুর্ভাবনাটা আরো বাড়ল যখন গুজব শোনা গেল এবং পরে স্তেকোলনিকভও টেলিফোন করে জানাল যে টেনরকে টেলিভিজনে একবার দেখা গেছে। শান্তি দূত নিকিতা সের্গেয়েভিচকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সমবেত নিউ ইয়র্ক বাসীদের মধ্যে সেও করতালি দিচ্ছিল।

তার মানে ত্রফিমও হয়ত আছে সেখানে... কিন্তু ঘটনায় তার কোনো সমর্থন মিলল না।

তাহলেও, পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের আশঙ্কা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। নেকড়ে নেকড়েই রয়ে গেল।

৫৫

যখন প্রথম বরফ পড়ে মাঠ, বন, ঘরবাড়ি শাদা করে তুলে শীতের সংকেত আনল, তখন চিঠি এল আমেরিকা থেকে। চিঠি নিয়ে এল আরিশা এবং কোনো গৌর-চন্দ্রিকা না করে বললে:

'নেকড়ে ডাক ছেড়েছে...'

এ চিঠিটাও প্রথমটার মতোই টাইপ করা, কিন্তু অন্য মেশিনে, ভুলভ্রান্তি নেই।

চিঠিটি এই:

'৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৯।
নিউ ইয়র্ক।

যখন তুই, আমার অভিশাপ দাতা ভাই, আর তুমি, দু'দুবার প্রতারিত আমার প্রথম ও শেষ স্ত্রী দারিয়া স্তেপানোভনা এ চিঠি পাবে, তখন সম্ভবত আমি আর এখানে থাকব না।

তুই যা চেয়েছিলি পেয়েছিস। আমার হৃদয় এখন ফাঁকা, পুরনো সেলারের মতো। ভূতের আড্ডায় ভূতেরা যেখানে পরস্পরকে বাজি রেখে তাস খেলে, সেখান থেকে খসে এসেছি আমি, কিন্তু সর্বস্বান্ত আহাম্মুক হয়ে

বেরিয়ে আসিনি, সকলের সঙ্গে রীতিমত হিসেব চুকিয়ে নিয়েছি। টেনরের সঙ্গেও।

আমার জন্যে, তোর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যাপার নিয়ে টেনরের যা পাওনা ছিল তার অর্ধেকটা সে আমায় দিতে চায়নি। কিন্তু আমায় অমন গোবেচারা পাওনি, এক পয়সাও যে কেউ আমায় মেরে দেবে সেটি হবে না। আমি কোম্পানির চিফকে বললাম, কমিউনিস্ট পার্টির ২১শে কংগ্রেসের নামধারী যৌথখামার নিয়ে টেনরের স্তবস্তুতির সত্যতা আমি অস্বীকার করি; ভোদকা এবং তার এলবা তীরের বন্ধু কমিউনিস্ট স্তেকোলনিকভের প্রভাবে দূর শুতিওমির বনের পিকনিকে সে সম্ভবত না বুঝেই এ পার্টির আনুগত্য গ্রহণ করে বসেছে।

টাকাটার অর্ধেকটা না দিতে গিয়ে টেনর সবই হারাল। বাখরুশি যাবার আগে সে যা অগ্রিম নিয়েছিল, সেটা তারা আদায় করে নিতে শুরু করে, আর বইটা লেখার ভার দেয় আমাকে। আমি বই কখনো আগে লিখিনি, তাই আমার কথা শুনে বইটা লিখে দিয়েছে অন্যে।

বইটা তোর কি দুদোরভ কি স্তেকোলনিকভের মনোমত হবে, সে বলি না। সত্যের অপলাপ হয়নি তাও বলি না। যাচাই করে দেখিনি, ওরা যা সব লিখেছে তার অর্ধেকটাও পড়া হয়ে ওঠেনি। কীই বা এসে যায় তাতে? আমি না করলে, অন্যে করবে। আর অন্যে যদি করে তবে টাকাটা সেই পাবে, আমি নয়। তাই আমার করাই ভালো। নেকড়ে যখন হয়েছি তখন নেকড়েমিই করি। তাছাড়া টাকাটা ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই, "আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবার রকম" বইটার প্রতিটি পাতায় আমি সই দেবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সামনে এনে ফেলে দিলে টাকাটা। টাকার দরকার ছিল আমার, আমায় যারা ঘা মেরেছে তাদের সকলের সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে নেবার জন্যে। টাকাটায় আমি এলজার ফার্মটা কিনে নিই। বললাম, ফার্মের মালিক হয়ে মরতে চাই, তারপর তো সেটা আন্নির কাছেই যাবে। এলজা অবিশ্বাস করল না। হপ্তাখানেক পরেই অবশ্য আমি ফার্মটা বেচে দিই এক জোয়ান রক্তচোষার কাছে। এলজার এখন না আছে ফার্ম, না আছে পপলার কুঞ্জ, শোবার ঘরও নেই। সেই সঙ্গে তার বড়ো চাকা, আমিও নেই। কিছু নেই। কেবল টাকা আছে। আমার প্রতি

যে দয়া দেখিয়েছিল, আমার জীবনটা যে চুষে খেয়েছিল তার সবকিছু আমি মিটিয়ে দিয়েছি ওকে। টেনরের মতো ও এবার একটু সমঝাবে।

কোথায় গিয়ে বসব তা এখনো জানি না। এখন আছি হোটেলে। সম্ভবত সুইজারল্যাণ্ডে চলে যাব, শুনেছি সেখানকার পাহাড়গুলো নাকি উরালের মতো। কিংবা হয়ত যাব ইংলণ্ডে। দিন কাটাবার মতো টাকা আমার এখন আছে, রেখেও যেতে পারব আমার নাতি সের্গেইয়ের জন্যে, তার ঠাকুর্দা ধেড়ে নেকড়েকে যাতে তার মনে থাকবে। ওর জন্যে আমি একগাদা খেলনা-পাতি পাঠালাম। দেবার ইচ্ছে না হলে সে তোমাদের ব্যাপার। তবে বাচ্চাটার আনন্দ নষ্ট করে লাভ কী? এ সব আমি পাঠিয়েছি বরং সেটা না বললে। খৃষ্টমাস বুড়োও ওকে এসব দিয়ে যেতে পারে। খেলনাগুলোর দাম আছে। দুশ ছত্রিশ ডলার। ঘড়িটাও আছে তার মধ্যে।

এই আমার সব কথা। যা ভাবতে ইচ্ছে হয় ভেবো। আমার কাছে এখন সবই সমান। কারণ তোমাদের কাছে আমি এইবার পুরোপুরিই মরলাম।

সকলের উদ্দেশে

ত্রফিম ত. বাখরুশিন।

চিঠিটা পড়ে পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ সাশাকে ডেকে চিঠিটার প্রতিটি অক্ষর প্রতিটি কমা ফুলস্টপের নিখুঁত কপি করে মূল চিঠিটা সমেত সবগুলো ওকে ফেরত দিতে বলল।

ত্রফিমের চিঠি পড়বার সময় বাখরুশিনের মনে হয়েছিল ফের তার জীবনে একটা এলোমেলো ব্যাপার হবে। তা কিন্তু হল না। নিজেকে সে শুধু জিজ্ঞেস করল: "নিজেরই নোংরায় গড়াগড়ি দেওয়া একটা শুয়োরের কাছ থেকে আর কীই বা আশা করার ছিল? কিন্তু সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে লেখা চিঠিটার সঙ্গে এটা মেলানো যায় কী করে। সে চিঠিতে সই নেই বটে, কিন্তু একই লোকেরই তো ডিক্টেশন..."

আশা করল জীবনের কাছ থেকে সঠিক শিক্ষা পাবে লোকটা, শেষ উকুনটার মতো পিষ্ট হবে অবশেষে।

এটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের। লোকটার সবকিছু হীনতার মধ্যে এইটেই যেন হীনতম।

৫৬

কী চমৎকারই হত এখন আমেরিকায় গিয়ে উপন্যাসের শেষটুকুর জন্যে যা প্রয়োজন সেটা স্বচক্ষে দেখতে পারলে। এলজাকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে। তার হাতছাড়া খামারটা ঘুরে এলে। কী হল টেনরের সেটা জেনে নিতে পারলে। ও যে কিছুই লেখে না। কিছু ঘটল নাকি ওর?

আজ হোক কাল হোক টেনরের চিঠি অবশ্য আসবেই। কিন্তু চিঠি থেকে তো আর সব বোঝা যায় না। চিঠিতে যতই খুঁটিয়ে লেখা হোক, চোখে দেখা এক জিনিস, কানে শোনা অন্য ব্যাপার।

ত্রফিম সম্পর্কে কী ভাবছে এলজা সেটা জানতেও ভারি ইচ্ছে হয়। সৎ মেয়ে আন্নির স্বামী, ত্রফিমের জামাই ইউজিনই বা কী করল। ধেড়ে নেকড়ে তার ফার্মটি হাত করলেও সে কি আর ধোপার গাধাই থেকে যাবে? শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে এসব কথা যে করেই হোক থাকলে মন্দ হত না। কিন্তু যা নেই, তা নেই।

তাই পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ আর স্তেকোলনিকভের সঙ্গে একত্রে টেনরের চিঠির প্রত্যাশাতেই থাকি। সে প্রত্যাশা ওরা করছে বৈকি।

'কিছু একটা অন্তত তো লিখতে পারত!' বাখরুশিনকে বললে ফিওদর পেত্রভিচ। 'ওইটের মতোই হয়ে বসল না তো?..'

'কখনোই হতে পারে না,' পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ বাধা দিয়ে বলে উঠল। 'এর জন্যে আমি মাথা বাজি রাখতে পারি।'

এবারেও ভুল হয়নি বাখরুশিনের। চিঠি এল টেনরের কাছ থেকে। তার প্রথম ছত্র থেকেই টেনর যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। সে চিঠি যেন ওরই কণ্ঠে কথা কইছে:

'হ্যালো ফিওদর দোস্ত, হ্যালো কমরেড স্তেকোলনিকভ, চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে উঠে আয় আর তোর দাঁতের ফাঁকে আমার সম্বন্ধে যত গালমন্দ জমেছিল তা কুলকুচি করে ঝেড়ে ফ্যাল।

দোস্ত ফিওদর, চিঠি দিয়ে লোকের মেজাজ খারাপ করতে আমি চাই না। সে কাজ অন্যে করুক। আমি সবসময় লোককে খুশি করতে চাই। এটা আমার অতীতের জের, এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

কী আর তোকে তখন লিখি, যখন মলোকান ধর্মপুত্রটি হঠাৎ এমন এক সাপ হয়ে দেখা দিল যার পাশে কাল কেউটেকেও নির্বিষ কেঁচো বলে মনে হয়। ও আমার প্ল্যান সব ভণ্ডুল করে দেয়, আমার কণ্ট্রাক্ট নষ্ট করে দেয়। ওকে সাগর পারে নিয়ে গিয়েছিলাম যে জন্যে সেইটেই সে মেরে দিলে। আমার খ্যাতি সে এমনভাবে নষ্ট করে যে জেলখানাই আমার কাছে পরিত্রাণ বলে মনে হয়েছিল, ওর বেইমানির ফলে আমি প্রায় দেশের শত্রু বলে ঘোষিত হতে চলেছিলাম।

কণ্ট্রাক্ট নাকচ হওয়ায় অগ্রিম টাকাটার জন্যে মামলা ঠোকে আমার বিরুদ্ধে।

রাশিয়ায় যাকে বলা হয় “কালো দিন” সেই দুর্দিনের জন্যে যা কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিলাম সব তুলে দিয়ে হাডসন পাড়ের বাড়ি থেকে আমার পরিবার চলে যাবার আয়োজন করছিল অপরের একটা মোটরে, কারণ আমার “ফোর্ডটা” ঋণশোধেই চলে যায়।

কিন্তু, ফিওদর, কিন্তু!..

পরের ছত্রেই তোর মেজাজ ভালো করে দিতে আমি পারি না। নেহাৎ সহানুভূতির খাতিরে অন্তত মিনিটখানেকের জন্যেও তার খানিকটা অন্তত ভোগ কর, যা আমি অতদিন ধরে ভুগেছি। মনে হয় বুঝি একশ বছর। মিনিটগুলো যেন তখন সপ্তাহের চেয়েও বড়ো, এক এক সপ্তাহ এক এক বছরের চেয়েও লম্বা।

কিন্তু ফিওদর... কিন্তু এলেন মিঃ খ্রুশ্চভ। খ্রুশ্চভ এলেন এবং প্রথম দিকটায় আমার জীবনের কিছুই বদলাল না। তুই তো জানিস, কিছু কিছু লোকে কী ধরনের অভ্যর্থনার আয়োজন করছিল, কিন্তু পরে যখন লক্ষ লক্ষ লোক নিকিতা সের্গেয়েভিচ খ্রুশ্চভের বক্তৃতা শুনল, তখন কী রকম টনক নড়ল। মিঃ মলোকানের যে বইটায় এমন কি ভূগোল পর্যন্ত গুলিয়ে বসা হয়েছে, সেই বইটার কয়েক ফর্মা ছাপার পরে তাদের মাথাতেও টনক নড়ল খানিকটা। হাডসন তীরের বাড়ি থেকে শুষ্কমুখ মিঃ টেনর উঠে যাবার

আগেই কম্পানি কুৎসা রটনার চেয়ে বরং একটা লোকসান মেনেই বইখানাকে একটি কাগজে হালুয়ায় পরিণত করতে রাজী হল।

নিকিতা সের্গেয়েভিচ খ্রুশ্চভ আমার অস্তিত্বের কথাই জানেন না, তাঁর আগমন আমার জীবনের কাছে কী তাৎপর্যপূর্ণ তা তিনি কল্পনা করতেও পারবেন না। কী রকম ধন্যবাদ যে ওঁকে আমি দিয়েছিলাম তা যদি তিনি জানতেন! আমার আসন্ন সন্তান যদি ছেলে হয় তবে তার কী নাম রাখব তা যদি তিনি জানতেন!

এবার কিন্তু খুব ধীরে ধীরে পড়িস ... খুব সন্তর্পণে, কিছু যেন চোখ এড়িয়ে না যায়।

একদিন সন্ধ্যায় বসে বসে ভাবছি ঋণশোধের জন্যে আর কী বিক্রি করা যায়, এমন সময় টেলিভিজনে ফুটে উঠল রুশী চাষী কিরিল তুদোয়েভ, ঘোষক বললে, তিনি মার্কিন রুচি ও রাশিয়া সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অনুযায়ী খালি পায়ে পুরনো পদ্ধতিতে ঘাস কাটতে রাজী হয়ে বিখ্যাত সাংবাদিক ও রুশ ভাষাবিদ জন টেনরের সামনে পোজ দিচ্ছেন; রাশিয়া থেকে কিছুকাল আগে ফিরে এসে ইনি "একই গ্রহের দুই দিক" নামে একটি বই লিখেছেন, ভূগোলকের অন্যপৃষ্ঠে যাঁরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করতে চান তাঁদের কাছে বইটি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক হবে।

"বের্টসি," বৌকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। "জিনিসপত্র গোছগাছ করা ছেড়ে টেলিভিজনের আলোয় খানিকটা চোখ জুড়িয়ে নেবে এসো। সেখানে তোমার স্বামীর সত্যের জয় হল বলে মনে হচ্ছে।"

বের্টসি ছুটে এল। বাবা আগেই ছিলেন সেখানে। আমার গেলাসে কিছু একটা ঢালতে শুরু করলেন তিনি।

স্ক্রীনে ইতিমধ্যে কিরিল আন্দ্রেয়েভিচকে ঢেকে এগিয়ে এসেছে ঘাসকাটা মস্তো ট্র্যাক্টর, "দিন চনচনে, হাওয়া সনসনে", "ঝরঝরে খরখরে" বিচালির গাদা আর শোনা গেল মেয়েদের গান, আমার ছোট্ট টেপরেকর্ডটায় যা তুলে নিয়েছিলাম।

তারপর আমি যেভাবে জুড়েছিলাম সবটাই দেখানো হল। দারিয়া স্তেপানোভনা আর তার গরু। তার সোনার তারকা — নতুন গরুর জাত

তোলার জন্যে — সারা স্ক্রীন জুড়ে। কেউ ছেঁটে দেয়নি। বুঝেছিস ফিওদর, ফিল্ম থেকে কেউ তা বাদ দেয়নি। বললাম:

“বাবা, আর এক বোতল দরকার, কেন তা পরে বুঝিয়ে বলব।”

বাবা নিয়ে এলেন দু'বোতল। ছেলের সঙ্গে কেমন একটা মিল আছে।

পরে সারা স্ক্রীন জুড়ে এল কাতিয়া আর সেরিওজা। কাতিয়ার মুখ ফুটে উঠল দারিয়া স্তেপানোভনার মুখের ফেড আপ থেকে। দারিয়া যেন তরুণী হয়ে উঠেছে। ছবিটাও রঙীন। কাতিয়া এবার হলিউডের স্টার হয়ে যেতে পারে আর তুদোয়েভা হয়ে যেতে পারে নিউ ইয়র্কের সেরা মডেল। কয়েক গণ্ডা রুশী পোষাকে ওকে দেখিয়েছি — গত শতাব্দীর থেকে শুরু করে।

বাখরুশি গ্রামের নতুন ভিত পত্তনের ছবি দেখেছে লাখ লাখ লোক। কাতিয়ার মতো এ ছবিটাও ফুটে উঠেছে... (মাপ কর ভাই, ঠিক শব্দ জোগাচ্ছে না...) মানে ধর, ফুটে উঠেছে তার দিদিমা পুরনো গ্রামটার ছবি থেকে।

তারপর বড়ো বড়ো ওট গাছের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ক্ষুদে রেড ইণ্ডিয়ানরা। তারপর তারা হয়ে দাঁড়াল বেহালা বাজিয়ে। সারা আমেরিকায় তাদের বেহালা বেজেছে। পরে দেখা গেল তারা পায়রা পুষছে। মস্ত এজমালি পায়রা-ঘরের ছাত থেকে উড়ে গেল শাদা শাদা পায়রা। খুব যুৎসই! এই প্রথম ব্রডকাস্টটা শেষ হয় বড়ো চিশ্চার ড্রাইভারহীন ট্র্যাক্টরটার ছবি দিয়ে। সেই সঙ্গে আমার কথা, এই গ্রীষ্মেই তা আমি রেকর্ড করে রেখেছিলাম।

তারপর কী হল শোন। চাকা তখন উল্টোদিকে ঘুরতে লেগেছে।

কোম্পানি কণ্ট্রাক্ট রিনিউ করার প্রস্তাব দিল। কিন্তু “একই গ্রহের দুই দিক” বইখানা ছাপতে তখন কি আর শুধু ওরাই উৎসুক? মনে হল মাঝে মাঝে চার পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁত দেখাতে আমিও পারি।

না, না, ফিওদর, আমি একটা কালো বাজারী টাকার কুমির নই, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে হয়ত তাই। কেননা সেই হাতিয়ার দিয়েই এখানে লড়ে বেঁচে থাকতে হয়, যা এখানে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলে গণ্য।

ভাবিস না টাকা আমার দেবতা, যদিও এখন আমি তার আরাধনায় ব্যস্ত, কারণ এমন অভাবে আমি আগে কখনো পড়িনি। কারণ এখন আমি

কোম্পানির মধ্যস্থতা ছাড়াই আরেকটা বই ছাপাতে পারব: "স্বপ্ন ও তথ্য", পিওতর তেরেন্তিয়েভিচকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।

বললাম, বিনাপরাধে আমার কিছু কিছু সম্পত্তি যে বিক্রি করতে হয়েছে তার লোকসান সন্ধ্যের মধ্যেই পুরিয়ে দিতে হবে। তারপর ঐ চার পায় ভর দিয়ে থেকেই বললাম, কণ্ট্রাক্টের পাওনা ডবল করে দিতে হবে এবং তাও চেক বা নগদে শোধ দিতে হবে সন্ধ্যার মধ্যেই।

এবং এই মহড়া শেষ হওয়ার পরেই তোকে চিঠি লেখা উচিত ছিল। কিন্তু তা করিনি কারণ পাণ্ডুলিপি তখনো বই হয়ে বেরয়নি। না বেরনো অসম্ভব ছিল না, দেশটার সবই তো ভারি কণ্টিনেণ্টাল। আবহাওয়া। মেজাজ। যাক, বই বেরিয়েছে, বিক্রি হচ্ছে। এবার কোনো হাওয়ার ঝাপটাতেই তা পাঠকদের হাত থেকে খসিয়ে নেওয়া অসম্ভব। বইটা বেঁচেই গেল, কথা বলছে, আর আমি ইংরেজি লাইনের মাঝে মাঝে রুশি লাইন ঢোকাতে ব্যস্ত, তুই দেখে বুঝবি এলবার পরে গোরামিলকার তীরে আমাদের দেখাটা বৃথা হয়নি।

জানি, বইটা পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যে আরো অনেক কিছু ঢোকাবার ইচ্ছে হবে তোর। কিন্তু কেটে বাদ দেবার ইচ্ছে হবে এমন কিছুই তুই এতে পাবি না।

সচেতনতা বৃদ্ধির গতিবেগ নিয়ে আমাদের সেই আলাপটা আমি ভুলিনি। তুই হয়ত ভুলে গেছিস। কিন্তু তোর কথাগুলো আমার কানে বাজছে। এটা সেই রবিবারে, বনের মাঝের ফাঁকাটায়, যখন ঐ মলোকানটা (লোকটার উপাধিটা সম্মানীয়, সেটা তাই ওর সম্পর্কে উচ্চারণ করতে বাধে) চামচে করে সমস্ত কালো ক্যাভেয়ারটা খেয়ে শেষ করেছিল।

মনে হচ্ছে... কিন্তু সেটা তোকে বলব সরাসরি সাক্ষাৎ হলে। আমার বই সম্বন্ধে তোর ব্যক্তিগত অভিমত নিজ কানে শোনার সম্ভাবনা হবে বসন্তে। ফের রাশিয়ায় যাব।

তোর চুপচাপ অপরূপা স্ত্রী, তোর ছেলেমেয়েদের জন্যে আমার এবং সমস্ত টেনর পরিবারের মার্কিনী শ্রদ্ধা সহ রুশী সেলাম রইল। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচ (সেও আমার এক শিক্ষক), দারিয়া স্তেপানোভনা, কাতিয়া, দুদোরভ, স্মেতানিন, শ্রদ্ধাস্পদ কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ এবং আমেরিকায় মিসেস

“টুডয়িখা” বলে খ্যাত তাঁর স্ত্রী, আন্দ্রেই লগিনভ, এদের সকলকেও অভিনন্দন... এবং যাদের আমার ভালো লেগেছে, হয়ত যারা আমায় নিয়ে একটু মুখ টিপে হেসেও থাকে, তাদের সকলকেও। যেমন কর্ম তেমনি ফলই তো পায় লোকে।

তোর বাচাল জন

নভেম্বর, ৫৯
হাডসন তীরের বের্টাস ক্যাম্প,
আমার কাজের ঘরের পূব দেয়ালে
যেখানে তোর ছবি ঝুলছে।’

চিঠির শেষে ছোট্ট একটা পুনশ্চ:

‘পুঃ। নেকড়ের সম্বন্ধে কিছু বলিনি বলে নিশ্চয় অবাক হয়েছিস। একই পাতায় ওর সাহচর্য পছন্দ হয়নি।

পরের পাতাটা পড়িস। পরে যেন সকলে পড়ে। এটা আর চিঠি নয়, একটা উপসংহার, পেলাগেয়া কুজমিনিচনা তুদোয়েভার কাজে লাগতে পারে।’

৫৭

‘খাঁটি একজন মার্কিন সাংবাদিক হিসাবে আমার ধারণা যে চিঠি হলেও তা লোকে আগ্রহ সহকারে পড়ে যদি তার একটা প্লট থাকে। এ চিঠিটা আমার সমস্ত বাখরুশি বন্ধুদের কাছে লেখা, এটাকেও সেইভাবে ধরা হবে আশা করি...

অতএব...

নিউ ইয়র্কের এক সান্ধ্য পত্রিকার আত্মহত্যা কলমে (কাটিং দেওয়া হল) ছোটো ছোটো হরফে বেরয় যে ব্রুকলিন ব্রিজের কাছে ডিউটিরত পুলিস হেনরি ফিশম্যান একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে। ঝাঁপাবার আগে লোকটা তার কোট ছুড়ে ফেলে। ফিশম্যান লোকটার কোটের পকেটে দলিলপত্র এবং একটা ঠিকানাহীন চিঠি পায়। চিঠিতে শুধু একটি ছত্র

লেখা: "পরমেশ্বরই আমার বিচার করুন।" দলিলপত্র থেকে নাম বোঝা যায় ত্রফিম টি. বাখরুশিন, ফার্মার।

শ্রীমান নেকড়ের জীবন ত্যাগে সংবাদপত্রের আর বেশি আগ্রহ দেখা গেল না। কিন্তু যদি "ঠান্ডা লড়াইয়ের" সেবাদাস কোনো রিপোর্টার এ সংবাদ পরিবেশন করত, সে অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের বিষাদময় পরিণতি হিসাবে ফার্মারের মৃত্যুর ব্যাখ্যা দিতে পারত, বলত সেখানে ঐ সম্মানিত মহোদয় অবশ্যই কমিউনিস্ট প্রচারের বিষে হাল ছাড়া হয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় ও ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে।

এ থেকে সিদ্ধান্ত হত, যারা বিচক্ষণ লোক, লোকান্তরিত ভদ্রলোকটি সারা জীবন যে রকম বিচক্ষণ বলে পরিচিত, তাদের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়া ও কমিউনিস্ট ধারণার বিধ্বংসী প্রভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করা কী রকম বিপজ্জনক, খুব শক্ত ভদ্রলোক না হলে এ প্রভাব তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে।

এতে কেউ কেউ বিশ্বাসও করত।

কিন্তু সাধ্বী এলজার সাক্ষাৎকার নিলে সে হয়ত বলত যে তার ঐকান্তিক আরাধনায় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করার পরেই ঘটনাটা ঘটে।

ছুঁচলো মুখ করে এলজা, জানি না কাকে নিজেকে নাকি তার ঈশ্বরকে প্রতারণা করার জন্যে বললে যে, শেষ পর্যন্ত তার লোকান্তরিত স্বামী রবার্ট সম্ভবত ত্রফিমের সাহায্য বিনা লোকান্তরে যাত্রা করেনি। ত্রফিম লোকটা যে কী চরিত্রের সেটা জানার পরই কথাটা তার এতদিনে মনে হয়েছে।

হাড্ডিসার বুড়ি হায়নাটা পরপারে তার রবার্টের সঙ্গে দেখা হবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। বোঝা গেল, মাছের বিষক্রিয়া বিষয়ে নিজের দোষ স্খালনের সে যে কৈফিয়ত দেবে স্বামীর কাছে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তারই মহড়া দিচ্ছিল সে।

পরে দেখা করি এলজার জামাই ইউজিনের সঙ্গে। পকেটে হাত ঢোকানো তার মূর্তিটা দেখে রুশী «Ф» অক্ষরটার কথা মনে হল — অক্ষরটা তার খাঁটি নাম "ফোতো"র প্রথম অক্ষর।

কানহীন খরগোসের মতো দেখতে লোকটা বোকার মতো আমায় বোঝালে, ইউজিনের ভয়েই নাকি বুড়ো কর্তা ব্রিজ থেকে লাফ দিয়েছে।

“আমায় ও চিরকাল ভয় করত। ভয় করত, ফার্মে আমি ওর মনিব হয়ে বসব। আমার বুদ্ধিতে, নতুন ধরনে কারবার চালাবার ক্ষমতায় ভয় পেত ও। পরে ও যখন আমাদের সবাইকে ঠকিয়ে ফার্মটা কিনে ফের বেচে দিলে, তখন ভয় পেল যে আমি ওকে শেষ করে দেব। আমি ওকে পেষাই মেসিনে পিষেই ফেলতাম, নয়ত খাবার টেবিলের ছুরি দিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে ওর গলাটি ফাঁক করে দিতাম।”

ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল ইউজিন। ইচ্ছে ছিল একটা ভয়ঙ্কর কুমিরের মতো যেন তাকে দেখায়, কিন্তু দেখাল কেবল একটা খেঁকী শেয়ালের মতো, যে নেকড়ের উচ্ছিষ্টটা খেয়ে শেষ করছে।

কিন্তু তার বৌ এবং এলজার মেয়ে আন্না তখনই এক ঝানু অজগর হয়ে উঠেছে। সে বললে:

“কী আফশোস যে ওর তামাকের পাইপে বিষাক্ত গ্যাস পাউডার সময়মত রাখা হয়নি। তাহলে আমাদের এ অবস্থা হত না। অন্যের জীবনে, অন্যের আনন্দে যারা ব্যাঘাত ঘটায় তাদের সময় থাকতেই সরিয়ে দেওয়া দরকার।”

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ওর চিন্তাধারাটা ফ্যাশিজমের বাদামী রঙে রাঙানো। দলের অবাঞ্ছিত নায়কটিকে বিষ দিয়ে সরিয়ে দেবার সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে সে মায়ের চেয়েও বড় ওস্তাদ।

শ্রীমান নেকড়ের ভূতপূর্ব দলটির প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করার পর আমি ওর ধর্ম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, যার কাছে “জেনারেল মোটর্স”এর শেয়ারগুলো গচ্ছিত ছিল।

ফার্মের নতুন মালিক ওকে ছাঁটাই করে দিয়েছে, তার জন্যে তার যত রাগ গিয়ে পড়েছে ত্রফিমের ওপর। সে বললে, ত্রফিম এক চোর, ফার্মের লাভ সব মেরে দিয়ে উপরিকথিত নামজাদা মোটর ফার্মের শেয়ারে ঢেলেছে।

ধর্মভাই বললে, “আমিই আসল। আমিই ওর পামর জীবনটাকে ছেঁটে দিলাম। ওর ভয় ছিল আইনে পড়বে। ভয় না পেলে আমায় দুহাজার ডলার দিয়ে কেনার চেষ্টা করবে কেন? খুব অল্পে সেরে দেবে ভেবেছিল। আমার চাকরি যাবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকাটা নিয়ে ইউজিন আর এলজাকে বলে

দিই কীভাবে ও ফার্মের টাকা মেরেছে। আমার ডেরাটা, চাকরিটাই যখন গেছে তখন আর লোকসানের কী ভয় আমার?”

এই মলোকানটির সঙ্গে জীবজগতের ক্ষেত্রে কোনো তুলনীয় সাদৃশ্য মেলা ভার। সম্ভবত তাকে সেই সব সরীসৃপের সঙ্গে ফেলা যায় যারা ছোঁয়া পেলে কামড়ায়।

ত্রফিমের যে বইটা এখন জঞ্জালের স্তূপে, সেই বইটার জন্যে চুক্তি যে করেছিল সেই কোম্পানি-কর্তা তার ঋণপ্রদানের কাহিনীটা খুব চিত্তাকর্ষক ও চমৎকার করে আমায় শোনায়। এই কোম্পানিকর্তাটিকে কেউ নেকড়ে বলবে না। বরং তার বক্তব্যে ও আচরণে তাকে বাঘ বলেই মনে হবে। “হ্যাঁ” এবং “না”। তার কাছে শুধু দুটি জিনিস — শাদা এবং কালো ... এক কথায় এই সমস্ত বৈপরীত্য তার পক্ষে ঠিক বাঘের চামড়ার ডোরাগুলোর মতোই স্বাভাবিক। লাফ মারার লালিত্যে আর নখগুলোকে নরম থাবার মধ্যে লুকিয়ে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা শিকারের গায়ে বেঁধাবার কৃতিত্বেও তাকে বাঘ বলা উচিত।

ওর কালো ডোরাগুলো যখন ফুটে উঠছিল তখন কি সে আমার গায়ে নখ বেঁধায়নি? “আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাবার রকম” নামে যে বইখানার পাতায় পাতায় আইনী দলিলের মতো করে সে ত্রফিমের সই নিয়ে রেখেছিল, আর একটু হলেই যে বইটা প্রকাশিত হচ্ছিল, তার লেখক তো আসলে সেই। এখন যখন গায়ের হালকা দাগগুলোয় জোর দিতে হল তখন সে নখ বসাল ত্রফিমের গায়ে এই বলে যে আত্মহত্যাকারী প্রায় তার কোম্পানিকে বিভ্রান্ত করে এনেছিল।

বাঘটা আমায় তোয়াজ করে আমার “একই গ্রহের দুই দিক” বইখানাকে একেবারে নিরপেক্ষ সত্য বললেও নিরপেক্ষতার প্রতি তার মোটেই আগ্রহ নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার জীবন সম্পর্কে নিরপেক্ষ বাস্তব লেখার এসময় খুব চাহিদা, থাবায় নখ ঢুকিয়ে রাখারও উপায় সেটা। বাঘের রক্তপিপাসা আর নেই, এটা আমি ক্ষণেকের জন্যেও বিশ্বাস করি না। নতুন লাফ দেওয়ার আগে তার একটা কৌশলী অবকাশ দরকার। আমার কৃতিত্ব এই যে এই অবকাশটার সদ্ব্যবহার করে আমি বইখানাকে প্রকাশ করিয়ে নিতে পেরেছি।

এমন সময়ও আসতে পারে যে আমি "বেইমান" আর শ্রীমান নেকড়ে প্রতিপন্ন হবে বীর বলে, যিনি আমেরিকার নেতৃত্বাধীন স্বাধীন দুনিয়ার জন্যে নিজের গর্দান দিয়েছেন।

এখন অবিশ্যি কোম্পানি-কর্তা সবকিছুর জন্যেই নেকড়ের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছে। আমায় বললে:

"আমাদের উকিল ওকে একেবারে কোণঠাসা করে এনেছিল। কোম্পানির কাছ থেকে যা নিয়েছিল শুধু তাই নয়, "জেনারেল মোটর্স"এর শেয়ারগুলো পর্যন্ত তুলে দিয়ে হয় পরিত্রাণলাভ নয়ত এদেশে অবাধ চলাফেরাটি বিসর্জন ছাড়া তার গতি ছিল না।"

এইভাবে জুডাস শুধু তার তিরিশটি রৌপ্যমুদ্রা হারাত তাই নয়, অন্যে তার জন্যে যে মিথ্যা রচনা করে দিয়েছিল তা ছাপার খরচটা পর্যন্ত দিতে হত তাকে।

তাতে অবিশ্বাসের কিছু ছিল না। খাঁচায় ঢুকতে হত নেকড়েকে। আদালত ওর পক্ষে যেত না। শান্তি ও মৈত্রীর নেতা খ্রুশ্চভের সঙ্গে মার্কিন জনগণের সাক্ষাৎকারের পরে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তাতে জনমতের নির্মাণকর্তাদেরও পক্ষেও তখন ভালোমানুষ সাজাই সুবিধা।

এ সফর গোটা আমেরিকার কাছে, তার সমস্ত শ্রেণী সম্প্রদায় ও ব্যক্তি-বিশেষের কাছে একটা মস্ত ঘটনা। কেউ কেউ হয়ত প্রথম জানল যে দুনিয়ায় মার্কিন ধাঁচ ছাড়াও অন্য ধরনের জীবন আছে। সে কথা জানলেও যাদের সন্দেহ কাটছিল না এমন কেউ কেউ আবার পেণ্ডুলামের দোলন থেকে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ আবার সবকিছু জেনেও সবকিছু বুঝে থাকলেও এখন টের পেল যে খ্রুশ্চভের পেছনে যে শক্তি সে শুধু সোভিয়েতের শক্তি নয়, আমেরিকাতেও সে শক্তি বর্তমান। কেউ কেউ তাকে করতালি দিয়েছে, কেউ দিয়েছে সহানুভূতি। দিয়েছে ফিরিয়ে নেবার জন্যে নয়, যদি বা আমেরিকার কেউ কেউ পরে মিঃ খ্রুশ্চভের আমেরিকা সফরের তাৎপর্য ছোটো করে তোলার বা মুছে ফেলার চেষ্টা করে, তার জন্যে সমস্ত মার্কিন প্রচার যন্ত্রকে চালায়, তা সত্ত্বেও।

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এটা প্রথমে জানা ছিল অতি অল্পসংখ্যক লোকের। তমসাবাদীরা যখন সে কথা অস্বীকার করতে লাগল

ও ঘোষণা করতে লাগল যে পৃথিবী তিনটে তিমির পিঠে বসানো… তখন সন্দেহ শুরু হল লোকের। প্রচারে ফল হল উল্টো, তমসাবাদীরা যা অস্বীকার করতে চাইল সেটা জানা হয়ে গেল লোকের। যত জোরে তারা অস্বীকার করতে লাগল ততই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল লোকে।

কিন্তু ফেরা যাক নেকড়ের কথায়।

আরো অনেক লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি দেখাতে পারতাম যে "ধেড়ে নেকড়ে" আখ্যাটা এখানকার অনেক নামী অনামা লোকের পক্ষে সঠিকভাবেই প্রযোজ্য। সম্ভবত ধেড়ে নেকড়ের ধারণাটা প্রসারিত করলে আরো বড়ো কিছু একটা বোঝাতে পারে, কোনো কোনো দেশের জীবনযাত্রার প্রকরণের সঙ্গে তা মিলে যাবে… কিন্তু বড়ো বড়ো সাধারণীকরণের ঝোঁক আমার নেই। শুধু কেউ যদি আমায় ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে নেকড়ের ঝাঁপ সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইত তাহলে আমি বলে দিতাম, ও মোটেই ঝাঁপ দেয়নি। বলতাম এই জন্যে শুধু নয় যে আমার সীমাবদ্ধ সাধারণ বুদ্ধিতে এমন একটা সাহসী কাণ্ড ওর পক্ষে সম্ভব বলে মনে করি না। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে চল্লিশ মিটার — এতটা লাফ অমন একটা নীচ প্রকৃতির পক্ষে বড়োই বেশি… সে কথা বলতাম শুধু এ জন্যেও নয় যে ওমস্ক শহরের কাছে তার মৃত্যুর প্রথম লজ্জাকর কাহিনীটা আমার জানা… বলতাম কারণ, তার মৃত্যুর বাস্তব প্রমাণ রেখে যাবার সযত্ন চেষ্টাটা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। কী দরকার ছিল তার দলিল-পত্র চিঠি সমেত কোটটা ছুড়ে ফেলার, যে চিঠি স্পষ্টই আর কাউকে নয় তার উত্তমর্ণদের উদ্দেশে লেখা?

আমার সীমাবদ্ধ মস্তিষ্কে একটা আদিম ভাবনা জাগল ডলারগুলো নিয়ে — ফার্ম আর "জেনারেল মোটর্স"এর শেয়ার বেচা ডলারগুলো — পরজগতে তার আত্মার কল্যাণের জন্যেও অন্তত ইহজগতের কাউকে তো সে সেগুলো দিয়ে যায়নি।

টাকাগুলো গেল কোথায়? শেয়ার আর ডলারগুলো সে তো স্বর্গে প্রবেশের টিকিটের জন্যে সাধু পিটারকে দেবে বলে সঙ্গে নিয়ে যায়নি। স্বর্গরাজ্যের দেউড়ি রক্ষক ঘুষ নেবেই এ বিষয়ে প্রথমত সে নিঃসন্দেহ থাকতে পারে না, দ্বিতীয়ত মার্কিনী ডলার আর "জেনারেল মোটর্স"এর শেয়ার স্বর্গেও চলবে এমন নয়।

এই ভেবে ঠিক করলাম পুলিস হেনরি ফিশম্যানের সঙ্গে আলাপ করব। আত্মহত্যার ওই একমাত্র সাক্ষী, সান্ধ্য পত্রিকার রিপোর্টারকে ওই খবর দিয়েছে।

পরিচয় করাটা কঠিন হল না। হেনরি ফিশম্যানকে পেলাম ব্রিজের ওপরেই। দ্বিধান্বিত আত্মহত্যাকারীর ভাব করে আমি ওর লক্ষ্য পথে পড়লাম। কথাবার্তা হল। বললাম মরবার ইচ্ছে হচ্ছে অবশ্য জীবনটা ত্যাগ না করে।

হেনরি সাদাসিধে লোক। বললে:

"আরে, গত সপ্তাহের মধ্যে এই দেখছি দ্বিতীয় বার!.."

যথেষ্ট সূত্র পাওয়া গেল। কিন্তু আরো চাই। ওর ডিউটি শেষ হলে হুইস্কি ডিমভাজা ও শূকরমাংস সহযোগে আড্ডা জমালাম। যখন সে শুনল যে আমি খুব চোখা চোখা প্লটের খরিদ্দার, তখন সবার আগে দরের বহরটা জেনে নিল, তারপর হুইস্কি ও প্রতিশ্রুত দক্ষিণায় উৎফুল্ল হয়ে বললে তার কোন এক সহকর্মী কোন একটা ব্রিজে এক বুড়ো ভদ্রলোকের ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সাক্ষী হয়ে তিনহাজার ডলার পেয়েছিল। "আত্মহত্যার" আগেই ঝম্পপ্রদানকারী পাঁচশ ডলার অগ্রিম দেয় এবং বাকি আড়াই হাজার দেয় কাগজে তার "মৃত্যু" সংবাদ প্রকাশের পরে। ওই রকম টাকা পেলে আমার ঝম্পপ্রদানটাও হেনরি কাগজে ছাপিয়ে দেবার গ্যারাণ্টি দিল।

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বললাম এতে আমার আগ্রহ আর কিছুই নয় কেবল একটা গল্পের প্লট হিসাবে এবং প্লটের জন্যে প্রতিশ্রুত টাকাটা দিয়ে চলে গেলাম।

এবার পেলাগেয়া কুজমিনিচনা তুদোয়েভা তার এক-যে-ছিলটা যথারুচি গড়ে তুলতে পারেন। নেকড়ের নেকড়েসুলভ মৃত্যু হল, নাকি সে তার ওমস্কী কায়দাটার নিউ ইয়র্কী রকমফের ঘটিয়ে অচিন দেশের ঘাটে বাটে মন্থর মৃত্যুর পথ নিল — এটা আমার কাছে বড়ো কথা নয়।

বিশ্বাস করি প্রিয় বন্ধুজন, আপনাদের কাছেও নয়।

চিরকাল আপনাদের
জি. টি.'

৫৮

সপ্তাহ দুয়েক পরে ফিওদর পেত্রভিচ টেনরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত বইটা পেল। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচও বই পেল একটা। তার আগে দারিয়া স্তেপানোভনার নামে এসেছিল সের্গেইয়ের জন্যে খেলনার একটা পার্সেল।

ভুলে যাওয়া "গ্র্যান্ড-পা"র কথা মনে না পাড়িয়ে কোনো রকম একটা বুঝ দিয়ে খেলনাগুলো হয়ত দারিয়া স্তেপানোভনা নাতিকেই দিত। ফেলে তো দেওয়া যায় না, চমৎকার আমেরিকান খেলনাগুলোর দোষই বা কী। কিন্তু এর মধ্যে কেমন যেন একটা অপমান ছিল, তার পক্ষে অপমান, সের্গেইয়ের পক্ষেও অপমান। পিওতর তেরেন্তিয়েভিচের সঙ্গে পরামর্শ করে তাই সে খেলনাগুলো দিয়ে দিলে কিন্ডারগার্টেনে — বাখরুশি গ্রামে নিজেদের কিন্ডারগার্টেনে নয়, দূরের একটা কলখোজের কিন্ডারগার্টেনে।

বাজনদার ঘড়িটাও ছিল পার্সেলের মধ্যে। এটা দেওয়া হল কিরিল আন্দ্রেয়েভিচ তুদোয়েভকে। ঘড়িটা দিয়ে দারিয়া বললে:

'তোমার যা কষ্ট গেছে এটা সেই জন্যে। যাই হোক না, তোমার জীবনের মাসখানেক তো ওর জন্যেই খোয়া গেল।'

তুদোয়েভ ঘড়িটা নিয়ে বললে:

'ঘড়িটা পরব না সে তো নিশ্চয়। তবে, কোনো কাজেও লেগে যেতে পারে...'

কাজে লাগল তবে, তার নয় তুদোয়েভার।

দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলোয় পেলাগেয়া কুজমিনিচনা বার বার করে তার "এক-যে-ছিল" ধেড়ে নেকড়ের কাহিনীটা নিজের মনে আবৃত্তি করে গড়ে তুলেছিল, কিন্তু চমৎকার করে শেষ কথাটুকু সে আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

তখন ঘরে এল সেই বাজনদার ঘড়ি। ঘরে এসে বলা নেই কওয়া নেই ঘুরঘুট্টি নিশি রাতে এ কাহিনীর শেষটা বাজিয়ে দিলে তুদোয়েভার কানে। তুদোয়েভা পরে তা লোককে বলেছিল এইভাবে:

'আর মহা দুনিয়ায় হারিয়ে গেল সেই নেকড়ের পায়ের ছাপ। কোনো কথা নেই, কোনো খবর নেই, এতটুকু গুজবও কেউ কোথাও শুনলে না।

ওর পরে রয়ে গেল শুধু সেই বাজনদার ঘাঁড়, আর এই ধেড়ে নেকড়ের কাহিনীটা — সে নেকড়ে জীবনের শেষ দিকে মানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু হেরে গেল তার স্বভাবের জানোয়ারটার কাছে…'

তুদোয়েভার এই সুর করে বলা শেষ কথাগুলো শুনে দারিয়া স্তেপানোভনা কী যেন ভেবে মন্তব্য করেছিল:

'আদৌ সে ছিল নাকি? নাকি সবই মাত্র কাহিনী, দেশের মাটির প্রতি বেইমানির ক্ষমাহীন পাপের একটা গল্প।'

১৯৫৯—১৯৬০

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়,
২১, জুবভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

ДВА БРАТА

(РУССКОЕ НАЗВАНИЕ «СКАЗКА О СЕРОМ ВОЛКЕ»)

На языке бенгали